চিন্তাপরাধ

আসিফ আদনান

চিন্তাপরাধ

আসিফ আদনান

সূচীপত্র

পূর্বকথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

চিন্তাপরাধ কোনো ইসলামী বই না, তবে মুসলিমদের জন্য লেখা বই। সর্বব্যাপী মিডিয়া প্রপাগ্যান্ডা, প্রথাগত প্রথাবিরুদ্ধতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, আর আদর্শিক ঔপনিবেশিকতার কালে বইটি যদি মুসলিমদের চিন্তার জট খুলতে কার্যকরী হয়, চিন্তার জগতে অল্প হলেও নাড়া দেয়, তবে সেটা হবে একটা বড় পাওনা।

বইতে চারটি অনুবাদ আছে। ক্রিস হেজেসের *End of Empire* থেকে 'সাম্রাজ্যের সমাপ্তি', গাই ডি ইটন এর *Islam and The Destiny of Man* বইয়ের কিছু অংশ নিয়ে 'হাউস নিগার', ড. আসাদ যামানের *Origin of Western Social Sciences* অবলম্বনে 'গোড়ায় গলদ' এবং শাইখ জাফর ইদ্রিসের *Secularism & Moral Values* অবলম্বনে 'ভুল মাপকাঠি'।

এর মধ্যে শুধু সাম্রাজ্যের সমাপ্তিকেই সোজাসাপ্টা ভাবানুবাদ বলা চলে, বাকি তিনটির ক্ষেত্রে বেশ অনেকটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন করা হয়েছে। বদলানো হয়েছে লেখার ক্রমবিন্যাসও। এ ছাড়া 'ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক' এর মূল থিমসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়া হয়েছে ড. আসাদ যামানের *European Transition To Secular Thought* এবং *The Conquest Of Knowledge* লেখা দুটি থেকে। তবে লেখাগুলোতে এত বেশি পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে যে, এগুলোকে অনুবাদ বলা ঠিক ইনসাফ হয় না। আবার মৌলিক লেখাও বলা যায় না। এ লেখাগুলোর ক্ষেত্রে 'অবলম্বনে' ব্যবহারই তুলনামূলক বেশি যৌক্তিক ও নিরাপদ মনে হচ্ছে।

অসুস্থতা এবং সময়স্বল্পতা সত্ত্বেও কয়েকটি লেখা দেখে দিয়েছেন এবং তথ্যসূত্র সংযোজন করেছেন মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির ভাই। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। বিভিন্ন সময় এমন অনেকে তথ্য, পরামর্শ, গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এবং উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন, যারা হয়তো পর্দার আড়ালে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা কখনো ছিল না; বরং উল্টো সিদ্ধান্ত ছিল অনেকদিনের। বলা যায় তাঁদের কথাতেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা। তাই এ বইয়ের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে তাঁদের 'দোষী' সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আল্লাহ তাঁদের কবুল করুন, উত্তম প্রতিদান দিন।

যদি এ বইতে কোনো কিছু কল্যাণকর থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, সেটা একান্তই আমার। ইখলাস ও নিয়্যাতের সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ তাঁর অক্ষম বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ এবং সাফল্য দান করুন।

নিশ্চয় সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

আসিফ আদনান
শাবান ১৪৪০ হিজরি, এপ্রিল ২০১৯

«Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand...

And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?»

সহস্র সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল

১.

অগাস্টের ৬ তারিখ।

দিনটা শুরু হয়েছিল গ্রীষ্মের অন্য দশটা স্বচ্ছ, উজ্জ্বল দিনের মতোই। সকাল সাতটার দিকে বেজে ওঠা পাগলাঘন্টির শব্দ ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া শহরবাসীর কাছে খুব একটা গুরুত্ব পেল না। আরও কম গুরুত্ব পেল এক ঘণ্টা পর বেজে ওঠা বিপদ কেটে যাওয়ার সংকেত। কর্মব্যস্ত দিনের প্রস্তুতি নিতে থাকা শহরটার বাসিন্দাদের কাছে হয়তো অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় সময় কাটানো বিলাসিতা মনে হয়েছিল।

ঠিক পনেরো মিনিট পর, সকাল ৮.১৫ তে আকাশের বুকে দেখা দিলো এক নিঃশব্দ আলোর ঝলকানি। সাদার চেয়েও সাদা। তার ঠিক পরপর, এক বিকট, ভোঁতা শব্দ। সহস্র সূর্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে আকাশের বুক চিরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে গেল আগুনের সোনালি সন্ত্রাস। মুহূর্তের মধ্যে লন্ডভন্ড হয়ে গেল প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের শহরটা। স্রেফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল বিস্ফোরণস্থলের এক মাইলের মধ্যে প্রায় সবকিছু। ইট, কাঠ আর কংক্রিটের পাশাপাশি বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাত শহরের অধিবাসীদেরও প্রবল শক্তিতে ছুড়ে দিলো এদিক-সেদিক। তারপর শহরটাকে গ্রাস করল আগুনের উড়ন্ত ঝড়। বৃদ্ধ বাবার চশমা, নিশ্চিন্ত চোখে পৃথিবীকে দেখতে থাকা আধোআধো বোলের শিশু, সতর্কতার সাথে বাছাই করা খেলার সাজসরঞ্জাম আর দোলনা, দুই ঝুঁটি করা স্কুলড্রেসের ছোট্ট খুকির হাসি, ক্লাসের দুষ্ট ছেলেটার লাল ব্যাগ, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় অন্যমনস্ক যুবক, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনে পথের কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকা ভেজা চুলের তরুণী, অর্ধেক অঙ্ক কষা ব্ল্যাকবোর্ড, সদ্যখোলা অফিসের পেটমোটা ফাইল, ঘাসফুল, প্রজাপতি,

পাখি... নিমিষেই মুছে গেল সবাই, সবকিছু। আগুনের তীব্র উত্তাপে ঝলসে গেল টিকে থাকা অল্প কিছু রাস্তা, দেয়াল আর ব্রিজের রং। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের অনেকের ছায়া স্থায়ীভাবে গেঁথে গেল সেখানে। বিস্ফোরণের এক মিনিটের মধ্যে মারা গেল এক লক্ষের মতো মানুষ, আহত হলো আরও প্রায় এক লক্ষ। ধীরে ধীরে শহরটার ওপর আকাশটাকে ঢেকে দিতে শুরু করল ব্যাঙের ছাতার মতো পাক খেতে থাকা ধোঁয়া আর ধুলোর বিশাল এক মেঘ।

রাস্তা আর ফুটপাথজুড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা হাজারো মানুষ দিনভর তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো ঠায় বসে রইল, বমি করল, তারপর মারা গেল। পুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে কোনো মতে নদীর পাড় পর্যন্ত এসে সব শক্তি হারিয়ে সেখানেই নিথর শুয়ে থাকল আরও কয়েক হাজার। সন্ধ্যার দিকে বাড়তে থাকা নদীর পানিতে নীরবে, নিঃশব্দে তলিয়ে গেল অনেকে। আর নৌকায় ওঠানোর জন্য হাত ধরে টানতেই নিচের মাংস উন্মুক্ত করে সড়সড় করে গ্লাভসের মতো খুলে এল কারও কারও রক্ত-পুঁজ মাখানো চামড়া।

চুরমার হয়ে যাওয়া হিরোশিমার রক্ত-মাংসে পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে দেখা গেল জনাবিশেক সৈনিককে। শূন্য চোখের কোটরের নিচে পুড়ে যাওয়া গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওদের গলিত চোখ। সম্ভবত বিস্ফোরণের সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা।

চরম বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে ১৯৪৫ এর ৬ই অগাস্ট হিরোশিমার মাটি থেকে ১,৯০০ ফিট ওপরে ৬৪ কেজি ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল 'লিটল বয়', মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাবস্থায় ব্যবহৃত আণবিক বোমা। লিটল বয়ের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল হিরোশিমার ৭০% বিল্ডিং। অ্যামেরিকান দাবি অনুযায়ী প্রথম দিনে মৃতের সংখ্যা ৬০-৯০ হাজারের কাছাকাছি। জাপানিদের মতে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। তিন মাস পর ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী এ বোমার কারণে নিহতের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। হিরোশিমা নগর কর্তৃপক্ষ, জাপানের স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে ছাপানো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী বিস্ফোরণ-পরবর্তী দশকগুলোতে রেডিয়েইশানজনিত অসুস্থতায় মৃতদের হিসাবে ধরলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি।[১] তিন দিন পর নাগাসাকিতে ফেলা হয় দ্বিতীয় আণবিক বোমা, ফ্যাট ম্যান।

---

[১] By The Numbers: The atomic bombing of Hiroshima, Associated Press, May 27, 2016

ছয় দিন পর, ১৯৪৫ সালের ১৫ই অগাস্ট, জাপান আত্মসমর্পণ করে।

অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, অভূতপূর্ব এ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল এমন সময়ে যখন জাপান সম্মানজনক আত্মসমর্পণের পথ খুঁজছিল। ৬ অগাস্টের আগেই অ্যামেরিকান সামরিক গোয়েন্দারা জাপানের পাঠানো কোডেড মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে জাপান আত্মসমর্পণের চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ড্যার ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার, জাপানের বিরুদ্ধে চালানো সব বিমানহামলার দায়িত্ব থাকা মেইজর জেনারেল কার্টিস লি-মেই, প্যাসিফিক কম্যান্ডার ইন চীফ চেস্টার নিমিটয, প্রেসিডেন্টের চীফ অফ স্ট্যাফ উইলিয়াম লীহি, জাপানের পাঠানো গোপন বার্তা ইন্টারসেপ্ট করার পর অ্যামেরিকান সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানোর দায়িত্বে থাকা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্টার ক্লার্কসহ অনেকেই স্বীকার করেছে যে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা হামলা ছিল অপ্রয়োজনীয়।[২] তবুও সামরিকভাবে অপ্রয়োজনীয় এ হামলার সিদ্ধান্ত নেয় অ্যামেরিকা। বিশ্বমঞ্চে 'অপ্রতিরোধ্য, অজেয়, মহাশক্তিধর সুপারপাওয়ার' হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব প্রতিহত করা–আণবিক বোমা হামলার মাধ্যমে এক ঢিলে এ দুই পাখি মারার ফন্দি আঁটে অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার ভূ-রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ আর কূটনীতির বলি হতে হয় হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রায় চার লক্ষ মানুষকে।[৩]

ক্ষমতার নেশায় বেসামাল, ব্যাপক ও বিস্তৃত আধুনিক হত্যাযজ্ঞের উদ্‌গ্রীব স্থপতি অ্যামেরিকার এ হামলা শুধু গণহত্যা ছিল না, ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস–সত্যিকার অর্থে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। হিরোশিমার বিস্ফোরণের ১৬ ঘণ্টা পর অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান নিচের বক্তব্য দেয়:

> *'১৬ ঘণ্টা আগে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিরোশিমাতে একটি বোমা ফেলেছে মার্কিন বিমান। এ বোমাটি ছিল ২০,০০০ টন টি.এন.টির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, এর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বোমা হিসেবে*

---

[২] *The Decision to Use the Atomic Bomb*, Gar Alperovitz

[৩] ধারণা করা হয় নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যা ৫০,০০০-১,০০,০০০। Hiroshima and Nagasaki, Campaign For Nuclear Disarmament.

মনে রাখার ব্যাপার হলো, শুরু থেকেই মৃতদের মোট সংখ্যার ব্যাপারে অ্যামেরিকার 'ধারণা' গড়ে উঠেছে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।

স্বীকৃত 'ব্রিটিশ গ্র্যান্ড স্ল্যাম' এর চেয়ে প্রায় ২,০০০ গুণ বেশি বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন।'[৪]

ট্রুম্যানের সাড়ে এগারো শ শব্দের পুরো বক্তব্য জুড়ে বারবার ফুটে ওঠা তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো।

প্রথমত, বিপুল বিধ্বংসী ভীতিকর ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করতে পারার গর্ব।

দ্বিতীয়ত, অবিশ্বাস্য মাত্রার হত্যাযজ্ঞ আর মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুশোচনার অনুপস্থিতি।

তৃতীয়ত, 'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি' নাম দিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের জ্বলজ্যান্ত একটা শহরকে সামরিক টার্গেট হিসেবে চিত্রিত করা আর বেসামরিক জনগণের পাইকারি খুনের বৈধতা তৈরি।

১৯৪৬ থেকে গত ৭৩ বছরে অ্যামেরিকা পেশাদারি দক্ষতা আর নির্লিপ্ত নৈপুণ্যের সাথে পৃথিবীজুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যা করেছে প্রায় ২ কোটি মানুষ।[৫] নিয়মিত বিরতিতে চালানো গণহত্যার পর ট্রুম্যানের মতোই একই রকম নির্বিকার আত্মবিশ্বাস আর গর্ব মেশানো আনুষ্ঠানিকতার সাথে ঠিক একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে গেছে অ্যামেরিকার অন্যান্য প্রেসিডেন্টরাও। ট্রুম্যানের পর আরও ১২ জন প্রেসিডেন্ট এলেও বদলায়নি সন্ত্রাসী হামলার পর অ্যামেরিকার দায় স্বীকারের এ মুখস্থ স্ক্রিপ্ট। ধ্বংসের প্রযুক্তির প্রতি প্রায় যৌনায়িত মুগ্ধতা, নির্বিকার অনুশোচনাহীনতা এবং নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির সন্ত্রাসকে শান্তি, মানবতা, গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো আদর্শের নামে চালিয়ে দেয়া–যুগ যুগ ধরে অ্যামেরিকান গণহত্যাকে বিশেষায়িত করে আসছে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য।

---

[৪] Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima, Public Papers Harry S. Truman 1945-1953, Harry S. Truman Presidential Library & Museum.

[৫] US Has Killed More Than 20 Million People in 37 "Victim Nations" Since World War II, James A. Lucas, January 20, 2019

২.

গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আর গুরুতর মানবিক মূল্যের বিনিময়ে নিজের স্বার্থ কেনার সাথে অ্যামেরিকার সম্পর্ক নতুন না। অ্যামেরিকা নামের এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ওই সব স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিগত নিধনের মাধ্যমে, কোনো এক বিচিত্র অধিকারবলে ইউরোপ থেকে আসা সাদা মানুষরা যাদেরকে 'রেড ইন্ডিয়ান' নাম দিয়ে, নিজেরা 'অ্যামেরিকান' খেতাব গ্রহণ করেছিল। ১৪৯২ এ ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের সময় থেকে নতুন মহাদেশে ইউরোপিয়ানরা আসতে শুরু করার পরের চার শ বছরে মারা যায় প্রায় ৮০-৯০% স্থানীয় অধিবাসী।[৬] তাদের পাইকারি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সাদা ইউরোপিয়ানদের বসবাসের 'উপযুক্ত' হয়ে ওঠে অ্যামেরিকা। লিঙ্কন, জেফারসন, জ্যাকসন, ফ্র্যাংকলিন–অ্যামেরিকান ইতিহাসের মহান সব ব্যক্তিরা রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে অংশগ্রহণ করে নতুন মহাদেশ থেকে অসভ্য, বর্বর পশুদের নিশ্চিহ্ন করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে।

এখনকার মতো তখনো মানুষ মারার উদ্ভাবনী নানা পদ্ধতি নিয়ে মুগ্ধতা ছিল ইউরো-অ্যামেরিকানদের। ধর্ষণ, জীবন্ত পোড়ানো, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারা, আলাদাভাবে টার্গেট করে নারী-শিশু হত্যার পাশাপাশি তাদের খুন করার প্রিয় পদ্ধতি ছিল এক ধরনের প্রাক-আধুনিক জীবাণুযুদ্ধ। 'রেড ইন্ডিয়ান'দের মধ্যে গুটিবসন্ত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইউরো-অ্যামেরিকানরা তাদের উপহার দিত গুটিবসন্ত রোগীদের ব্যবহার করা কম্বল। মড়ক লেগে সাফ হয়ে যেত গ্রামের পর গ্রাম, গোত্রের পর গোত্র। ভয়ংকর এ রোগ সম্পর্কে একেবারেই না জানা অধিবাসীদের অনেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত অন্য কোনো এলাকায়, অন্য কোনো গোত্রের কাছে। সাথে নিয়ে যেত গুটিবসন্তের ভাইরাস। চলতে থাকত চেইন রিঅ্যাকশান। আধুনিক অ্যামেরিকান মারণাস্ত্রগুলোর মতোই মানুষ মারায় বিস্ময়কর রকমের কার্যকরী ছিল জীবাণুযুদ্ধের এ কৌশল।[৭]

মানুষ মারার উদ্ভাবনী কৌশল, নির্লিপ্ত পেশাদারি খুন, আর কোনো না কোনো আদর্শের নামে দেয়া অজুহাত–সেই একই প্যাটার্ন। একালের গণহত্যার মতো একই গুণে গুণান্বিত ছিল সেকালের গণহত্যাও।

---

[৬] Thornton, Russell (1990). *American Indian holocaust and survival: a population history since 1492*. University of Oklahoma Press. pp. 26–32

[৭] *Biological Warfare in Eighteenth-Century North America: Beyond Jeffery Amherst*, Elizabeth A. Fenn (2000)

নোয়াম চমস্কি একবার বলেছিলেন,

'অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কথা বলা অনেকটা ত্রিভুজের ত্রিভুজাকার হওয়া নিয়ে কথা বলার মতো। আমার জানামতে অ্যামেরিকা হলো একমাত্র দেশ যা প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল সাম্রাজ্য হবার জন্য। জর্জ ওয়াশিংটন অ্যামেরিকাকে বলেছিলেন 'সদ্যোজাত সাম্রাজ্য'। আধুনিক অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ হলো অ্যামেরিকার সূচনালগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা এ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়।'[৮]

অ্যামেরিকান ঐতিহাসিক জন লুইস গ্যাডিস দেখিয়েছেন ২০০২ এর বুশ ডকট্রিনের সাথে অ্যামেরিকার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন কুইন্সি অ্যাডামসের ১৮১৮ সালের 'সম্প্রসারণেই নিরাপত্তা' (expansion is the path to security) তত্ত্বের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। দুটোর মূল বক্তব্য একই, অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী উদয় হবার আগেই তাকে আক্রমণ করা। আগাম যুদ্ধের (Pre-emptive war) এ দর্শন অনুযায়ী দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ঘরে-বাইরে কাজ করে যাচ্ছে অ্যামেরিকা। আণবিক গণহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া ট্রুম্যান থেকে শুরু করে শুধু ২০১৬-তে মুসলিমবিশ্বে ২৬ হাজারের বেশি বোমা ফেলা[৯] আর ড্রোনহামলার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রেসিডেনশিয়াল 'ক্রসফায়ার' চালানো শান্তিতে নোবেল বিজয়ী শান্তিকামী যুদ্ধাপরাধী বারাক ওবামা পর্যন্ত, মেরিলিন মনরোর প্রেমিক আর ভিয়েতনামের কসাই 'নিপাট ভদ্রলোক' জন এফ কেনেডি থেকে শুরু করে পর্ন অভিনেত্রী আর পতিতাপ্রেমিক গোঁয়ারগোবিন্দ ট্রাম্প পর্যন্ত—একই সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে প্রত্যেক অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট। নাম বদলেছে, মুখ বদলেছে, বদলেছে স্লোগান; কিন্তু বদলায়নি অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ঠান্ডা মাথায় ধ্বংসযজ্ঞের পলিসি।

তিনবার পুলিৎযার জেতা অ্যামেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক, লেখক এবং ইরাক যুদ্ধের উৎসাহী সমর্থক থমাস ফ্রিডম্যানের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে।

'বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য হাত অদৃশ্য মুঠি ছাড়া অকেজো। ম্যাকডনেল ম্যাকডগলাসকে ছাড়া ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবসার উন্নতি সম্ভব না।'

ম্যাকডনেল ম্যাকডগলাস হলো অ্যামেরিকার বিমানবাহিনীর জন্য এফ-১৫ ফাইটার বিমান তৈরি করা কোম্পানির নাম। ফ্রিডম্যানের এ উক্তি খুব সুন্দরভাবে মাত্র দু-

[৮] *Modern-Day American Imperialism: Middle East and Beyond*, Noam Chomsky

[৯] America dropped 26,171 bombs in 2016. What a bloody end to Obama's reign, The Guardian, January 9, 2017

লাইনে অ্যামেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। অ্যামেরিকা হলো ওই সাম্রাজ্য, যার স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি তার সামরিক আগ্রাসন আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেকোনো মূল্যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিই প্রথম ও শেষ কথা, বাকি সবকিছু ফুটনোট। অ্যামেরিকার জন্য আরও বেশি বাকি পৃথিবীর জন্য আরও কম।

অ্যামেরিকান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ নথিতে এ কথাগুলো স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে বারবার। যেমন : ১৯৪৮ সালে লেখা অ্যামেরিকার স্টেইট ডিপার্টমেন্টের এক নথির মূল বক্তব্য মোটামুটি এ রকম,

'বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেক এখন আমাদের হাতে। যদিও আমাদের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬%। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ অসমতাকে বজায় রাখা... আর তা করার উপায় হলো গণতন্ত্র, আর মানবাধিকারের মতো অস্পষ্ট আদর্শিক বুলির কথা ভুলে গিয়ে বলপ্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার দিকে মনোযোগী হওয়া। বিশ্বজুড়ে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি আর সম্পদের এ তীব্র বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার এটাই একমাত্র উপায়। গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের মতো ধারণাগুলো আম জনতা, রুপালি পর্দা, বক্তৃতার মঞ্চ, আর পেপার-পত্রিকার জন্য। বাস্তব দুনিয়ার পলিসির জন্য না।'[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অ্যামেরিকার কার্যকলাপের দিকে তাকালে ওপরের কথাগুলোর সত্যতা খুঁজে পেতে কারও সমস্যা হবার কথা না। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি আবোল-তাবোল নিয়ে চিন্তা কখনোই অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। এসব ফাঁকা বুলি, সাম্রাজ্যের একনিষ্ঠ প্রজাদের চোখে ঠুলি পড়ানোই এগুলোর একমাত্র কাজ। এসব 'অস্পষ্ট, আদর্শিক বুলির' বদলে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের নীতি সব সময় নির্ধারিত হয়েছে দুটি মূলনীতি দ্বারা :

ক) অ্যামেরিকা এ পৃথিবীর মালিক। পৃথিবীর যেকোনো কোনায় থাকা যেকোনো কিছুর ওপর তাদের অধিকার আছে।

খ) অ্যামেরিকা যা করে ভালোর জন্যই করে। নৈতিকতা হলো তা-ই যা অ্যামেরিকা করে।

---

[১০] Report by the Policy Planning Staff, Policy Planning Study 23, written by George S. Kennan for the State Department planning staff in 1948, The Office of the Historian.

প্রথম আকিদাহর ওপর ভিত্তি করে যখন যা প্রয়োজন নিজের মনে করে নিয়ে নিয়েছে অ্যামেরিকা। যখন যাকে দরকার মেরেছে, দখল করেছে, ধ্বংস করেছে। যতটুকু প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রিত দক্ষতার সাথে চালিয়েছে ততটুকু ধ্বংসযজ্ঞ, সাথে চিরাচরিত অ্যামেরিকান স্বভাব অনুযায়ী দিয়েছে কিছুটা বাড়তিও। দ্বিতীয় আকিদাহ অনুযায়ী সংঘটিত হবার সাথে সাথেই বৈধতা পেয়ে গেছে অ্যামেরিকার প্রতিটি হত্যাযজ্ঞ, প্রতিটি ধ্বংসলীলা, প্রতিটি মানবতাবিরোধী অপরাধ। উত্তীর্ণ হয়ে গেছে নৈতিকতার মানদণ্ডে। রক্তের গাঢ় লাল স্রোত ধুয়ে মুছে গেছে সাদা সাম্রাজ্যবাদের পবিত্র পানিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের ওকিনাওয়ার ১০ হাজার ধর্ষিত নারী[১১], ১৯৫০ এর জুলাইয়ে নু গান রি-র ব্রিজের নিচে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া ৩০০ নিরস্ত্র কোরিয়ান রিফিউজি[১২], ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দশ বছর ধরে উত্তর ভিয়েতনামে আকাশ থেকে স্প্রে করা দুই কোটি গ্যালন এজেন্ট অরেঞ্জ নামের বিষের প্রভাবে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন গুরুতর রোগে ভোগা ৩০ লক্ষ মানুষ আর মারাত্মকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়া দেড় লক্ষ ভিয়েতনামি শিশু[১৩], ৬৮ এর মার্চে সন মাই গ্রামে চার ঘণ্টা ধরে চালানো হত্যাযজ্ঞে খুন হওয়া ৫০৪ জন নিরীহ গ্রামবাসী, গণধর্ষিত শিশু ও নারী, হত্যা আর ধর্ষণের মাঝে অ্যামেরিকান সেনাদের নেয়া দুপুরের খাবারের বিরতি[১৪], একই বছরের শেষ দিকে মেকং ডেলটায় চালানো স্পিডি এক্সপ্রেস নামের অপারেশনে ঠান্ডা মাথায় খুন করা ৯,০০০ জন গ্রামবাসী[১৫], ১০ বছরের ভিয়েতনাম যুদ্ধে অ্যামেরিকার সন্ত্রাসের বলি হওয়া ২০ লক্ষ বেসামরিক নাগরিক[১৬], উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়ে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরা প্রায় নয়

---

[১১] *A Dark Secret of World War II Comes to Light The Journal of Historical Review*, September/October 2000 (Vol. 19, No. 5), page 25

[১২] Kang, K. Connie (1999-11-17). "Koreans Give Horrifying Accounts of Alleged Attack". *Los Angeles Times*.

[১৩] "Agent Orange Still Haunts Vietnam, US". *The Washington Post*. 2007-06-14. Retrieved 2017-03-29.

[১৪] Eyewitness accounts of the My Lai massacre;
story by Seymour Hersh, *The Plain Dealer*, November 20, 1969, Brownmiller, Susan (1975). *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Simon & Schuster. pp. 103–05. ISBN 978-0-671-22062-4.
Murder in the name of war: My Lai, BBC News, 20 July 1998.

[১৫] *Vietnam Reconsidered: The War, the Times, and Why They Matter*, John Ketwig

[১৬] "Associated Press", 3 April 1995;
Woodruff, Mark (1999). Unheralded Victory: Who won the Vietnam war?

লক্ষ মুসলিম শিশুসহ মোট ১৭ লক্ষ মৃত ইরাকি[১৭], সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে অ্যামেরিকার শান্তিকামী, গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসের ছোঁয়ায় দশ-বারো বছরেই বিশ্বজুড়ে 'সন্ত্রাসী' বনে গিয়ে তারপর অতি দ্রুত খুন হয়ে যাওয়া ২০ লক্ষের বেশি মুসলিম[১৮], [১৯]; বিচার হয়নি কোনো অপরাধেরই। অপরাধ বলে গণ্যই হয়নি। দশকের পর দশক ধরে নির্বিকারভাবে অ্যামেরিকা চালিয়ে গেছে তার মানবতাবাদী সন্ত্রাস।

৩.

স্নায়ুযুদ্ধের সময় অ্যামেরিকানদের মুখে প্রায়ই একটা কথা শোনা যেত, 'র‍্যাডিকাল ন্যাশনালিস্ট'। সেই দিনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে র‍্যাডিকাল ন্যাশনালিস্টদের কবল থেকে রক্ষা করা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিল অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার অস্তিত্বের প্রতি র‍্যাডিকাল ন্যাশনালিস্টরা কেন হুমকি, সেটা নিয়েও শোনা যেত অনেক কথা। কিন্তু 'র‍্যাডিকাল ন্যাশনালিযম' নামের এ দানব আসলে কী ছিল? শাব্দিকভাবে এর অর্থ হয় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ। কিন্তু অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের কাছে র‍্যাডিকাল শব্দের একটা বিশেষ অর্থ ছিল। র‍্যাডিকাল মানে হলো 'আমাদের কথা শোনে না'। অ্যামেরিকার আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করা যেকোনো দেশ, দল, গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'র‍্যাডিকাল'। তার রক্ত হালাল।

একইভাবে সাম্রাজ্যবাদের অভিধানে বিশেষ এক অর্থ ছিল 'আগ্রাসনের'। আগ্রাসন মানে প্রতিরোধ। সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট, হত্যা, সামরিক অভিযান চালানো অ্যামেরিকা শান্তিকামী, আগ্রাসী না। কিন্তু অ্যামেরিকান আগ্রাসন প্রতিরোধের চেষ্টা যে করে সে অবশ্যই, অতি অবশ্যই আগ্রাসী।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার এই ফর্মূলা আজকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যুগে প্রায় হুবহু ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের জায়গায় বসেছে ইসলামী চরমপন্থা (র‍্যাডিকাল ইসলাম) আর 'আগ্রাসন' এর জায়গায় এসেছে 'সন্ত্রাস'। নিজেদের চিরাচরিত উদ্ভাবনী স্বভাব বজায় রেখে এই নতুন শব্দগুলো দিয়ে অ্যামেরিকা তৈরি

---

[১৭] *Behind the War on Terror: Western Secret Strategy and the Struggle for Iraq*, Nafeez Mosaddeq Ahmed

[১৮] Unworthy Victims: Western Wars Have Killed Four Million Muslims Since 1990,http://www.stopwar.org.uk/index.php/news-comment/2615-unworthy-victims-western-wars-have-killed-four-million-muslims-since-1990

[১৯] Body Count, Casualty Figures after 10 Years of the War on Terror. Mar 2015, Physicians For Social Responsibility.

করেছে ভালো-খারাপ মুসলিমের নতুন নতুন সংজ্ঞাও।

মডারেট, 'ভালো মুসলিম' হলো আজ্ঞাবহ মুসলিম। যে অ্যামেরিকাকে ভালো পায়। অ্যামেরিকা যতটুকু মেনে নেবে তার ইসলাম ততটুকুই। অ্যামেরিকা যা পছন্দ করে না সেটা তার কাছে চরমপন্থা, সন্ত্রাস, জঙ্গিপনা। দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে-পরে অ্যামেরিকার কাছ থেকে শান্তিকামী, সভ্য, ভব্য খেতাব নিয়ে রাতে নিশ্চিতে ঘুমোতে পারলেই সে খুশি। হাউস নিগার। ডিনার টেবিলের পাশে মনিবের ছুড়ে দেয়া ছিটেফোঁটা খাবারের টুকরোর জন্য উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়ে অনবরত লেজ নাড়াতে থাকা গর্বিত, সাম্রাজ্যপ্রেমী মডারেট কুকুর।

আর র‍্যাডিকাল মুসলিম হলো অ্যামেরিকার কথা না শোনা দুষ্ট মুসলিম। ওই মুসলিম, যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর সন্ত্রাসবাদকে মেনে নেয় না। ইসলামের বিরুদ্ধে নব্য ক্রুসেইডে যারা অ্যামেরিকার দলে তারা মডারেট, ভালো মুসলিম। যারা অ্যামেরিকান ক্রুসেইডের বিরোধিতা করে করে তারা র‍্যাডিকাল, খারাপ মুসলিম।

সাম্রাজ্যবাদের অভিধানে ঠিক করে রাখা আছে শান্তি আর সন্ত্রাসেরও আলাদা সংজ্ঞা।

শান্তি হলো, সাত দশক করে জাতিগত নিধনে লিপ্ত দখলদার যায়নিস্ট ইস্রাইলকে দেয়া সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আর দুই পবিত্র মসজিদের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা।[২০] শান্তি হলো হেলফায়ার মিসাইল, ড্রোন ওয়ারফেয়ার, টার্গেটেড কিলিং, এনহ্যান্সড ইন্টারোগেশান, মানচিত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ব্ল্যাকসাইট আর 'মাদার অফ অল বম্বস'। শান্তি হলো আবু গুরাইবে সন্তানের সামনে ধর্ষিতা মা, মায়ের সামনে ধর্ষিত কিশোর, মুসলিমদের নগ্নদেহের পিরামিড আর গুয়ান্তানামোর কমলা রঙের জাম্পস্যুট। শান্তি হলো ১৪ বছরের আবির আল-জানাবীর গণধর্ষণ, হাদিসা, ফাল্লুজা, মসুল, রাক্কা, বাগুযের গণকবর আর ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামের ব্যবহারে মুসলিম মায়েদের গর্ভে জায়গা নেয়া বিকৃত ভ্রূণ[২১]। শান্তি হলো ড. আফিয়া সিদ্দিকীর ধর্ষণ, শেকলে ঝুলতে থাকা হাবিবুল্লাহর নিথর দেহ আর বাগরামে পৃথিবীর বুকে উঠে আসা এক টুকরো নরক। শান্তি হলো ৮৩ বার ওয়াটারবোর্ডিং এর পর আবু যুবাইদার অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে থাকা দেহ, মুখ দিয়ে বের হওয়া ফেনা। শান্তি হলো

---

[২০] U.S. Military Bases and Facilities in the Middle East, American Security Project,
https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/06/Ref-0213-US-Military-Bases-and-Facilities-Middle-East.pdf

[২১] The victims of Fallujah's health crisis are stifled by western silence, October 25, 2012

ধ্বংস, মৃত্যু, অপমান; শান্তি হলো কোল্যাটেরাল ড্যামেজ নামের জাদুমন্ত্র।

আর সন্ত্রাস?

সন্ত্রাস হলো অ্যামেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করার যেকোনো চেষ্টা। সন্ত্রাস হলো আগ্রাসী অ্যামেরিকার আক্রমণ প্রতিহত করা, প্রাণ বাঁচানোর জন্য দুর্বলের প্রতিরোধ, কারাগারে বন্দীর করাঘাত, ধর্ষিতার চিৎকার, জবাই করা পশুর এলোমেলো ছুড়তে থাকা পায়ের আঘাত। অ্যামেরিকার বইতে ৯/১১ এ তিন হাজার অ্যামেরিকানের মৃত্যু হারাম, আর ৭৩ বছরে ২ কোটি মানুষের খুন আরাম।

প্রত্যেক সাম্রাজ্য তার চারপাশে একটা মিথ তৈরি করে। গড়ে তোলে একধরনের মিস্টিক। অপরাধের বৈধতা, বিরোধীদের দমন আর সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এটা প্রয়োজন। প্রাচীন মিসরের ফিরাউনরা নিজেদের ঈশ্বর দাবি করত। নতুন ফিরাউনের মুকুট গ্রহণের আগে রীতিমতো অনুষ্ঠান করে উদ্‌যাপন করা হতো মানুষের ওপর দেবত্বারোপ। মধ্যেযুগের ইউরোপিয়ান রাজা-বাদশাহরা বলত ঐশ্বরিক অধিকারবলে শাসনের কথা। জাপানের সম্রাটদের মনে করা হতো দেববংশজাত। নাগাসাকির হামলার পর সম্রাটের কণ্ঠ প্রথমবারের মতো রেডিওতে শুনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল অনেক জাপানি।

অন্যসব সাম্রাজ্যের মতো অ্যামেরিকাও এ কাজটা করেছে। কিন্তু অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের অনন্যতা হলো, তারা এ কাজটা করেছে এক অভূতপূর্ব মাত্রায়। হলিউড, ম্যাস মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সুশীলসমাজ নামের উচ্ছিষ্টভোগীদের কাজে লাগিয়ে এই মিথ-মেইকিংকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে অ্যামেরিকা। রুপালি পর্দার জাদু, অ্যামেরিকান বাড়িগাড়ি আর নারীর প্রেম ব্রেইনওয়াশ করেছে প্রায় পুরো পৃথিবীকে। মিডিয়ার মায়াজালে আচ্ছন্ন মানুষ যেন ভুগছে বিচিত্র কোনো সামষ্টিক স্টকহোম সিন্ড্রোমে। নিজেকে অ্যামেরিকা উপস্থাপন করেছে সভ্যতার অনিচ্ছুক ত্রাণকর্তা হিসেবে। দায়িত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানবতা আর শান্তির খাতিরে যাকে বারবার হাতে তুলে নিতে হয় অস্ত্র। প্রায় পৌরাণিক ক্ষমতার অধিকারী এ ত্রাণকর্তা কখনো র‍্যাম্বো, কখনো নানা রঙের পোশাক পরা সুপারহিরো আর কখনো অ্যামেরিকান স্নাইপারের চেহারায় উপস্থিত হয় হলিউডের পর্দায়। পৌরাণিক দেবতাদের মতো এ দেবতাও এককেবার জন্ম নেয় এককে রূপে।

মিডিয়ার মায়াজাল এমন এক পরাবাস্তব জগতের সৃষ্টি করেছে যেখানে উল্টে গেছে ভালোমন্দের সংজ্ঞা, ঝাপসা হয়ে গেছে বাস্তবতা আর প্রপাগ্যান্ডার সীমানা। আমরা সবাই এই মিডিয়া মায়াজালের ভেতর ঘুরপাক খাই। মিডিয়া আমাদের শান্তির বুলি

মুখস্থ করায়, আমরাও পুনরাবৃত্তি করে যাই তোতাপাখির মতো। সাম্রাজ্যের ঠিক করে দেয়া শান্তির সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাই না। মিডিয়া আমাদের সন্ত্রাসের একটা সংজ্ঞা শেখায়, আমরাও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হই, ব্যতিব্যস্ত হই নিন্দা জানাতে। কিন্তু শত শত বছর ধরে চলতে থাকা পশ্চিমা বিশ্বের মহাদেশীয় সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিছু করা তো দূরের কথা, কিছু বলার চিন্তাও আমরা করি না। মিডিয়া আমাদের শেখায় মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার কথা। আমরাও মাথা নেড়ে সায় দিই। কিন্তু আমরা তাকাই না এসব গালভরা বুলির আস্তরণের নিচে থাকা সমকামিতা, উভকামিতা, শিশুকামিতাসহ নানা বিকৃতিতে জর্জরিত পশ্চিমা সভ্যতার নোংরা, দুর্গন্ধময় দগদগে ঘায়ের দিকে।

মুনশিয়ানার সাথে অ্যামেরিকান প্রচারযন্ত্র এমন এক জগৎ তৈরি করেছে, যেখানে শব্দগুলো তাদের অর্থ হারিয়ে ফেলে। তারপর ধারণ করে নতুন সব অর্থ, সাম্রাজ্যের আদেশ অনুযায়ী। এ জগতে শান্তি অর্থ যুদ্ধ, স্বাধীনতা অর্থ দাসত্ব আর অজ্ঞতাই হলো শক্তি। শব্দ আর ভাষার নিয়ন্ত্রণে আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সাম্রাজ্য। মিথ্যের বেসাতিতে গড়া অ্যামেরিকার এ আদর্শিক উপনিবেশ ছাড়িয়ে গেছে তাদের শারীরিক সাম্রাজ্যের সীমানা। সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে অনেক বেশি সফলতার সাথে দখল করেছে চিন্তার আগ্রাসনের মাধ্যমে। মানসিক দাসত্বের শেকলে বেঁধে আমাদের বন্দী করে রেখেছে চিন্তার কারাগারে। আজ মিডিয়ার মায়াজালে আটকা পড়া এমন মুসলিমদের অভাব নেই যারা পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামিকে মেনে নিয়েছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার যুদ্ধের বয়ানকে আত্মস্থ করেছে হাসিমুখে এবং খুশিমনে। আজ আমরা চিন্তা করি, স্বপ্ন দেখি, বেঁচে থাকি সাম্রাজ্যের ব্যাকরণে। কারও ইচ্ছে নেই সম্রাটের টেনে দেয়া চিন্তার সীমানার এক চুল বাইরে যাবার। ইচ্ছে জাগলেও কারও নেই সেই স্বাধীনতা। রাজারা বিশ্বাসী না হলেও দুঃখজনকভাবে আমরা প্রজারা অনেকেই পাইকারি খুন আর ধ্বংসের লাইসেন্স দেয়া শান্তি, মানবতা আর গণতন্ত্রের অস্পষ্ট আদর্শিক বুলিতে সাচ্চা বিশ্বাসী হয়ে গেছি।

জাহিলিয়্যাহর যুগে ক্বাবার ভেতর থাকা ৩৬০টি মূর্তির মধ্যে প্রধান ছিল মনুষ্য আকৃতির বিশাল এক মূর্তি। শরীরটা গড়া চকচকে রুবি পাথরে, ডান হাতটা স্বর্ণের[২২]। হুবাল। উহুদের যুদ্ধের পর এ হুবালের নামে স্লোগান দিয়েছিল কুরাইশ। হুবাল ছিল তাওহিদ ও শিরকের লড়াইয়ে মুশরিকদের বেছে নেয়া প্রতীক। বিশ্বজুড়ে আজও শত শত মিথ্যা ইলাহ উপাসিত হলেও তখনকার মতো এখনো কুফরের শক্তি জড়ো হয় এ যুগের

[২২] https://islamqa.info/en/answers/210669/

হুবালের পেছনে, যার নাম অ্যামেরিকা। তখনকার মতো আজও হুবালের বিরোধিতা করা চরম অপরাধ। অ্যামেরিকা নিয়ন্ত্রিত, জাতিসংঘের নামে চালানো এ বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা যাবে না। একটা না, ভাবা যাবে না অর্ধেকটা শব্দও। যা ইচ্ছে করো, যা ইচ্ছে বলো, যতক্ষণ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিচ্ছ, যতক্ষণ হুবালকে মানছ, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ততক্ষণ তোমাকে সহ্য করা হবে। যা করার সিস্টেমের ভেতরে ঢুকে করো, কিন্তু কোনোভাবেই সিস্টেমের বিরোধিতা করা যাবে না। প্রশ্ন করা যাবে না কাঠামো নিয়ে, বিশ্বব্যবস্থা আর সাম্রাজ্য নিয়ে। প্রশ্ন করা যাবে না হুবালের কর্তৃত্ব নিয়ে। অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের যুগে এটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ।

অপরাধী বলে বিবেচিত হবার জন্য কিছু করার, এমনকি বলারও প্রয়োজন নেই, সিস্টেমের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা থাকাই যথেষ্ট। এসব চিন্তা অবৈধ, এসব চিন্তা অপরাধ। যে শরীয়াহর অনুসরণ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ মানবজাতির ওপর ফরয করেছেন, যুগের হুবালের বিরুদ্ধে গিয়ে অ্যামেরিকান বিশ্বব্যবস্থার মোকাবেলায় সেই শরীয়াহ বাস্তবায়ন হোক এটা চাওয়া–কিছু করাও না, কিছু বলাও না–শুধু এটা চাওয়া অপরাধ। কিছু করার দরকার নেই, বলার দরকার নেই, চিন্তাটাই অপরাধ। থটক্রাইম। চিন্তাপরাধ। আর যারা চিন্তাপরাধ করার স্পর্ধা দেখায়–সাম্রাজ্যের খাতায় তারা অবাধ্য, র‍্যাডিকাল, সন্ত্রাসী, বিনা প্রশ্নে গুম, নির্যাতন ও হত্যাযোগ্য না-মানুষ। এই সংজ্ঞাগুলো, এই চিন্তাগুলো আমাদের মন ও মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়া, ওদের কাঠামোয় আমাদের ভাবতে বাধ্য করা হলো অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

যুগের হুবালের চারপাশে গড়ে ওঠা এ মায়াজাল, এ মিথ আর মিস্টিক না ভেঙে চিন্তার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। সাম্রাজ্যের বেঁধে দেয়া ছকের বাইরে গিয়ে সিস্টেমকে প্রশ্ন করা, প্রথাগত প্রথাবিরোধিতা আর নিয়মতান্ত্রিকতার বিভ্রান্তিকে বিসর্জন দিয়ে এ বিশ্বব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের স্পর্ধা হলো মানসিক দাসত্বের বাঁধন ছেঁড়া আর আদর্শিক উপনিবেশ থেকে মুক্ত হবার প্রথম ধাপ, যুগের হুবাল আর তার চারপাশে গড়ে ওঠা মিথ্যের বসত ভাঙার প্রথম হাতিয়ার; চিন্তাপরাধ।

ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক

'সাদা মানুষের বোঝা'

আজ থেকে চল্লিশ বছর পর কেবল মার্কিন দলিল-দস্তাবেজের ওপর ভরসা করে ইরাক যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরা নির্ঘাত অ্যামেরিকান মহানুভবতার তারিফ করবেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বর্বর এক জাতিকে সভ্য করে তোলা আর উন্মাদ স্বৈরাচারের ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের কবল থেকে পুরো পৃথিবীকে রক্ষা করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইরাকে যেতে হয়েছিল নিঃস্বার্থ অ্যামেরিকাকে, হয়তো এভাবেই উপসংহার টানবেন তারা। মার্কিন শান্তিযুদ্ধের বয়ানের আড়ালে চাপা পড়ে যাবে ইরাকে চালানো পাইকারি গণহত্যা, তেলের অতৃপ্ত নেশা, সেনাবাহিনী আর ব্ল্যাকওয়াটারের গা শিউড়ে ওঠা কুকীর্তির ফিরিস্তি। ইতিহাসের ফুটনোটেও হয়তো জায়গা হবে না লাখ লাখ ইরাকীর মৃতদেহের।

ভবিষ্যতের এ ইতিহাসবিদদের মতো করেই গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপিয়ানরা বিরতিহীনভাবে তাদের অসাধারণ সভ্যতার অসাধারণত্বের কথা আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের চোখে মানবসভ্যতার ইতিহাস এক সরলরৈখিক অগ্রগতির গল্প, যার সুন্দর এবং মধুরসমাপ্তি হয়েছে ইউরোপিয়ান সাদা সভ্যতায়। অগুস্ত কঁন্টের মতো দার্শনিকদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সভ্যতার ধারাবাহিকতায় নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আদিম মানুষ পরিপূর্ণতা পেয়েছে আধুনিক ইউরোপে। ইউরোপ হলো সভ্যতার যৌক্তিক ক্রমধারায় অর্জিত চূড়ান্ত উৎকর্ষ।

সভ্যতা বিস্মৃত, চিন্তা অবরুদ্ধ, মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত–এমন এক অবস্থায় আঁধারের বুক চিরে উদয় হলো শুদ্ধির ফিরিঙ্গি সূর্য। সূর্যস্নানে শুচি হলো ধরা। এল চিন্তা, মুক্তি, স্বাধীনতার আলো; শুরু হলো নতুন সভ্যতার নতুন দিন। সেই সাথে

সাদা মানুষের কাঁধে চাপল নতুন এক দায়িত্ব–দুনিয়ার সব বর্বরের কাছে গিয়ে গিয়ে নতুন এ আলোয় তাদের দীক্ষিত করা। তাদের চিন্তা করতে শেখানো, জাতে ওঠানো, আলোকিত মানুষ গড়া। গাঁটের পয়সা খরচ করে, গতরের ঘাম ঝরিয়ে, সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাদা মানুষের বোঝা বহন করে দূরদূরান্তে ছুটে গেল নিঃস্বার্থ ফিরিঙ্গি বেনিয়া। সেই থেকে আজও সে ফেরি করে ফিরছে শ্বেত, শুভ্র ও শুদ্ধ সভ্যতা। ঠিক ইরাকে শান্তি স্থাপনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাওয়া আজকের অ্যামেরিকার মতো।

উপনিবেশ স্থাপন করে বর্বর বিশ্বকে মুক্তি, যুক্তি আর স্বাধীনতা শিখিয়েছে সাদা মানুষ। বিনিময়ে নিজের জন্য নিয়েছে অল্প কিছু সম্পদ। যতোটুকু না নিলেই না। এতে কারও তো কোনো ক্ষতি হয়নি। অসভ্য নেটিভরা সেই সম্পদ দিয়ে করতও বা কী? আর যতটুকু নিয়েছে তাতে কি মানবজাতিকে দেয়া ফিরিঙ্গির ঋণ আদৌ শোধ হয়? ফিরিঙ্গি সভ্যতা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে সভ্যতা, সুশাসন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কার, সংস্কৃতি, আরও কত কী! অল্প কিছু সম্পদ লুট আর ঔপনিবেশিক আমলের কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে একা পুরো বিশ্বকে আধুনিক যুগের আলোয় টেনে তুলেছে ইউরোপ।

এই হলো সাদা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মুখস্থ ইতিহাস, ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান।

ইউরোপ যেহেতু তিন থেকে চার শ বছর আগে 'আলো' চিনেছে, তাই অবশ্যই পুরো বিশ্ব তার আগে আঁধারে ডুবে ছিল। মানবীয় যুক্তিকে এনলাইটেনমেন্ট যেহেতু দেবতার আসনে বসিয়েছে, তাই নিশ্চয় এর আগে পুরো পৃথিবী আচ্ছন্ন ছিল মিথোলজি আর কুসংস্কারে। আর হ্যাঁ, অতীতেও ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস কিংবা রোম ছিল, আধুনিক ফিরিঙ্গি সভ্যতা সেই সব মহান সভ্যতারই ধারাবাহিকতা। সবার ভালোটার সংমিশ্রণে সবার চেয়ে ভালো।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মাঝে মানুষের আদর্শিক বিবর্তনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ খুঁজে পেয়ে ১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফুকোইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তির ঘোষণা ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক এ বয়ানের ফসল। ফুকোইয়ামা একা না, একই ধরনের ধারণা বিভিন্ন আঙ্গিকে খুঁজে পাওয়া যায়, কোজেভ থেকে হেগেল পর্যন্ত অনেকের মাঝেই। নৈতিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারণা পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে সভ্যতাগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসকে উপেক্ষা করে ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক এ চিন্তা। এ চিন্তা আমাদের শেখায় আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা হলো সর্বকালের সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর সভ্যতা। পিছিয়ে

পড়া সমাজগুলোর উন্নতির উপায় হলো পশ্চিমা সভ্যতার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। একটা সমাজ যত উন্নত, আধুনিক, পরিপক্ক হবে, তত সে আরও বেশি করে পশ্চিমের মতো হবে। যখন সে পুরোপুরিভাবে আধুনিক পশ্চিমা সমাজের মতো হতে পারবে তখন সম্পূর্ণ হবে পশ্চাৎপদ সমাজের উন্নতির প্রক্রিয়া। ইতিহাসের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা সহজাতভাবে ফিরিঙ্গি বর্ণবাদ ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লালন করে। এই চিন্তা অবধারিতভাবে এক ও অভিন্ন করে ফেলে সভ্যতা, উন্নতি আর 'পশ্চিমাত্ব'-কে। আমাদের এ উপসংহারে পৌঁছে দেয় যে, পশ্চিমের উন্নতির চাবিকাঠি হলো তাদের এনলাইটেনমেন্ট এবং তাদের পশ্চিমাত্ব। আমাদের অনগ্রসরতার কারণ হলো আমাদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আমাদের অ-পশ্চিমাত্ব। এগুলোকে ঝেড়ে ফেলে পশ্চিমের অনুসরণ করাই হলো আধুনিক, সফল, ধনী ও সভ্য হবার উপায়। সভ্যতা, উন্নতি আর অগ্রগতির অর্থ হলো পশ্চিমের মতো হতে পারা। এ কথা সত্য সমাজ এবং ব্যক্তি, উভয়ের জন্য।

নতুন গল্প, পুরোনো গল্পের মতোই

নিউযিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় ৫০ জন মানুষ খুন করা এবং সে দৃশ্য লাইভ টেলিকাস্ট করা ব্রেন্টন ট্যারান্ট তার ম্যানিফেস্টোতে লিখেছিল,

> *'হারলে ইতিহাস তোমাকে উপস্থাপন করবে দানব হিসেবে... আগে জিততে হবে, ইতিহাস পরে লেখা যাবে। ইতিহাস হলো শক্তি আর ক্ষমতার গল্প। সহিংসতা হলো শক্তি আর সহিংসতাই হলো ইতিহাসের বাস্তবতা'।*[২৩]

আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের তুলনায় নিজের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের ব্যাপারে ঢের ভালো ধারণা রাখে ট্যারান্ট। বেশ অনেকদিন ধরে ইতিহাসের ব্যাপারে সাফল্যের সাথে এ পলিসিই বাস্তবায়ন করে আসছে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা।

ইতিহাস রচিত হয় বিজয়ীদের হাতে। বিজয়ীর চোখেই বিজিত ইতিহাসকে পড়তে শিখে। বাধ্য হয়। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, হলিউড, এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর ম্যাস মিডিয়ার কল্যাণে আমার-আপনার মতো সারা বিশ্বের অ-ফিরিঙ্গিরাও নিজেদের চিন্তার গভীরে গেঁথে নেয় ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান। নিজের অজান্তেই, প্রায় অবচেতনভাবে আমরা ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিকতার জারজ সন্তানে পরিণত হই। নিজেদের 'বন্য', 'বর্বর' পূর্বপুরুষ আর তাদের সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে আমাদের মাঝে কাজ

---

[২৩] The Great Replacement, 2019, Brenton Tarrant

করে তীব্র হীনম্মন্যতা। নানানভাবে চাপা দিতে চাইলেও আমাদের কথা, চিন্তা, কাজে বারবার অপ্রতিরোধ্য স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে নিজেকে ছোট ভাবার, সাদা মানুষের জাতে ওঠার এ বোধ। যার কারণে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ কিংবা পোস্ট কলোনিয়াল কন্ডিশনের সমালোচনায় তুবড়ি ছোটানো লোকেরাও মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের পথ ও পন্থা নিয়ে প্রশ্ন করলে গণতন্ত্র, কল্যাণরাষ্ট্র কিংবা ইসলামী জ্ঞানের 'রেনেসাঁ' ছাড়া অন্য কোনো সমাধান দেখতে কিংবা দেখাতে পারেন না। আমাদের পশ্চিম বিরোধিতা, উত্তরণের স্বপ্ন, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম, কোনোটাই ফিরিঙ্গিদের তৈরি করে দেয়া বাক্সের বাইরে যায় না।

ঝাঁ চকচকে, ঘড়ির কাঁটা মেনে চলা সেলোফিনে মোড়ানো পরিপাটি পশ্চিমা সভ্যতার সাথে নিজেদের দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি আর অস্থিরতায় ভরা দেশগুলোর তুলনা করতে গিয়ে আমরা একসময় ফিরিঙ্গিদের দাবি মেনে নিই। ধরে নিই পশ্চিমের আজকের সাফল্যের মূল রহস্য হলো তাদের আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু ইতিহাস; ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের রাজ্যগুলো ব্যস্ত ছিল নিজেদের মধ্যে একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। নিরন্তর যুদ্ধের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে তাদের গড়ে ওঠে সমীহ জাগানিয়া সামরিক শক্তি, অস্ত্র, রণকৌশল। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বারুদ এবং শক্তিশালী কামানের ব্যবহারে অগ্রগতি। নতুন এ প্রযুক্তির সুবাদে শুরু হওয়া সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে অস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলে বাকি পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যায় ইউরোপ। ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখন বুঝতে পারল তাদের ছোট্ট মহাদেশের বাইরে বিশাল এক অপ্রস্তুত পৃথিবী দখল হবার জন্য বসে আছে, তখন সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যেকার লড়াই বন্ধ করে মানচিত্রজুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল ঔপনিবেশিক লুটপাটে। সামরিক অগ্রগতি এবং নৈতিকতার বাঁধন থেকে মুক্ত হবার কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ আগ্রাসী ফিরিঙ্গিরা দখল করে নিল পৃথিবীর প্রায় ৮৫% এলাকা। সভ্যতা ফেরি করা সাদা মানুষের চালানো অভূতপূর্ব মাত্রার লুটপাটে উপনিবেশগুলো থেকে সব সম্পদ গিয়ে জমা হতে লাগল ইউরোপে। দিন দিন বাড়তে থাকল ফিরিঙ্গিদের সম্পদের পাহাড়, দরিদ্র হতে থাকল বাকি বিশ্ব।[২৪] উপনিবেশগুলোকে শুষে ছিবড়ে বানানোর পর যখন লুট করার মতো আর কিছু কিংবা কাউকে পাওয়া গেল না, তখন ফিরিঙ্গিরা আবারও মনোযোগ দিলো নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধে। দুই বিশ্বযুদ্ধের নামে পৃথিবীকে উপহার দিলো প্রায় ১০ কোটি মানুষের মৃত্যু।

---

[২৪] *Why Did Europe Conquer the World?*, Philip T. Hoffman (2015)

মাত্র এক শ বছর আগেও যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সারা পৃথিবীর সম্পদ ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল, আজ কেন তারা ধনী এবং বাকি সবাই গরিব, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু না। মুসলিম বিশ্বসহ, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলোর সাথে ইউরো-অ্যামেরিকার যে সম্পদের বৈষম্য আজ আমরা দেখতে পাই সেটা সরাসরি এই ঔপনিবেশিক লুটপাটের ফসল। একটা সহজ উদাহরণ দেখা যাক। ফিরিঙ্গিদের আগ্রাসনের আগে উপমহাদেশের জিডিপি ছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির ২৪.৪%।[২৫] সেটা ফিরিঙ্গিদের আসার আগের কথা। আর ১৯৫২ সালে ব্রিটেন বিদায় নেয়ার সময় ভারতীয় উপমহাদেশের জিডিপি ছিল পৃথিবীর মোট জিডিপির ৩.৮%।[২৬] বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতির ৩.৮% এ পরিণত হবার মাঝের গ্যাপটা হলো অসভ্য বাদামি নেটিভদের জাতে তোলার জন্য সাদা মানুষের ফী। বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওপেন এয়ার টয়লেটে পরিণত হওয়া হলো ফিরিঙ্গির কাছ থেকে সভ্যতা শেখার দাম।

এ বাস্তবতাকে ঐতিহাসিক লেফটেন স্টাভরিয়ানোস ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে,

> *'তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন আর প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন বিচ্ছিন্ন, আলাদা ঘটনা না। বরং এ দুটো কার্যত ও সহজাতভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই অনুন্নয়ন (তৃতীয় বিশ্বের) প্রাথমিক বা আদি অবস্থা না, পশ্চিমা জাতিগুলোর দেখানো শিল্পায়নের পথ অনুসরণ করে যা থেকে উঠে আসতে হবে। আজকে পশ্চিমা দেশগুলোর ঠিক সেই মাত্রায় উন্নত যেই মাত্রায় অন্য দেশগুলো অনুন্নত। উন্নতি ও অনুন্নতির এ অবস্থা হলো একই মুদ্রার দুই পিঠ... অনুন্নয়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাঠামোর কোনো অভ্যন্তরীণ ঘটনা না; বরং এ হলো বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ফসল।'[২৭]*

নেটিভদের ব্যাপারে সভ্য সাদা মানুষদের মনোভাব কেমন ছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায় বিখ্যাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 'লর্ড' সিসিল রোডসের নিচের কথাগুলো থেকে :

---

[২৫] *The Cambridge Economic History of India*: Volume 2, c.1751-c.1970 (1983), *Contours Of The World Economy,* 1-2030 AD (2007), Angus Maddison

[২৬] *Of Oxford, economics, empire, and freedom*, Manmohan Singh, The Hindu. Chennai. 2 October 2005

[২৭] *Global Rift: The Third World Comes of Age,* Chapter 1, L. S. Stavrianos (1981)

'আমি বলি, আমরা (অ্যাংলো-স্যাক্সন) পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জাতি। আমরা পৃথিবীতে যত বেশি ছড়িয়ে পড়ব সেটা মানবজাতির জন্য তত ভালো। পৃথিবীর যেসব জায়গায় এখনো মানুষ নামের জঘন্য সব জীব বসবাস করছে সেগুলোকে যদি অ্যাংলো-স্যাক্সন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তাহলে কী পরিমাণ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে চিন্তা করো!'[২৮]

'আমি রোডেশিয়া দখল করতে চেয়েছিলাম কারণ আমি আসলেই বিশ্বাস করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হলে আফ্রিকা আরও বেশি ধনী, নিরাপদ ও সুখী হবে। মানুষ বলে সাম্রাজ্য গঠন হলো শুধু 'চুরি' এর 'লুটপাট'; কিন্তু রোডেশিয়াতে সবাই সুখে আছে, এমনকি যাদেরকে আমরা অধীনস্থ করেছি তারাও।'[২৯]

'নেটিভদের সাথে আচরণ করতে হবে শিশুর মতো এবং তাদের ভোটাধিকার দেয়া যাবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বরদের সাথে বোঝাপড়ায় আমাদের স্বৈরতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করতে হবে যেমনটা ইন্ডিয়াতে সফলতার সাথে করা হয়েছে।'[৩০]

সিসিল রোডসের মতো খোলাখুলি না বললেও বাকি বিশ্বের ব্যাপারে আজও পশ্চিমা শক্তিগুলো একই ধরনের বর্ণবাদী সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লালন করে। মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখনো তর্ক চলে মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে। পশ্চিমা সরকার এবং মিডিয়াগুলো নিয়মিত নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের প্রশ্নে সবক দেয় আমাদের। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কীভাবে আরও বেশি করে পশ্চিমের মতো হয়ে আধুনিক হতে পারবে তা নিয়ে অ্যাকাডেমিক চালে চলে ফিরিঙ্গি গবেষকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং অবশ্যই এ সবকিছু হয় পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত এবং 'কিছুটা বর্বর' মুসলিম এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অধিবাসীদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে! হতভাগ্য এসব মানুষকে অন্ধকার থেকে পশ্চিমা সভ্যতা, গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতার চোখ ধাঁধানো আলোয় টেনেহিঁচড়ে বের করে আনার উদ্দেশ্যে।

আজকের বুশ, ওবামা, ট্রাম্প এবং ট্রুডোরা এখনো সিসিল রোডসের মতোই সাদা মানুষের ভারী বোঝাটা বয়ে চলে।

---

[২৮] Rhodes, Cecil (1902). Stead, William Thomas, ed. The Last Will and Testament of Cecil John Rhodes, with Elucidatory Notes, to which are Added Some Chapters Describing the Political and Religious Ideas of the Testator, p 58.

[২৯] Cecil Rhodes, The Founder: Cecil Rhodes and the Pursuit of Power

[৩০] Magubane, Bernard M. (1996). *The Making of a Racist State: British Imperialism and the Union of South Africa, 1875–1910*. Trenton, New Jersey: Africa World Press. ISBN 978-0865432413.

বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ে বড় বড় সংখ্যায় মানুষ খুন করার অভ্যাসটা পশ্চিমের নতুন না। যেমন কঙ্গোর অধিবাসীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী বেলজিয়ামের অকথ্য অত্যাচার আর গণহত্যার শুরুটা হয়েছিল 'নেটিভদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' এর নামে। রাবার চাষে বাধ্য করার জন্য চাষিদের স্ত্রী-সন্তানদের জিম্মি করা, নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর জন্য হাত কেটে ফেলা, টর্চার, ধর্ষণ আর পাইকারি হত্যা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐতিহাসিক অ্যাডাম হোকশিল্ডের মতে বেলজিয়ানদের 'জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্পের বলি হয়ে জীবন দিতে হয় কঙ্গোর প্রায় ১ কোটি অধিবাসীর।[৩১] শুধু তাই না, সাদা মানুষদের মনোরঞ্জনে ব্রাসেলসের মানব চিড়িয়াখানায় অ-সাদা মানুষদের পশুর মতো উপস্থাপন করা হতো প্রদর্শনীর জন্য । কেবল ব্রাসেলসেই না; প্যারিস, লন্ডন, হামবর্গ, মিলান, বার্সেলোনা, অ্যান্টওয়েরপ–সমস্ত ইউরোপজুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল হিউম্যান যু বা মানব চিড়িয়াখানা। ইউরোপের এই সভ্য সংস্কৃতি পরে পৌঁছে গিয়েছিল সমুদ্রের ওপারে নিউইয়র্কেও। তুয়ারেগ বেদুঈন, মিসরীয় নুবিয়ান, আদিবাসী অ্যামেরিকান, এস্কিমো, সুরিনামের অধিবাসী, ভারতীয় উপমহাদেশের সিংহলী আদিবাসী, ফিলিপিন্সের অ্যাপাচি ও ইগরট, আর আফ্রিকার নানা জাতের 'নিগার'–সভ্য ফিরিঙ্গিদের সাময়িক আনন্দের জন্য এভাবে পশুর মতো খাঁচায় প্রদর্শিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে সবারই।[৩২]

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তখনকার মতো এখনো ফিরিঙ্গিরা বিশ্বাস করে যে তারা আসলে বাকি পৃথিবীর উপকার করেছে। পার্থক্য হলো আজকের ফিরিঙ্গিরা হয়তো এটুকু স্বীকার করবে যে ঔপনিবেশিক আমলে তাদের বেশ কিছু ভুলত্রুটি হয়েছিল। অল্প কিছু লোক হয়তো মানবতাবিরোধী অপরাধ হবার কথাও স্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করবে। কিন্তু এরাই আবার সাফাই গাইবে গণতন্ত্র, শান্তি ও উদারনৈতিকতার নামে আজকের পৃথিবীতে চালানো ফিরিঙ্গি লুটপাট ও ধ্বংসের। এমন সব যুক্তি দেবে যেগুলো সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক যুক্তির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না। ঘটা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়া হবে ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে নিহত প্রতিটি মার্কিন সেনার নাম, রুপালি পর্দায় তাদের মহিমান্বিত করা হবে র‍্যাম্বো,

---

[৩১] *King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa* (1998), Adam Hochschild

[৩২] *From human zoos to colonial apotheoses: the era of exhibiting the Other,* Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, and Sandrine Lemaire

Moving bodies, displaying nations : national cultures, race and gender in world expositions : Nineteenth to Twenty-first century (2014) Guido Abbattista

Human zoos: When real people were exhibits, BBC, December 27, 2011

ক্যাপ্টেন অ্যামেরিকা, অ্যামেরিকান স্নাইপার কিংবা জিআইজো হিসেবে। কিন্তু কোটি কোটি মুসলিমের জীবন তছনছ করে দেয়া অ্যামেরিকান আগ্রাসন, খুন, ধ্বংস আর ধর্ষণের কথা বলার সময় হবে না বিশ্ব মিডিয়ার। সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের মাত্রা নিয়ে অল্পস্বল্প আলোচনার করার সুযোগ হবে না 'ইসলামী চরমপন্থা' নিয়ে বছরের পর গবেষণা করা বিশ্লেষক, অ্যাকাডেমিক আর বুদ্ধিজীবীদের। সবকিছুর পরও পশ্চিমা বিশ্ব ঠিকই আগ্রাসী অ্যামেরিকাকে হিরো আর প্রতিরোধকারীকে জঙ্গি বলে যাবে। আওড়ে যাবে ফিরিঙ্গি আগ্রাসনকে শান্তি আর আগ্রাসনের প্রতিরোধকে সন্ত্রাস বানানোর মন্ত্র। আর আমরাও দিনের পর দিন এ বুলি শুনব, মানব, বিশ্বাস করব; আর তারপর অবিকল পুনরাবৃত্তি করে যাব।

এ সবকিছুর পেছনে কাজ করে সিসিল রোডসের কথায় সোজাসাপ্টা উঠে আসা ওই সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। তফাত হলো আগে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে ওরা আমাদের হত্যা করত; এখন হত্যা করে দর্শন, রাজনীতি আর মানবাধিকারের কথা বলে। বেলজিয়াম থেকে আসা ফিরিঙ্গির কাছে কঙ্গোর মানুষেরা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শিখতে চায় কি না সেটা কাল মুখ্য ছিল না। অ্যামেরিকা আর ইউরোপের ফেরি করা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার টোটকা ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেন কিংবা সোমালিয়ার মুসলিমরা চায় কি না সেটাও আজ গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হলো মহানুভব ফিরিঙ্গি এটুকু নিজ ইচ্ছায় আমাদের দিতে চেয়েছে। এতেই আমাদের ধন্য হতে হবে।

এ নতুন গল্প সেই পুরোনো গল্পের মতোই।

আদর্শিক উপনিবেশ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর প্রায় ৮৫% ছিল ইউরোপের দখলে।[৩৩] কিন্তু কেবল এ তথ্যটা থেকে ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদের মাত্রা পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব না। দখলদারের ক্ষমতা আর শক্তি কেবল অস্ত্র আর সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে না; বরং অনেক সময় দখলদারির আরও অনেক বেশি শক্তিশালী উপকরণে পরিণত হয় আদর্শ ও দর্শন। এ বাস্তবতাটুকু বুঝতে অনেক সময় ভুল করে ফেলি আমরা। দুই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর উপনিবেশগুলোর ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ। শেষ হয় শারীরিক দাসত্বের পালা। কিন্তু চিন্তাচেতনার ওপর ফিরিঙ্গিদের আদর্শিক উপনিবেশ টিকে যায়।

---

[৩৩] *Why Did Europe Conquer the World?*, Philip T. Hoffman (2015)

ইতিহাসের ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক বয়ান মাথার ভেতরে নিয়ে বড় হওয়া মুসলিম স্বাভাবিকভাবেই কোনো না কোনোভাবে বিশ্বাসের এক সংকটে পড়ে। নিজের চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখে দুর্নীতি, অনিয়ম, অভাব, অন্যায়। অন্যদিকে পশ্চিমের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সম্পদ, সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ। পশ্চিমা সভ্যতার শত সহস্র কোটি নিয়ন বাতির আলোতে তার চোখ ঝলসে যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে এ উপসংহারে আসতে হয় যে, আমাদের পিছিয়ে পড়া বর্তমানের জন্য কোনো না কোনোভাবে দায়ী আমাদের ধর্ম। হয় সে ইসলামকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করে, অথবা বলে ইসলামকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার কথা। মোটকথা সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর জীবন থেকে পাওয়া ইসলামের আদি, অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ বুঝকে সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়–সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে।

যারা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা তো বেশ ভালো আছে। শান্তি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সম্পদ, প্রাচুর্য, অধিকার–কী নেই পশ্চিমে? অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর কী অবস্থা? আমরা পিছিয়ে পড়া, গরিব, আইন নেই, বিচার নেই, অধিকার নেই, এমনকি ভালো সভ্য আচরণের মানুষও নেই। তাহলে ইসলাম মুসলিমদের কী দিলো আর কুফর পশ্চিমকে কী দিলো?

দিনরাত ২৪ ঘণ্টা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, টিভি, সিনেমা, মিডিয়া–সব জায়গা থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমাদের তরুণদের এই মেসেজ দেয়া হয়। তাদের সামনে তুলে ধরা হয় ফিরিঙ্গি সভ্যতার কসমেটিক সার্জারি করা চেহারা, চেপে যাওয়া হয় সাদা সভ্যতার পেছনের কালো অধ্যায়। এ বিষাক্ত বার্তা একবার মাথায় ঢুকে যাবার পর ইসলামের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া কিংবা একেবারে ইসলাম ত্যাগ করা খুব অস্বাভাবিক কিছু না। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যেমন ফিরিঙ্গির মাথায় সাদা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা গেঁথেছে, তেমনি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে পরাজিত মানসিকতা আর সহজাত হীনম্মন্যতা। পুরো দুনিয়াতে আগুন লাগিয়ে দেয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীজুড়ে শোষণ, লুটপাট, রাহাজানি, ধর্ষণের মহাকাব্য রচনা করা ফিরিঙ্গিদের ইতিহাস আমাদের ভাবায় না। গত এক শ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর চালিয়ে যাওয়া একের পর গণহত্যার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। যে সংস্থা আমাদের মাটি চুরি করে সেখানে সন্ত্রাসী ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা তৈরি করে, সেই জাতিসংঘের কাছেই আমরা দেনদরবার করি বিচারের জন্য। আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, ইসলামী শরীয়াহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার যে গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার মাঝেই আমরা ইসলামের উত্তরণের পথ খুঁজি। ঈমান ও কুফরের সংঘাতের প্রশ্ন

আমাদের চিন্তিত করে না। ইসলামের সাথে পশ্চিমা তন্ত্রমন্ত্রের সাংঘর্ষিকতা নিয়ে ভাবার সময়টুকুও আমাদের হয় না। যেকোনো মূল্যে আমরা শুধু ওদের মতো হতে চাই। জাতে উঠতে চাই। চন্দ্রাহতের মতো ঘোরলাগা চোখে আমরা জীবনভর ছুটে চলি ফিরিঙ্গিদের হলুদ, বাদামি কিংবা কালো প্রতিরূপ হবার চেষ্টায়। মুক্তি, উন্নতি, সাফল্যের পথ হিসেবে পশ্চিমের শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে শুষে নেয়া আমরা অবধারিতভাবেই ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসকে স্থান দিই পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনের নিচে। আর এভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ক্ষতি ইউরোপ পুষিয়ে নেয় মানসিক দাসত্বের মাধ্যমে।

তাই বর্তমানে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এটা,

১৪০০ বছর আগেকার ইসলামের সেই বার্তা কি আজও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ? এ শিক্ষা কি আজও বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে? ঘুরিয়ে দিতে পারে ইতিহাসের মোড়?

এ প্রশ্নের জবাবে ফিরিঙ্গি সভ্যতার উত্তর স্পষ্ট। তাদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে সহনশীল ও সচেতন লোকও বলবে, ইসলাম ওই সময়ের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আজ সেই ইসলাম সেকেলে, তামাদি হয়ে গেছে। এখন আর সেই আদর্শকে আঁকড়ে থাকা যাবে না। যদি ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখতেই হয়, তাহলে ইসলামের মধ্যে একটা সংস্কার আনতে হবে—আধুনিকতার সাথে তাল মেলানোর জন্য যেমনটা খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা করেছে। একই ধরনের কথা বলে উম্মাহর নব্য মুরজিয়া আর মু'তাযিলারাও—'আধুনিক সময়ের জন্য আমাদের আধুনিকভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ইসলামী বিধিবিধানগুলো আমাদের সংস্কার করতে হবে অথবা বদলাতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের শিক্ষাগুলো এরই মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতায় যুক্ত করা হয়ে গেছে। কল্যাণরাষ্ট্র, মানবতার মুক্তি, সামাজিক আন্দোলন, গণতন্ত্র এসবের মধ্যেই ইসলামের শিক্ষা মিশে আছে। তার ওপর পশ্চিমারা এসব ধারণাকে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে আমরা তলিয়ে গেছি অজ্ঞতার অন্ধকারে। তাই আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা।' জাতে উঠতে ইচ্ছুক কোনো বুদ্ধিজীবী হয়তো আরও গালভরা শব্দে বলবে শরীয়াহর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত আমূল পরিবর্তনের কথা।

কিছু দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া আজ বিভিন্ন মাত্রায় ওপরের কথাগুলো আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। উম্মাহ আজ বিশ্বাস করে আমাদের উত্তরণের পথ হলো পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, চিন্তা ইত্যাদির সাধনা। বুঝে কিংবা না বুঝে আজ অধিকাংশই মনে করে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফ আস সালেহিনের বুঝ আজ আমাদের জন্য যথেষ্ট

না। সম্পূরক হিসেবে সাথে যুক্ত করতে হবে পশ্চিমা ব্যবস্থা, দর্শন, চিন্তা। এই মানসিক দাসত্ব এবং ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো উম্মাহর উত্তরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

বিংশ শতাব্দীকে এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্টের রিপোর্ট কার্ড হিসেবে দেখা যায়। রেসাল্ট খুব একটা ভালো না। সহিংসতা, খুন, ধ্বংস, জাতিগত নিধন, টর্চার, মানুষ মারার নতুন নতুন প্রযুক্তি, অভূতপূর্ব মাত্রায় গণহত্যা, সমাজ ও নৈতিকতার অধঃপতন–প্রতিটি দিক দিয়ে ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়কে হয় মাত্রা নয় তীব্রতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে আলোকিত ফিরিঙ্গি সভ্যতা। সেই সাথে পশ্চিমা দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষকদের মতেই নৈতিক এবং আদর্শিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা পৌঁছে গেছে খাদের কিনারায়। অথচ আজও ফিরিঙ্গিদের মানসিক গোলামি করে করে আমরা পশ্চিমের অনুকরণ করে যাচ্ছি এবং একে মনে করছি উন্নতির একমাত্র পথ। আজও ফিরিঙ্গিদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাদের দর্শন তৈরি করছে 'নেটিভ'-দের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া আর সাদা প্রভুদের তৈরি করা ছাঁচে গড়ে ওঠা শত সহস্র অনুগত, আজ্ঞাবহ কেরানি।

ফিরিঙ্গি আগ্রাসন আমাদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে তা হলো এই মানসিক দাসত্ব। সম্পদ, কাঠামো, ইত্যাদির ক্ষতি সাময়িক; কিন্তু মানসিক দাসত্ব দীর্ঘমেয়াদি। ফিরিঙ্গিরা যেখানেই গেছে চেষ্টা করেছে বিজিতদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের চেতনায় পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে গেঁথে দিতে। সেনা মোতায়েন না করে, শেকলে না বেঁধেও আজও পশ্চিমারা আমাদের দূরনিয়ন্ত্রিত পাপেটের মতো চালাতে পারছে কারণ সব দখলদারির সাফল্য দিন শেষে নির্ভর করে বিজিত জাতির জ্ঞান, আদর্শ ও আকিদাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ওপর। সাদা মানুষদের পরানো কালো শিকলগুলো শরীর থেকে খুলে এলেও চিন্তার শেকলগুলো এখনো খুলতে পারিনি আমরা। অদৃশ্য এ উপনিবেশের জন্যই হাজার হাজার মাইল দূরে বসে চাবি দেয়া পুতুলের মতো পশ্চিমা লেন্সে পৃথিবীকে দেখতে শেখা এই আমাদের আজও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ফিরিঙ্গিরা।

মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার প্রথম ধাপ হলো আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আবদ্ধ করে রাখা এ অদৃশ্য শেকলগুলোকে চেনা। একই সাথে এ সত্যকে বোঝা যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব সীমিত একটা টাইমফ্রেইমের মধ্যে কাজ করে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত করে দেয় আমাদের চিন্তাকেও। দুই-তিন শ বছরের সভ্যতাকে আমাদের কাছে মনে হয় চিরন্তন, অপ্রতিরোধ্য। অ্যামেরিকা, ন্যাটো কিংবা ইস্রায়েলের সামরিক শক্তিকে আমাদের কাছে অজেয় মনে হয়। কিন্তু এর কোনো কিছুই চিরন্তন না, অজেয় না। নমরূদ, ফিরআউন, আদ, সামূদের অতিকায় সভ্যতাও একসময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে–নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। দিগ্বিজয়ী অ্যালেক্সান্ডারের

বিশাল সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পর মাত্র একটি শতাব্দীও টিকে থাকেনি। মধ্য আর উত্তর এশিয়ার বিস্তীর্ণ স্তেপ ভূমি থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসা একদা অপ্রতিরোধ্য মঙ্গোল বাহিনী হালাকু খানের মৃত্যুর এক শ বছরের মধ্যে নিজ পূর্বপুরুষদের হাজার বছরের প্রকৃতিপূজার ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। পারস্য সম্রাট হরমুযান যাদেরকে মরুভূমিতে ছুটোছুটি করা লক্ষ্যহীন কুকুরের পাল বলে তাচ্ছিল্য করেছিল, সেই আরবরাই হাজার বছরের পার্সিয়ান সাম্রাজ্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করেছেন মাত্র কয়েক বছরে। কোনো ছিটেফোঁটা ছাড়া দুনিয়ার বুক থেকে বেমালুম মিলিয়ে গেছে নিযুত সদস্য বিশিষ্ট নাৎসি ওয়্যারম্যাখট (প্রতিরক্ষা বাহিনী)। কিন্তু তাওহিদের শিক্ষা, ইসলাম আজও টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। অ্যামেরিকার বিমান যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন সব সময় থাকবে আর-রাহমানের আরশের নিচেই। অপ্রতিরোধ্য, চিরন্তন, অজেয়, অমুখাপেক্ষী হলেন এক আল্লাহ, বাকি সবাই ধ্বংস হবে। মুসলিম হিসেবে আমাদের কাজ হলো সেই রাজাধিরাজ, সেই আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁরই দেখানো পথে তাঁরই সন্তুষ্টির অর্জনের চেষ্টা করা।

আজও কুরআনের শিক্ষা সেই একই ক্ষমতা ধারণ করে—যা মরুভূমিতে নিজেদের মধ্যে অন্তহীন, অর্থহীন যুদ্ধে ব্যস্ত একদল বেদুইনকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল পৃথিবীর। জন্ম দিয়েছিল এক হাজার বছরের এক গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার। কিন্তু সেই কুরআনের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবার বদলে আমরা এখনো মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছি ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক মুগ্ধতায়, গোঁ ধরে অনুসরণ করে যাচ্ছি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের, তাদের গিরগিটির গর্তের গভীর থেকে আরও গভীরে।[৩৪]

[৩৪] ড. আসাদ যামানের *'European Transition To Secular Thought'*, এবং *'The Conquest Of Knowledge'* অবলম্বনে।

চিন্তার জট

১.

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়েছে। হঠাৎ করেই অচল হয়ে গেল পাঁচ দশকজুড়ে অধিকাংশ মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণের কাঠামো। বদলে গেলো দ্বি-কেন্দ্রিক বিশ্বের সমীকরণ। এমন সময়েই জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রান্সিস ফুকোইয়ামা নামের এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা শুরু করলেন, পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থাই মানব ইতিহাসের সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের চূড়া। মানবজাতির অগ্রগতির একমাত্র পথ ও আদর্শ হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সর্বজনীন মানবাধিকার আর পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত এ বিশ্বব্যবস্থা। এ দাবি অনেকেই মেনে নিলেন স্ব-প্রমাণিত সত্য হিসেবে।[৩৫]

অন্যরকম বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন হার্ভার্ডের স্যামুয়েল হান্টিংটন। ৯৩-এ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হান্টিংটন বললেন, স্নায়ুযুদ্ধের পরের বিশ্বে বদলে যাবে সংঘাতের ধরন। ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো আগের মতো বিভিন্ন দেশের মধ্যে হবে না, হবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে। অ্যামেরিকা-কেন্দ্রিক পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ইসলাম। হান্টিংটন তার এ প্রবন্ধের নাম দেন—সভ্যতার সংঘাত (The Clash of Civilizations)।

কিন্তু কেন সভ্যতার সংঘাত?

কেন দর্শন বা মতবাদের সংঘাত না?

---

[৩৫] *The End of History and the Last Man*, 1992, Francis Fukuyama

হান্টিংটন সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করলেন ধর্ম, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ব্যক্তিপরিচয় (Identity) হিসাবে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তি কোন সভ্যতার অংশ, সেটাই তার পরিচয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ মাপকাঠি। পশ্চিমা সভ্যতার অংশ হবার অর্থ ধর্ম, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে পশ্চিমের অবস্থান থেকে দেখা। পশ্চিমের ব্যাখ্যা ও চিন্তার কাঠামো গ্রহণ করা। 'পশ্চিমা' হবার জন্য আবশ্যিক না ভৌগোলিকভাবে পশ্চিমে অবস্থান করা কিংবা চামড়া একটা নির্দিষ্ট রঙের হওয়া। হান্টিংটন দাবি করলেন, রাজনৈতিক আদর্শ বা স্বার্থের বদলে ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মূল উৎস হবে তাদের সভ্যতাকেন্দ্রিক পরিচয়।

'আপনি কার দলে?' এ প্রশ্নের চাইতে 'আপনি কে?' এই প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হান্টিংটন ইসলামকে ধর্ম হিসেবে না দেখে চিহ্নিত করলেন একটি সভ্যতা হিসেবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইসলাম নিছক একটি ধর্ম না; বরং স্বতন্ত্র আকিদাহ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়া সম্পূর্ণতা–যা অন্য কোনো দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেয় না। মুসলিমরা ভাঙতে কিংবা মচকাতে পারে, কিন্তু ইসলাম বদলায় না। এ কারণেই হান্টিংটন উপসংহার টানলেন, পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসবে ইসলামের দিক থেকে।

মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন দেশ ও জাতিগুলোর উত্থান-পতন ঘটতে থাকে চক্রাকারে। নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে থাকে ভাঙাগড়ার খেলা। একসময়কার সুপারপাওয়ার পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে, আবার সময়ের পালাবদলে সভ্যতার কেন্দ্র একসময় পরিণত হয় পশ্চাৎপদ অঞ্চলে। পেন্ডুলাম দুলতে থাকে। একবার পশ্চিমে আসে, তারপর ধীরে ধীরে আবার যায় পূর্বের দিকে।

তবে আমরা, অধিকাংশ মানুষ এ চক্র খেয়াল করি না, কারণ একটি সভ্যতার উত্থান থেকে পতনের মাঝে লেগে যায় কয়েক শতাব্দী। যেমন : পতনের আগে প্রতিটি সভ্যতা পৌঁছে যায় অবাধ যৌনতা, বিকৃতি ও অধঃপতনের চরমসীমায়। নষ্ট হয়ে যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি। দীর্ঘদিন ধরে চলা বৃদ্ধির পর শুরু হয় অর্থনীতির উল্টোগতি, কিন্তু বদলায় না ভোগে অভ্যস্ত জনসাধারণের মানসিকতা। রোম, বাইযেন্টাইন, মিসর, গ্রিস, ব্যাবিলন–উদাহরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সভ্যতায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ছা-পোষা রুটিনে ব্যস্ত সীমিত আয়ুর আমরা প্যাটার্নগুলো খেয়াল করি না।

পুরোনো সভ্যতার পতনের পর নতুন যে সভ্যতা তার জায়গা দখল করে, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় মৌলিকভাবে আলাদা। অর্থাৎ অনুকরণের মাধ্যমে একটি সভ্যতা

আরেকটিকে পরাজিত করতে পারে না। বরং সে শক্তি অর্জন করে নিজের আলাদা পরিচয়, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে। আর বিদ্যমান সভ্যতার অনুকরণ যে করে যায়, তারা ওই সভ্যতার অংশ হতে পারে; কিন্তু কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী না।

গত প্রায় তিন শ বছর ধরে পেন্ডুলাম হেলে আছে পশ্চিমের দিকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর আর্থিক দিক দিয়ে মুসলিমদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে পশ্চিমা বিশ্ব। এ কারণে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই এ সভ্যতাকে চিরন্তন বলে ধরে নিয়েছে। কিছু করতে হলে এ সিস্টেমের মধ্যেই করতে হবে, এ সভ্যতার অংশ হয়েই করতে হবে, এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসে গেছে তাদের চিন্তাচেতনায়। হয়তো ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তারা মুসলিম, কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে তারা পশ্চিমা। ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চিন্তা, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকার ব্যাপারে ধারণা—সবই তারা নিচ্ছে পশ্চিমের কাছ থেকে। চিন্তা করছে পশ্চিমের ঠিক করে দেয়া বাক্সের ভেতর। এদের কারও অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে পশ্চিমের অনুকরণ। আর আরেকদলের চিন্তার মূল কেন্দ্র হয়ে গেছে 'ইসলাম কী বলে' সেটার চাইতে কীভাবে পশ্চিমাব্যবস্থাকে কিছুটা ইসলামী ফ্লেভার দেয়া যায় সেটা। একদল সরাসরি পশ্চিমকেই বেছে নিয়েছে, অন্যদল ইসলাম প্রতিষ্ঠার বদলে বেছে নিয়েছে ইসলামাইযেইশানকে। চিন্তার মাপকাঠি এখানে পশ্চিমা মূল্যবোধ। হারাম-হালালের নির্ধারক পশ্চিমা সেন্সিটিভিটি।

হান্টিংটন যে সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিল এ মুসলিমরা সেটা বুঝতে ব্যর্থ হলো। তারা মেনে নিল ফুকোইয়ামার কথাই।

২

কিন্তু আসলেই কি তাদের এ চিন্তা ঠিক?

আসুন একটা অঙ্ক মেলানো যাক।

আফ্রিকার দেশগুলোতে অপুষ্টির হার অনেক বেশি।

ইউরোপের দেশগুলোতে অপুষ্টির হার অনেক কম।

আফ্রিকার দেশগুলো গরিব আর ইউরোপের দেশগুলো ধনী।

আফ্রিকার দেশগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সুশাসন ও দুর্নীতি দমনের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে, ইউরোপের দেশগুলো এগিয়ে আছে।

অতএব, আফ্রিকার দেশগুলো গরিব হবার কারণ তাদের জনগণের অপুষ্টির হার বেশি হওয়া।

অন্যদিকে অপুষ্টির হার কম হবার কারণে ইউরোপের এত উন্নতি।

সুতরাং যদি আফ্রিকার দেশগুলো তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চায়, তবে তাদের উচিত আগে অপুষ্টির হার কমানো। (প্রমাণিত)

তাই কি?

ওপরের 'অঙ্কের' সমীকরণ যে ভুল, সেটা মোটামুটি সবার বুঝতে পারার কথা। এখানে ভুলটা হলো কার্যকরণের দিক উল্টে ফেলা। ইউরোপের অপুষ্টির হার কম হওয়া তাদের ধনী হবার কারণ না; বরং ধনী হবার কারণে তাদের দেশগুলোতে অপুষ্টির হার কম। কিন্তু ওপরে অঙ্কে ফলাফলকে মনে করা হচ্ছে কারণ, আর কারণকে মনে করা হচ্ছে ফলাফল। সবাই হয়তো একবাক্যে ভুলটা কোন জায়গায় সেটা বলতে পারবেন না, কিন্তু সহজাতভাবে আমরা সবাই এ ভুল ধরতে পারি। মনের ভেতর খচখচ করে। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা এ ধরনের অনেকগুলো ভুলকে আঁকড়ে ধরে সেই ভিত্তির ওপর ভুলের অট্টালিকা বানাই। ওপরের উদাহরণের লজিকাল ফ্যালাসি ধরতে পারলেও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ফ্যালাসির ওপর ভর দিয়ে আমরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করি।

যখন বিভিন্ন চিন্তক, অ্যাকাডেমিক, পেশাদার বুদ্ধিজীবী কিংবা আলিম বলেন, পশ্চিমের সাফল্যের কারণ হলো তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যেমন : গণতন্ত্র, সেক্যুলারিযম, নারীবাদ, পশ্চিমা মানবাধিকার ইত্যাদি, এবং মুসলিমবিশ্বের উন্নতির জন্য এ দর্শনগুলো গ্রহণ করা উচিত, তখন তারা মূলত ওপরের অঙ্কটার মতো একই ধরনের একটা লজিকাল ভুল করেন। কেউ যখন বলেন, মুসলিমদের উচিত পশ্চিমের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেয়া, তাদের পদ্ধতির অনুসরণ করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় উন্নতি করার মাধ্যমে ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা–তখনো একই রকমের লজিকাল ফ্যালাসিতে তারা পড়ে যান। যখন প্রাচ্যবিদ, মুসলিমবিশ্বের সেক্যুলার কিংবা মুসলিম নামধারীরা বলে ইসলামের কারণেই মুসলিমবিশ্ব আজ পিছিয়ে আছে, আর তাই উন্নতির জন্য ইসলামকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে আধুনিক দর্শন ও চিন্তা–তখন তারাও কথা বলে একই ধরনের ভুলের জায়গা থেকে।

গাড়ির আগে ঘোড়াকে না জুড়ে, তারা ঘোড়ার আগে গাড়িকে জুড়ে দিতে চান। তারপর সামনের দিকে আগানো আর হয় না; বরং উল্টো যাত্রা আরও দীর্ঘায়িত হয়।

এনলাইটেনমেন্ট, শিল্পবিপ্লব, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি, জীবনযাত্রার উন্নত মান– এগুলো ফলাফল। কারণ না। পশ্চিমের উত্থানের মূল কারণ তাদের ঔপনিবেশিক লুটপাট, সামরিক শক্তি আর কূটনীতি। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প প্রতিভা কিংবা আর্মচেয়ার কল্পনাবিলাস না। বহুত্ববাদ আর সহনশীলতার চর্চা না, ধর্মনিরপেক্ষতা না। অপরের অনুকরণে জগাখিচুড়ি পাকানো, আর নিজের মনে নিজেকে বড় মনে করা না। যদি পশ্চিমকে অনুসরণ করেই পশ্চিমের মোকাবেলা করার জেদ কেউ ধরে, তবে তাদের উচিৎ আগে পশ্চিমের উত্থানের মূল চালিকাশক্তিকে সঠিকভাবে চেনা। ডিলিউশান দিয়ে সমাধান হয় না, সমস্যা আরও প্রকট হয়।

৩.

পাশ্চাত্যের সাথে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ দুটি বড় মাপের ভুল করেছে, যেগুলোর মাশুল দিতে হচ্ছে আজও। প্রথম ভুলটা ছিল উসমানি সালতানাতের শেষ দিকে। মুসলিম সভ্যতার জন্য সময়টা ছিল অধঃপতনের। অন্যদিকে এনলাইটেনমেন্ট, উপনিবেশবাদ এবং শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপের জন্য সময়টা ছিল অভাবনীয় উন্নতির। অর্থনীতি, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামরিক দিক দিয়ে ইউরোপ শক্তিশালী হচ্ছিল। ইউরোপীয় আগ্রাসনের মোকাবেলায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমরা। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করার। পশ্চিমা সভ্যতার ভালো ও উপকারী অংশ আর মন্দ ও ক্ষতিকর অংশের মধ্যে পার্থক্য আমরা করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া আর ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব ছিল আমাদের পরাজয়ের মূল কারণ। তবে সঠিকভাবে পশ্চিমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে না পারারও ভূমিকা ছিল। আমাদের পরাজয়ের ফলাফল হিসেবে সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে।

আমাদের দ্বিতীয় ভুলকে প্রথম ভুলের প্রতিক্রিয়া বলা যায়। পরাজয়ের তিক্ত বাস্তবতা যখন আমাদের চিন্তার জগৎকে ধসিয়ে দিলো, যখন এর মাত্রা ও তীব্রতা আমরা অনুভব করলাম, এক প্রান্তিকতা থেকে তখন আমরা ছুটলাম আরেক প্রান্তিকতার দিকে। পশ্চিমের বিরুদ্ধে পরাজয়কে পশ্চিমের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ধরে নিলাম। এবার সিদ্ধান্ত নিলাম পশ্চিমের অনুকরণের মাধ্যমে-পশ্চিমের মোকাবেলার। ঢালাওভাবে গ্রহণ করা শুরু করলাম তাদের ব্যবস্থা, আদর্শ, দর্শন, আকিদাহ, এমনকি পোশাকও। কোনো প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ছাড়াই বেছে নিলাম অনুকরণ ও অনুসরণের পথ।

প্রথম ভুলের ফলাফল ছিল মুসলিম সভ্যতার পতন। দ্বিতীয় ভুলের ফলাফল হলো এ পরাজিত অবস্থার দীর্ঘায়ন। এ পরাজিত অবস্থাকেই আমাদের মধ্যে বিশাল একটা অংশ এখন অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা মনে করছে। অনেকে নিজেকে পশ্চিমা সভ্যতার অংশ মনে করছে, আবার অনেকে আয়নায় নিজেকে দেখছে পশ্চিমা লেন্সের মধ্য দিয়ে। এমনকি আমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমা সভ্যতার মোকাবেলার কথা বলছে, তাদের অনেকের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছে পশ্চিমকে শ্রেষ্ঠ মনে করা ও অনুসরণ করার প্রবণতা। অনেকে যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন পশ্চিমের ভাষায় ইসলামকে ব্যাখ্যা করা এবং সেই ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। ইসলাম কত মানবিক, বিজ্ঞানসম্মত, ইসলাম গণতন্ত্র শেখায়, মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে, ইসলাম খুব নিরীহ, শান্তশিষ্ট, সবাইকে আর সবকিছুকে মেনে নেয়ার ধর্ম, জিহাদ মানে নফসের যুদ্ধ আর বেশি থেকে বেশি হলে যুদ্ধ মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য—তারা ব্যস্ত হয়ে যান এসব আবোলতাবোল ব্যাখ্যা তৈরি করতে ও বোঝাতে। তারা মনে করেন ইসলাম কত সুন্দর সেটা বোঝাতে পারলেই বুঝি ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের ঐতিহাসিক বিদ্বেষ হুট করে বন্ধ হয়ে যাবে। ফিরিঙ্গি জমিদারদের জাতে ওঠার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন তারা।

আবার অনেকে নিজের ইসলাম নিয়ে এতই হীনম্মন্যতায় ভোগেন যে, পশ্চিমের কাছে নিজেকে উপস্থাপনীয় করার জন্য না—ইসলামকে মানবিক, বৈজ্ঞানিক, আধুনিক ইত্যাদি প্রমাণ করা তার নিজের ঈমান রক্ষার জন্যই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে উম্মাহর বিজয়ের পথ খুঁজে পান 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে' উন্নতির মাঝে। একটি সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তার পাকাপোক্ত হওয়া, প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের পর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি—এতসব পর্যায়ের পর যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কথা আসে, সেই ঐতিহাসিক ও অপরিবর্তনীয় সত্য নিয়ে ভাবার সময় তাদের হয় না। পুঁজি ছাড়া তারা শুধু বিনিয়োগের না, স্বপ্ন দেখেন বিনিয়োগ-পরবর্তী লাভেরও। অন্ধ অনুসরণের ফলাফল হিসেবে গড়ে ওঠে ইসলামী গণতন্ত্র, ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ফেমিনিযমসহ অনেক, বিচিত্র, মুখস্থ 'ধারণা'। এবং সামষ্টিকভাবে এ সবকিছু দীর্ঘায়িত করে আমাদের পরাজিত অবস্থাকে।

এ সবকিছুর মূল কারণ হলো এ ধরনের মানুষগুলো একটি উপসংহারকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তারপর এ উপসংহারের সাথে মেলানোর জন্য বদলে নিচ্ছেন বাকি সবকিছু। ব্যাপারটা অঙ্কের মুখস্থ উত্তর লিখে তারপর উল্টো হিসেবে মেলাবার মতো। পশ্চিমা সভ্যতার মোকাবেলার বদলে তারা বেছে নিয়েছেন পশ্চিমের অনুসরণকে। পশ্চিমা সভ্যতার দর্শন আর ইসলামী আদর্শের মৌলিক সংঘাতের কারণে

অবধারিতভাবেই এ কাজটা করতে গিয়ে তাদের বদলাতে হচ্ছে ইসলামকে। তারা ইসলামকে কাস্টোমাইয করে সেটাকেই ভাবছেন চিন্তার উৎকর্ষ, অগ্রগতি, ইজতিহাদ, এমনকি 'তাজদিদ'। কিন্তু যেটাকে তারা উৎকর্ষ ভাবছেন, যেসব মন জোগানো মুখস্থ রেটরিক আওড়ানো আর ব্যাখ্যা দেয়াকে কৃতিত্বের বিষয় মনে করছেনয়, সেটা আসলে চরমমাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়। পশ্চিমা চিন্তার ইসলামীকরণ–যেটা আসলে ইসলামের কাস্টোমাইযেইশান–অগ্রগতি বা প্রগতি না, মুক্তির কোনো পথও না। বরং এ হলো পরাজয়, সামরিক পরাজয়ের চেয়েও ভয়ংকর এক পরাজয়।

চিন্তার এ পরাজয় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, ক্ষতি করে। তবে এ পরাজিত মানসিকতার ক্ষতিকর প্রভাবের সবচেয়ে সহজলভ্য উদাহরণ হলো পশ্চিমা সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ইসলামের সর্বজনস্বীকৃত বিভিন্ন বিষয়কে হয় অস্বীকার, নয়তো নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা। কেউ কুরআনের আয়াত নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে, কেউ দেয় ঈমান-কুফর, মুমিন ও কাফিরের নতুন নতুন সংজ্ঞা। শরীয়াহর বিভিন্ন বিধানকে কেউ বর্তমানে অনুপযোগী বলে, কেউ সাময়িকভাবে স্থগিত করার কথা বলে; আবার কেউ কেউ তো সরাসরি 'বর্বর' বলে অস্বীকার করে। অনেকে সরাসরি হাদীস অস্বীকার করে আবার অনেকে যুগের সেন্টিমেন্টের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে অস্বীকার করে শর্তসাপেক্ষে। অনেকে আবার 'ইসলামী স্মার্ট' হবার আশায় নতুন করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সীরাতকে ব্যাখ্যা করা শুরু করে। একজন সীরাতের মাঝে নির্ঝঞ্ঝাট, ছা-পোষা জীবনের অজুহাত খুঁজে বেড়ায় তো অন্য কেউ ফাঁদে সিক্সপ্যাকের গল্প। কেউ আবার সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ম্যানিয়ার মতো যেসব চরমমাত্রার বিকৃতি মেনে নেয়াকে পশ্চিমারা আধুনিক, সভ্য ও মুক্তচিন্তক হবার স্ট্যান্ডার্ড বানিয়েছে, সেগুলোকে হালকাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে।

এ ধরনের ধারণায় বিশ্বাসীদের অনেকেই নিজেদের অবস্থানের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন নানা শ্রুতিমধুর অজুহাতে। বিরোধিতার মুখোমুখি হলে আফসোস করেন মুসলিমদের মধ্যে ক্রিটিকাল থিংকিং-এর অভাব নিয়ে। খুব সুন্দর কিছু কথার মধ্য দিয়ে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেন দ্বীন বিকৃতির এ বিষাক্ত বিশ্বাস। তারা বলেন,

'ইসলাম সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। তাই ইসলাম কোনো সময়ের সাথে খাপ খাবে না–এমন হতেই পারে না। সমস্যা হচ্ছে, আমরা সঠিকভাবে ইসলামের শিক্ষাকে বুঝতে পারছি না। কিছু পুরোনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে ধরে আছি। চিন্তাগত জড়তা ছেড়ে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম হিসেবে আমাদের পরিবর্তনশীল সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা দরকার।'

কথাগুলো শুনতে ভালো কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ। তাদের এ কথার অর্থ হলো, পশ্চিমা সভ্যতার বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানার জন্য আমাদের নতুনভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা উচিত। এ ধরনের চিন্তার জগতে পশ্চিমা সভ্যতা ধ্রুবক, ইসলাম পরিবর্তনশীল। ক্রিটিকাল থিংকিং বলতে তারা বোঝান ইসলামকে বদলে নেয়া, যাতে করে তা পশ্চিমের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আমাদের মধ্যে ক্রিটিকাল থিংকিং-এর অভাব আছে, চর্চা প্রয়োজন—এ কথার সাথে আমরা একমত। তবে সেটা পশ্চিমের ছাঁচে ফেলে নতুন ইসলাম তৈরির জন্য না। আমাদের চিন্তার গভীরতা বাড়ানো প্রয়োজন পশ্চিমা ধারণাগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য। যেসব ধারণাকে চোখ বন্ধ করে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, সেগুলো কীভাবে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করছে, কী ধরনের ফলাফল বয়ে আনছে তা বোঝার জন্য। পশ্চিমা সভ্যতার যে বিষয়গুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেয়ার জন্য। শত্রুর দুর্বলতা আর শক্তির জায়গাগুলো চেনার জন্য আমাদের ক্রিটিকাল থিংকিং-এর প্রয়োজন। মুসলিমদের পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য, উম্মাহ যেন শত্রুকে চিনতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য, শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকরী যুদ্ধকৌশল বেছে নেয়ার জন্য গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দরকার। ক্রিটিকাল থিংকিং প্রয়োজন পশ্চিমের অনুকরণ থেকে বের হয়ে আসার জন্য। বিদ্বান সাজার জন্য না।

যতক্ষণ উম্মাহ পশ্চিমের অনুসরণ করে যাবে ততক্ষণ মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এ মানসিক দাসত্ব কেবল পরাজয়ের ফলাফল না; বরং আমাদের জন্য এখন এটা পরিণত হয়েছে শারীরিক দাসত্বের প্রধান কারণে। পশ্চিমাদের কাছে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করার বদলে প্রয়োজন পশ্চিমের বাস্তব অবস্থা মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরা । গণতন্ত্র, পশ্চিমা মানবাধিকার, সেক্যুলার হিউম্যানিযম, ফেমিনিযম, পশ্চিমের সিস্টেম্যাটিক যৌনবিকৃতি, ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্ট, ব্যাংকিং সিস্টেম, পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকৃতি, পশ্চিমা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙন—মানসিক দাসত্ব থেকে বের হয়ে আসার জন্য পশ্চিমা সভ্যতার এসব ধারণার বাস্তবতা উম্মাহর সামনে বোধগম্য করে তুলে ধরা প্রয়োজন। উল্টোটা না।

কিন্তু যদি আমরা গোঁ ধরি অন্ধভাবে অনুসরণের, তাহলে শুধু আমাদের পরাজয়ের অধ্যায় দীর্ঘায়িতই হবে না; বরং যে অন্ধকার গহ্বরের কিনারায় পশ্চিমা সভ্যতা পৌঁছে গেছে তাদের সাথে সাথে আমাদেরও জায়গা হবে তার তলদেশে।

বিজিত সব সময় বিজয়ীর অনুসরণ করে। অনুসরণ করে বিজয়ী হওয়া যায় না।

পূজারি ও পূজিত

১.

উল্টানো পেন্টাগ্রাম খোদাই করা সিংহাসনে বসা মূর্তিটার শরীর মানুষের, মাথা ছাগলের। বাঁকানো দুই শিং, মাঝে জ্বলন্ত মশাল। কাঁধের পেছন থেকে বেরিয়ে আছে এক জোড়া পাখা। পেশিবহুল হাতগুলোর একটা আকাশ আর অন্যটা মাটির দিকে তাক করা। ভাঁজ করা দুপায়ের পাতার জায়গায় পশমি খুর। দুপাশে দাঁড়ানো দুটো শিশু। মুখ তুলে কালো দেবতার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে দুজনেই।

কালো ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্যটা সাড়ে আট ফিট লম্বা, ওজন প্রায় ১ টনের মতো। নাম ব্যাফোমেট।

ব্যাফোমেটের সাথে ইউরোপের পরিচয় মধ্য যুগে, ক্রুসেইডের সময়কার রহস্যময় নাইটস টেম্পলারদের সুবাদে। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে ১৩০৭ এ বিচার শুরু হয় ক্যাথলিক চার্চের একসময়ের চোখের মণি নাইটস টেম্পলারদের। সমকামিতা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্বিনসাধনা এবং ব্যাফোমেট নামের ছাগলমুখো দেবতার উপাসনা– টেম্পলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের লিস্ট ছিল লম্বা এবং বিচিত্র।

মধ্যযুগে ইউরোপে পরিচিতি পাওয়া ব্যাফোমেট নামের 'সত্তা' আধুনিক যুগে পরিণত হয়েছে পশ্চিমা ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্বিনসাধনা এবং শয়তান উপাসনের প্রতীকে।

অ্যামেরিকার ডেট্রয়েট নদীর কাছাকাছি এক পরিত্যক্ত কারখানার ওয়্যারহাউসে মধ্যরাতের ঠিক আগে পর্দা উন্মোচন করা হয় শতাব্দী পুরোনো ব্যাফোমেটের সম্মানে তৈরি নতুন এই ব্যাফোমেট মূর্তির। দিনটি ছিল ২০১৫ এর জুলাইয়ের এক শনিবার। মূর্তিটা বানায় 'স্যাইটানিক টেম্পল' (Satanic Temple, শয়তানি মন্দির) নামের এক

সংগঠন। অ্যামেরিকাতে ওরা নিবন্ধিত একটা ধর্ম হিসেবে। নামে শয়তানি মন্দির হলেও এ সংগঠনের লোকজন সরাসরি সত্তা হিসেবে শয়তানের উপাসনা করে না। বিশ্বাসের দিক থেকে ওরা এনলাইটেনমেন্ট হিউম্যানিস্ট, পাক্কা ভোগবাদী। 'সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই', 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদালত হলো মানুষের বিবেক', 'মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক'–টাইপ লোকজন। শয়তান তাদের কাছে একটা সিম্বল, একটা 'সাহিত্যিক চরিত্র'। যুক্তি, স্বাধীনতা আর প্রথাবিরোধিতার প্রতীক। ব্যাফোমেট হলো শয়তানের প্রতীক।

শয়তানি মন্দিরের ভাষ্যমতে ব্যাফোমেটের মূর্তি বানানোর উদ্দেশ্য উপাসনা না; বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির চর্চা। ২০১২ সালে অ্যামেরিকার ওকলাহোমা রাজ্যের ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে স্থাপন করা হয় বাইবেলের দশ আজ্ঞা-সংবলিত 'টেন কমান্ডমেন্টস মনুমেন্ট' নামের একটি ভাস্কর্য। শুরু থেকেই এ নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক। অন্য সব ধর্মকে বাদ দিয়ে সেক্যুলার দেশের সরকারি ভবনের সামনে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ভাস্কর্য স্থাপনকে অনেকেই দেখেন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লঙ্ঘন হিসেবে। এ বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালে স্যাইটানিক টেম্পল। খুব সহজ কিন্তু শক্তিশালী এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তারা তাদের যুক্তি সাজায়–'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবহার করে খ্রিষ্টানরা যদি তাদের ধর্মের প্রচারণা চালাতে পারে, তাহলে অন্য ধর্মের লোকেরা কেন পারবে না?'

সেক্যুলার দেশে তো অন্য ধর্মের অনুসারীদেরও একই অধিকার থাকার কথা। শুধু সংখ্যাগুরুর ধর্মের নিরাপত্তা আর অধিকার দেয়া হলে সেটাকে তো আর ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। খ্রিষ্টানরা যদি নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাইবেলের দশ আজ্ঞা লেখা ভাস্কর্য বসাতে পারে, তাহলে শয়তান উপাসকদেরও অধিকার আছে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাফোমেট মূর্তি বসানোর। আর এতে বাধা দেয়া হলে সেটা হবে বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সমানাধিকারের নীতির লঙ্ঘন।

এ যুক্তি অনুযায়ী শয়তানি মন্দিরের সদস্যরা ব্যাফোমেট মূর্তি নিয়ে হাজির হয় অ্যামেরিকার বিভিন্ন সরকারি ভবনের প্রাঙ্গণে। স্বভাবতই খ্রিষ্টানদের দিক থেকে আসে তীব্র প্রতিবাদ। এসব প্রদর্শনীর সময় অনেককে স্লোগান দিতে শোনা যায়–'শয়তানের কোনো অধিকার নেই!'

প্রথমবার দেখায় ব্যাফোমেট মূর্তি নিয়ে এ পুরো ঘটনাকে হয়তো পাগলাটে অ্যামেরিকানদের আরেকটা আজগুবি কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাকালে বোঝা যায় এ ঘটনা আসলে ধর্ম ও আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের সামনে হাজির করে গভীর কিছু প্রশ্ন। সব ধর্ম ও বিশ্বাস পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ

না; বরং অনেকগুলোই একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। যা এক ধর্মের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা সেটা অন্য ধর্মের কাছে ধর্মদ্রোহিতা। যেমনটা ব্যাফোমেট মূর্তির ঘটনা থেকে স্পষ্ট। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে? রাষ্ট্র কি অধিকাংশের পক্ষ নেবে? তাতে কি সংরক্ষিত হবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি? রাষ্ট্র কি স্যাইটানিল টেম্পলের যুক্তি মেনে নেবে? যদি মেনে নেয়, তাহলে কি খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বলা যায় না যে রাষ্ট্র ধর্মদ্রোহিতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে? শয়তানি করার বিশ্বাসকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিচ্ছে?

এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন যে স্যাইট্যানিক টেম্পলের দাবি গ্রহণযোগ্য না, কারণ তারা সত্যিকার অর্থে কোনো ধর্ম না। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, 'সতিকার অর্থে' ধর্মের সংজ্ঞা কী? ধর্মের সংজ্ঞা দেয়াটা আসলে কিন্তু অতটা সহজ না। এটাও হয়তো বলা যেতে পারে যে, ব্যাফোমেট মূর্তির ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা আর ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হতে পারে না। এ ঘটনা থেকে সব সেক্যুলার রাষ্ট্র বা সেক্যুলারিযমের নীতির ব্যাপারে কোনো উপসংহার টানা ঠিক হবে না।

কিন্তু এ রকম আরও উদাহরণ আছে। আমাদের কাছে, আমাদের ঘরেই আছে।

২.

১৮৩৫ সালে ভারতের অমৃতসারের কাদিয়ানে জন্ম হয় মির্যা গোলাম কাদিয়ানির। এ লোক প্রথমে দাবি করে সে ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), তারপর দাবি করে সে আল-মাহদী এবং তারপর দাবি করে সে প্রতিশ্রুত মসীহ। শেষমেশ দাবি করে বসে তার কাছে ওহী আসে, সে আল্লাহর প্রেরিত নবী। তবে সে নতুন কোনো শরীয়াহ আনেনি, হারুন আলাইহিস সালাম যেমন মুসা আলাইহিস সালামের অনুগামী নবী ছিলেন তেমনি সেও খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াহর অনুগামী নবী। মির্যা গোলামের অনুসারীরা কাদিয়ানি হিসেবে পরিচিত, যদিও তারা নিজেদের 'আহমাদি' বলে দাবি করে। শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা নানাভাবে কাদিয়ানিদের সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে। মির্যা গোলাম এক অর্থে ছিল ব্রিটিশদের এজেন্ট এবং তার উত্থানের পেছনে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সক্রিয় ভূমিকা। পরবর্তীকালে এ লিস্টে যুক্ত হয়েছে অ্যামেরিকাও। আজও কাদিয়ানিদের মূল হেডকোয়ার্টার লন্ডনে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা এবং মির্যা গোলামকে নবী মনে

করা কাফির কাদিয়ানিরা নিজেদের মুসলিম দাবি করতে চায়।[৩৬] আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে সারা দুনিয়াজুড়ে ইসলামের বিরোধিতা ও মুসলিমের অধিকার হরণে ব্যস্ত যায়নিস্ট-ক্রুসেইডাররা কাদিয়ানিদের 'মুসলিম হবার অধিকার' নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন! কাদিয়ানিদের পক্ষে নিয়মিত লবিয়িং করা হয় ব্রিটেন-অ্যামেরিকা থেকে।

একেবারে শুরু থেকেই কাদিয়ানিদের বিরোধিতা করে আসছেন উপমহাদেশের আলিমগণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যানারে কাদিয়ানি-বিরোধী আন্দোলন করেছেন বাংলাদেশের আলিমরাও। কিছুদিন আগেও ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারিতে কাদিয়ানিরা পঞ্চগড়ে 'জলসা' এবং 'মহাসমাবেশ' করার উদ্যোগ নিলে এর তীব্র বিরোধিতা করে বাংলাদেশের আলিমগণ আবারও কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এ আন্দোলনের মূল দাবি হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদের কাফির ঘোষণা করা, তাদের প্রকাশনা ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করা, কাদিয়ানিদের জন্য ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা (যেমন : কাদিয়ানিদের উপাসনার জায়গাকে 'মসজিদ' না বলে 'উপাসনালয়' বলা)। ২০১৩ তে প্রকাশিত হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফার ৬ নম্বর দাবিটিও ছিল কাদিয়ানিদের নিয়ে। দাবিটি ছিল,

> *'সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।'*[৩৭]

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ এবং সুশীলদের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে আলিমদের এ দাবিগুলোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, কাদিয়ানিরা যদি নিজেদের মুসলিম মনে করে, তাহলে তাদের আত্মপরিচয় পরিবর্তন করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এটি সরাসরি মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং বাংলাদেশে সংবিধানের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সমান ও স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমতো ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা দেয়।[৩৮] নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিকার আছে প্রত্যেক ধর্মের

---

[৩৬] এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাদিয়ানি মতবাদ (পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ), শাইখ ইহসান ইলাহী যহীর;
কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয় (তিন পর্ব), মাসিক আল-কাউসার, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৫, ৭ ও ৮; কাদিয়ানী ধর্মমত : সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধানের সহজ পথ, মাসিক আল-কাউসার, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২; কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও জাতীয় দৈনিকের বিজ্ঞাপন : একটি পর্যালোচনা (দুই পর্ব), মাসিক আল-কাউসার, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ ও ৯

[৩৭] হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ : ১৩ দফা দাবি,
https://bn.wikipedia.org/wiki/হেফাজতে_ইসলাম_বাংলাদেশ#১৩_দফা_দাবী

[৩৮] ২ ক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

অনুসারীদের। কাজেই এ ধরনের দাবি প্রথমত নির্যাতনমূলক, দ্বিতীয়ত অসাংবিধানিক।

ইসলামের অবস্থান থেকে কাদিয়ানিদের কাফির হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং সংবিধানের জায়গা থেকে কাদিয়ানিদের পক্ষাবলম্বনকারীদের কথাগুলো উড়িয়ে দেয়া যায় না। কে মুসলিম আর কে মুসলিম না সেটা কি রাষ্ট্র ঠিক করবে? রাষ্ট্রের কি অধিকার আছে তাকফির[৩৯] করার? কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দাবি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈধতা যাচাই করার এখতিয়ার কি রাষ্ট্রের আছে? রাষ্ট্র যদি কাদিয়ানিদের কাফির ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে কি সেটা–তাত্ত্বিকভাবে হলেও–অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হবে না?

অন্যদিকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানিদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব। কাদিয়ানিদের জন্য যেটা ধর্মীয় স্বাধীনতা মুসলিমদের জন্য সেটা জঘন্য ধর্মদ্রোহিতা। কাদিয়ানিদের তাদের সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত অধিকার দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি তাদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এ যুক্তি কিন্তু কেউ দিলেও দিতে পারে। রাষ্ট্র এখানে যার পক্ষই নিক না কেন, সেটা হবে কারও না কারও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

যতই 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' বলা হোক না কেন, একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকতে পারে না। সেক্যুলারিযম যা দিতে পারে তা হলো সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে, সেক্যুলারিযমের সীমার ভেতরে থেকে কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস, কথা ও কাজের স্বাধীনতা। ব্যাফোমেট কিংবা কাদিয়ানিদের নিয়ে ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে এ সত্যটা আমাদের দেখিয়ে দেয়।

পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার কারণে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতি বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে আজ বিশ্বব্যাপী মেনে নেয়া হয়েছে। মধ্য যুগে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি এবং খ্রিষ্টানের নিজেদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী নানা বিরোধের প্রেক্ষাপটে জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিযমের। ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব এবং এর ফলে জন্মানো মানসিক দাসত্বের কারণে ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বজুড়ে সেক্যুলারিযম পরিণত হয় রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌলিক আদর্শিক ভিত্তিতে। সেক্যুলারিস্টদের যুক্তি হলো, রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র সব নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মকে গুরুত্ব দিলে অন্য ধর্মের নাগরিকরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও একঘরে ভাবতে পারে। ভাবতে পারে যে এর মাধ্যমে

[৩৯] কাউকে কাফির ঘোষণা করা

তাদের ওপর অন্য ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। হয়তো এতে করে নিজ নিজ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তারা বাধাগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি তারা বৈষম্যের শিকার হতে পারে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রেও। যার ফলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘর্ষ, যা বাধার সৃষ্টি করবে রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতির সমর্থকরা মনে করে, রাষ্ট্রের জন্য সেক্যুলার অবস্থান নেয়াটাই সবচেয়ে ভালো। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে সমর্থন করবে না আবার কোনো ধর্মকে অস্বীকারও করবে না। রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করবে এবং নিজ নিজ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করবে। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে, নিশ্চিত করবে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা।

ব্যাফোমেটের মূর্তির ক্ষেত্রে শয়তানি মন্দির ঠিক এ যুক্তিই ব্যবহার করেছে।

কিন্তু বাস্তবতা এ দাবিগুলো সমর্থন করে? আমরা এরই মধ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রে সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবির অসারতার প্রমাণ দেখেছি। এখন দেখা যাক সেক্যুলার রাষ্ট্র ঠিক কী ধরনের 'স্বাধীনতা' ধর্মগুলোকে দেয়।

৩.

স্কুলে কিশোর-কিশোরীদের একসাথে সাঁতার শেখার বাধ্যতামূলক ক্লাসে নিজেদের ১২ ও ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে তুর্কী বংশোদ্ভূত সুইস নাগরিক বাবা-মাকে প্রায় ষোল শ পাউন্ডের মতো জরিমানা করে বসে সুইটযারল্যান্ডের এক স্কুল। দাবি করে, সাঁতার শেখার ক্লাস স্কুল কারিকুলামের অংশ, তাই সন্তানদের এ ধরনের ক্লাসে না পাঠানোর কোনো এখতিয়ার অভিভাবকদের নেই। জবাবে মামলা করে দেন দুই কিশোরীর বাবা-মা। তাদের যুক্তি হলো, পুরুষের উপস্থিতিতে একই সুইমিং পুলে মেয়েদের সাঁতার শেখা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বৈধ না, স্কুল তাদেরকে এ ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারে না। এটা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ। মামলা নাকচ করে দেয় সুইস আদালত। হাল না ছেড়ে তারা যান ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস (ECHR) এর কাছে। ইউরোপিয়ান কোর্টও রায় দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সুইস আদালতের পক্ষে। রায়ে বলা হয়, অভিভাবকদের আপত্তি অগ্রহণযোগ্য এবং মুসলিম অভিভাবকরা তাদের কিশোরী মেয়েদের ছেলেদের সাথে একই সাঁতারের ক্লাসে পাঠাতে আইনত বাধ্য। ইউরোপিয়ান আদালতের বিচারকরা স্বীকার করে যে,

অভিভাবকদের এভাবে বাধ্য করার কারণে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে আদালতের মতে, হস্তক্ষেপ হলেও এতে ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন হচ্ছে না।[৮০] ঘটনাটা ২০১৭ এর।

তার কিছুদিন আগে ২০১৬ তে একই রকম মামলায় জার্মান আদালতের রায়ে বলা হয়, মুসলিম কিশোরীরা ছেলেদের সাথে সাঁতারের ক্লাস করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অব্যাহতি পাবার অধিকার তাদের নেই।[৮১] ২০১৬ তেই সুইটযারল্যান্ডের এক মুসলিম পরিবারকে প্রায় ৫,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হয়, কারণ তাদের ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে স্কুলের মহিলা শিক্ষকের সাথে হাত মেলাতে রাজি হয়নি। একই ধারাবাহিকতায় মিউনিসিপ্যাল কমিটির সাক্ষাৎকারে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে হাত না মেলানোর কারণে ২০১৮ তে এক মুসলিম দম্পতির নাগরিকত্বের আবেদন বাতিল করা হয়।[৮২]

ইউরোপের ৭টি দেশসহ পৃথিবীর মোট ১৩টি দেশে নিকাব এবং বোরকা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া মিসর, আলজেরিয়া, মরক্কোসহ মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিকাব কিংবা বোরকা পরার কারণে নানান সময়ে মুসলিম নারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে বৈষম্যমূলক আচরণের। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা অথবা বৈষম্যকে বৈধতা দেয়া হয়েছে কোনো না কোনোভাবে সেক্যুলারিযমের দোহাই দিয়ে। ২০১১ তে ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে নিকাবকে অবৈধ ঘোষণা করে ফ্রান্স। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোযি ঘোষণা করে, পর্দা নারীর দাসত্ব ও শোষণের চিহ্ন এবং সেক্যুলার ফ্রান্সে এর কোনো জায়গা নেই। কোনো মহিলা জনসম্মুখে নিকাব পরে বের হলে তাকে ১৫০ ইউরো ফাইন করা হবে। অভিভাবক বা স্বামী যদি কোনো নারীকে নিকাব করতে বাধ্য করে, তবে তাকে জরিমানা করা হবে ৩০,০০০ ইউরো।

২০১৪ সালে একজন ফ্রেঞ্চ মুসলিম নারী এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেন ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে (ECHR)। সেই একই যুক্তিতে, এই

---

[৮০] Muslim parents must send children to mixed swimming lessons, court rules, Politico, November 1, 2017

[৮১] Germany's top court rules Muslim schoolgirls must join swimming lessons, Reuters, December 8, 2016

[৮২] Swiss ruling overturns Muslim pupils' handshake exemption, *The Guardian*, Wed 25 May 2016

After refusing a handshake, a Muslim couple was denied Swiss citizenship, *The Washingto Post*, August 18, 2018

আইনের কারণে তার ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কোর্টের রায়ে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়। একই রকম রায় দেয়া হয় বেলজিয়ামের নিকাব নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে করা আরেক মামলায় এবং ২০১৭ তে বেলজিয়ান কোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখে ইউরোপিয়ান কোর্ট। সেক্যুলার কোর্টের সিদ্ধান্তে জানিয়ে দেয়া হয়, নিকাব নিষিদ্ধ করার কারণে ইসলামের বিধানের লঙ্ঘন হচ্ছে না!

যেসব দেশে এখনো নিকাব নিষিদ্ধ করা হয়নি, যেমন ব্রিটেন, সেগুলোতেও জোর বিতর্ক চলছে নিকাব নিষিদ্ধ করে নতুন আইন বানানোর ব্যাপারে।[৪৩]

এসবের পাশাপাশি তালাক কিংবা মসজিদ নিয়েও ফতোয়া দিয়েছে সেক্যুলার আদালত।

২০১৭ এর এক রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে তিন তালাক অসাংবিধানিক এবং অনৈসলামিক![৪৪] ২০১৮ তে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৫ সালে বাবরি মসজিদ-বিষয়ক একটি মামলার রায় বহাল রাখে যেখানে বলা হয়েছে, 'মসজিদ ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়। মুসলিমরা যেকোনো জায়গায় নামায পড়তে পারে।'[৪৫]

লক্ষ করুন, প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমরা কোনো আইন ভঙ্গ করেনি। তারা কেবল নিজেদের ধর্মের বিধান মানার চেষ্টা করেছে। সেক্যুলার ইউরোপ, ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়া ইউরোপ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, আলাদাভাবে নতুন আইন তৈরি করে কিংবা ফাইন করে মুসলিমদের বাধা দিয়েছে তাদের ধর্ম পালনে। ভারতের ক্ষেত্রে কোনটা ইসলামের অংশ এবং কোনটা না তা নিয়েই ফতোয়াবাজি শুরু করেছে সেক্যুলার সুপ্রিম কোর্ট। এই হলো সেক্যুলারিযমের দেয়া ধর্মীয় স্বাধীনতার বাস্তবতা। সেক্যুলারিযম এমন ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে যেখানে একসাথে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাঁতার শেখা, পরপুরুষ কিংবা পরনারীর হাত ধরা ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের লঙ্ঘন কি না সেটা ঠিক করে দেয় সেক্যুলার সংসদ কিংবা আদালত। তিন তালাক কিংবা মসজিদ–ইসলাম ধর্মের অংশ কি না সেটাও সেক্যুলার আদালতই ঠিক করে। যে নারী নিকাব করতে চায়, সরকার তাঁকে বাধ্য করে নিকাব খুলতে, শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য! অর্থাৎ ধর্ম কী বলছে সেক্যুলার রাষ্ট্রে সেটা মূল্যহীন, এমনকি যে

---

[৪৩] The Islamic veil across Europe, BBC, 31 May 2018

[৪৪] ভারতে তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ, চূড়ান্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট, বিবিসি বাংলা, ২২ অগাস্ট ২০১৭

[৪৫] Dr. M. Ismail Faruqui Etc, Mohd. ... vs Union Of India And Others on 24 October, 1994

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়, মসজিদ নামাজের জন্য অপরিহার্য নয়, ঢাকা ট্রিবিউন, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৮

বিষয় ধর্মের আওতাভুক্ত বলে সেক্যুলাররিযম স্বীকার করে নেয়, সে ক্ষেত্রেও। ধর্মের কতটুকু পালনযোগ্য আর কতটুকু না, সেক্যুলার সংসদ আর আদালত সেটা ঠিক করবে সেক্যুলার সংবিধান অনুযায়ী। ধর্মের সীমানা ঠিক করে দেবে সরকার।

ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বললেও সেক্যুলারযিম আসলে ধর্মকে নিজের অধীনস্থ করে। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক্‌করণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। প্রত্যেক সেক্যুলার রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি ধর্ম সেক্যুলার সংবিধান, সংসদ ও সরকারের অধীনস্থ। সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে যে ধর্মীয় 'স্বাধীনতা' দেয়া হয় সেটা হলো গোলামকে দেয়া মনিবের স্বাধীনতার মতো। মনিবের মেজাজ-মর্জিমতো এ 'স্বাধীনতা' গায়েব হয়ে যেতে পারে যেকোনো সময়।

৪.

সেক্যুলারিযম বলে রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে। '*Render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's*'। ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে, আর রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের নিয়মে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। ধর্ম থাকবে চার্চ, সিনাগগ, মসজিদ আর মন্দিরে। ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে যা ইচ্ছে সংবিধান মানুক–বাইবেল, তাওরাত, গীতা, কুরআন, কোয়ান্টাম মেথড, স্যাটানিক বাইবেল–কিচ্ছু যায় আসে না। রাষ্ট্রের চোখে সব সমান। কিন্তু শাসন, বিচার, আইন চলবে রাষ্ট্রের সংবিধান দিয়ে। এই সংবিধানই সার্বভৌম। এই মানবরচিত সর্বোচ্চ আইনের ওপর আর কারও কথা চলবে না। হোক সে আল্লাহ, সদাপ্রভু, জিহোভা কিংবা ব্যাফোমেট। এই হলো সেক্যুলারিযম, আর আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। রাষ্ট্রের আইনগুলো গড়ে ওঠে নৈতিকতার কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর। সেক্যুলার আইন বানাতে হলেও ভালোমন্দের একটা মাপকাঠি বেছে নিতে হয়। রাষ্ট্রের যেহেতু সমাজ ও মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হয় তাই তার প্রয়োজন হয় একটা দর্শন এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিরও। সেক্যুলার রাষ্ট্র কোন নৈতিকতা, মাপকাঠি ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে?

বাস্তবতা হলো, যেসব মূল্যবোধ ও প্রাথমিক মূলনীতিলোকে ভিত্তি করে সেক্যুলার আইন গড়ে ওঠে সেগুলো কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহাসিক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপ যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের আইন বানানোর ক্ষেত্রে নিজেদের কিছু কিছু ধর্মীয় (খ্রিষ্টধর্ম) মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছে। আজও পশ্চিমা বিশ্বের পররাষ্ট্র

নীতি, বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বের ব্যাপারে তাদের পলিসিগুলোর ওপর খ্রিষ্টীয় প্রভাব স্পষ্ট। পাশাপাশি তাদের সংবিধানগুলো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দর্শন এবং এনলাইটেনমেন্টের আদর্শের ওপর। সময়ের সাথে সাথে খ্রিষ্টধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব কমেছে, বেড়েছে এনলাইটেনমেন্টের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া ভোগবাদ, বস্তুবাদ আর লিবারেলিযমের প্রভাব। উপমহাদেশের দিকে তাকান। বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও সুশীল সমাজ সেক্যুলারিযম ও অসাম্প্রদায়িকতা বলে যা বোঝায় সেটাকে মোটাদাগে কলকাতার হিন্দু এলিটদের অনুকরণ বললে ভুল হবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামের সাথে এ সবগুলো দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক অথবা আদর্শিক দ্বন্দ্ব আছে। কোপটা তাই বেশী পড়ে ইসলামের ওপরেই। স্বাধীনতার বুলি আওড়ে ইসলামের সমালোচনা করলেও, বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদের তাদের ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা দেয় ইউরোপিয়ান দেশগুলো। সেক্যুলারিযমের কথা বলে ভারতীয় আদালত তালাক আর মসজিদ ইসলামী নাকি অ-ইসলামী, তা নিয়ে ফতোয়া দেয়। ইসলামকে আক্রমণ করাকে আরব ও পাকিস্তানের সেক্যুলারিস্টরা মনে করে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব। এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ফোন ধরে 'হ্যালো' না বলে সালাম দিলে, 'বাই' না বলে 'আল্লাহ হাফেয' বললে, ছেলেদের গোড়ালি আর মেয়েদের মাথার ওপর কাপড় থাকলে–রীতিমতো গবেষণা করে সেটাকে 'ইসলামী উগ্রবাদ' নাম দেয়া হয়, ফলাও করে প্রচার করা হয় জাতীয় পত্রিকায়।[৪৬]

সেক্যুলার রাষ্ট্র ধর্মগুলোর ওপর তার নিজস্ব সেক্যুলার মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়। সব ধর্মের অধিকার সংরক্ষণের বদলে সেক্যুলারিযম সব ধর্মকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ধর্মের কোনো বিধানের সাথে সেক্যুলার আইন সাংঘর্ষিক হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেক্যুলার আইন ধর্মকে বাধ্য করে সেই আইন মেনে নিতে। সেক্যুলারিযমের নিজস্ব হারাম-হালালের কনসেপ্ট আছে। সে আপনার ওপর সেটা চাপিয়ে দেবে। নিজের ধর্মের বিধান আপনি ভাঙতে পারবেন, কিন্তু সেক্যুলার বিধান ভাঙা যাবে না; মানতেই হবে। আপনি মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান যা-ই হন না কেন। যার বেশ অনেকগুলো উদাহরণ আমরা এরই মধ্যে দেখেছি।

আদতে এটা ধর্মনিরপেক্ষতা না; বরং স্বতন্ত্র একটা ধর্মের মতো। যে ধর্মের নাম হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যে ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো সংবিধান। ব্যাবিলনের নমরুদ আর মিসরের ফিরাউনদের মতো যে ধর্মের দেবতা হলো সেক্যুলার শাসক ও সংসদ।

---

[৪৬] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট, প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

সেক্যুলার রাষ্ট্র কার্যত বাকি সব ধর্মকে এই নতুন ধর্ম এবং এর 'পবিত্র গ্রন্থের' অধীনস্থ করে। আর এ কারণেই সেক্যুলার ধর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে, ধর্মের বিধান বদলে দিতে পারে, ধর্মকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে পারে, এমনকি আদালত এটাও ঘোষণা করতে পারে যে মসজিদ ইসলামের অংশ না। কিন্তু একজন মুসলিম তার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে সংবিধানের বিরোধিতা করতে পারে না, সেটা অপরাধ। আল্লাহর আইন উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু আদালতের রায়ের ব্যতিক্রম করা যায় না।

৫.

রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করার এ মতাদর্শের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান কী হবে?

কার আইন প্রাধান্য পাবে? কার বিধান মেনে চলা হবে? কার কর্তৃত্বের কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করব?

সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কে? আইনপ্রণেতা কে?

বিধানদাতা কে?

এ ব্যাপারে সেক্যুলার দর্শনের অবস্থান পরিষ্কার।

অন্যদিকে এ ব্যাপারে কুরআনের অবস্থানও স্পষ্ট।[৪৭] আর এ স্পষ্ট বিষয়টির ব্যাপারে

---

[৪৭] *'...আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ, ৪০)*

'...আল্লাহ বিচার করেন, আর তাঁর বিচারকে (হুকুম) পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই।' (সূরা আর-রা'দ, ৪১)

'...তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।' (সূরা আল-কাহফ, ২৬)

'তারা কি জাহেলী যুগের বিচার-ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?' (সূরা আল-মায়'ইদা, ৫০)

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন–ওর মীমাংসা তো (হুকুম) আল্লাহরই নিকট।' (সূরা আশ-শূরা, ১০)

'...যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আল আন'আম, ১২১)

ইমাম ইবনু কাসির বলেছেন, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কুফর, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা আছে।

যারা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে তাদের জন্য বিষয়টি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করেছেন তাতারদের বিরুদ্ধে দেয়া তার ঐতিহাসিক ফতোয়ায়।[৪৮]

ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো কুরআন শতভাগ আল্লাহর কালাম এবং সুন্নাহ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহর দিকনির্দেশনার ফল। ইসলাম রাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে পারে না, কারণ মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টিও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামে ব্যক্তিগত, সামাজিক আর রাজনৈতিক–আলাদা কিছু না। প্রতিটি ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে শরীয়াহ। এই ইউরোপীয় শ্রেণিবিভাগ, ইউরোপীয়দের জন্য; মুসলিমদের জন্য না। মুসলিমদের কাছে 'ধর্ম' নিছক কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি না। মুসলিমদের জন্য ইসলাম হলো এমন এক জীবনাচার, এমন এক জীবনব্যবস্থা, বিশ্বাসের পাশাপাশি মূল্যবোধ, আচরণ এবং জীবনযাপনের সকল দিক যার অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের অন্ধকার যুগ ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ইউরোপের দুরবস্থার পেছনে ছিল চার্চের সক্রিয় ভূমিকা, অন্যদিকে মুসলিমদের পতনের কারণ ছিল ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ। রোমান ক্যাথলিক চার্চকে আত্মার পরিত্রাণের একমাত্র বাহন বলে বিশ্বাস করা, ক্যাথলিসিযমের মৌলিক বিশ্বাসের একটি। ইসলামে পুরোহিততন্ত্রের কোনো ধারণাই নেই। শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা বা দিকনির্দেশনা খ্রিষ্টধর্ম দেয় না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, সবকিছুর ব্যাপারে ইসলামের আছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও হুকুম। মুসলিমদের আছে এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাস। গণতন্ত্র বা সেক্যুলারিযম ছাড়াই এক হাজার

তিনি বলেছেন, 'অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ ছেড়ে পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোনো শরীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কীরূপ যে আল-ইয়াসিকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শরীয়াহর ওপর স্থান দেয়? এ রকম যে-ই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, "তারা কি জাহেলী যুগের বিচার-ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা আল-মায়'ইদা, ৫০)',

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৩/১১৯। মাকতাবা আল মা'আরিফ, বৈরুত। সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

[৪৮] 'এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণকে বৈধতা দেয়, সে কাফির। আর তার কুফর হলো ওই ব্যক্তির কুফরের ন্যায় যে কিতাবের কিছু আয়াত বিশ্বাস করে আর কিতাবের অন্য কিছু আয়াত অস্বীকার করে'।

শাইখ আল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু' আল ফাতাওয়া, ২৮/৫২৪।

বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবী শাসন করেছে মুসলিমরা। ইউরোপের অন্ধকার যুগের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয়া সেক্যুলারিযম মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য না। সেক্যুলারিযমকে প্রত্যাখ্যান করতে মুসলিমরা বাধ্য, কারণ সেক্যুলারিযম আল্লাহর আইনকে অকার্যকর করে; বাতিল সাব্যস্ত করে।

এখানে যে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহর নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী কিছু কাফিররা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। এ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে বসবাস করা কাফিরদের নিরাপত্তা দেয়া ও শরীয়াহ তাদেরকে যে অধিকার দেয় সেটা সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষরা এ ক্ষেত্রে বলবে ইসলামী আইন সবাইকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন ধরুন, একজন কাফির কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। বেশ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান তো একই। কোনো মুসলিমও তো সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে তার বিশ্বাসের অনেক কিছু বর্জন করতে হয় এবং সেক্যুলারিযম নামের এ ধর্ম ও এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ সংবিধানকে স্থান দিতে হয় ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর। তা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতার গালভরা ফাঁকা বুলির আড়ালে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রও কিন্তু সেক্যুলার সংবিধানের নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সুযোগই দেয়। তাই একটাকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বলা আর অন্যটাকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলা বুদ্ধিবৃত্তিক বাটপারি।

ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো অর্থেই মুসলিমদের জন্য সমাধান হতে পারে না। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দাবি করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া আইনকে বাদ দিয়ে মুসলিমদের মানুষের বানানো সম্পূর্ণ আলাদা বিশ্বাস কাঠামো ও আইন গ্রহণ করতে হবে। মুসলিমদের পক্ষে কখনোই রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক্করণ মেনে নেয়া সম্ভব না। কারণ, এটা আল্লাহর বিধান বাতিল করে মানুষের বিধানের আনুগত্য করতে বলে[৪৯]।

---

[৪৯] এ অংশের কিছু আলোচনা শাইখ জাফর ইদ্রিসের *Separation Of Church & State* শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা হয়েছে।

৬.

আমাদের দেশে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না।

কথাটা আসলে উল্টো। আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র একে একে সব জায়গা থেকে ধর্মকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়েছে। সেক্যুলার রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগে এ জায়গাগুলো ধর্মের ছিল। সেক্যুলারিযম সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে তো সরিয়েছেই, এখন হস্তক্ষেপ করছে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনের ওপরও। ফতোয়া দিচ্ছে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে।

তাই সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না কথাটা অনেকটা দখলদার ইস্রায়েলের রেটোরিকের মতো। দেখবেন ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালানোর সময় ইস্রায়েলি আর্মি ও সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র বলছে, 'ইস্রায়েলের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার আছে। ইস্রায়েলের অধিকার কাছে নিজেকে রক্ষা করার।' যেন আগ্রাসন চালাচ্ছে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা আর নিরীহ, শান্তিকামী ইস্রায়েল কেবল নিজেকে রক্ষা করছে! অথচ বাস্তবতা হলো ইউরোপ থেকে আসা ইহুদীরা ইস্রায়েলের নামে ফিলিস্তিনের মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে, দখল করে রেখেছে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মাসজিদ আল-আক্বসা এবং মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে আসছে সাত দশকের বেশি সময় ধরে। এতকিছুর পর মুসলিমরা যখন মসজিদ এবং মাটি ফিরিয়ে নিতে চায়, দখলদারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তখন ইস্রায়েল বলে–'ইস্রায়েলের অধিকার কাছে নিজেকে রক্ষা করার!' সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না–কথাটা ইস্রায়েলের এই 'নিজেকে রক্ষা করার অধিকারের' কথার মতো। এমন এক মুখস্থ বুলি যা শব্দের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবতাকে উল্টে দেয়।

প্রশ্নটা সব জায়গায় ধর্ম আনার না, প্রশ্নটা হলো আপনারা সব জায়গা থেকে ধর্মকে সরাতে চান কেন? আর যদি চান-ই, তাহলে সেটা সরাসরি স্বীকার করেন না কেন?

মুসলিম হিসেবে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, আমরা কি সেক্যুলার হয়ে সব জায়গা থেকে ধর্মকে সরাতে চাই? কিংবা চিন্তার কোনো বিচিত্র চোরাবালিতে নেমে স্বপ দেখি সেক্যুলারিযমের কাঠামোর ভেতর ইসলাম 'টিকিয়ে রাখার'?

নাকি আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে চাই ইসলামের?

গোড়ায় গলদ

নিউটনের গতিসূত্রগুলো মনে আছে? আর কিছু মনে না থাকলেও তৃতীয় সূত্রটা নিশ্চয় মনে থাকার কথা, 'সকল ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। আচ্ছা বলুন তো, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র আর অর্থনীতির চাহিদা ও জোগানের সূত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

প্রশ্নটা অস্পষ্ট, ঠিক জুতসই হলো না। অনেক ধরনের, অনেক পার্থক্যই তো আছে! আসলে আমি একটা নির্দিষ্ট দিকের কথা জানতে চাচ্ছি। প্রশ্নটা অন্যভাবে করা যাক।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র যেভাবে সঠিক, যে মাত্রায় সঠিক, অর্থনীতি, পলিটিকাল সাইন্স, সমাজতত্ত্ব কিংবা মনোবিজ্ঞানের সূত্র কিংবা উপসংহারগুলো কি একইভাবে, একই মাত্রায় সঠিক?

প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্ন এবং এর উত্তর কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমা সভ্যতা দাবি করে বিজ্ঞানের মতোই সামাজিক বিজ্ঞানগুলোও তথ্য এবং যুক্তির ওপর দাঁড়ানো। অর্থাৎ নিউটনের গতিসূত্র যেমন সত্য, ঠিক তেমনিভাবে চাহিদাজোগান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সমাজতত্ত্বের মৌলিক সূত্রগুলোও ঠিক। তারচেয়ে বড় কথা হলো, ক্যালকুলাস কিংবা জ্যামিতির মতো সামাজিক বিজ্ঞানগুলোও নিরপেক্ষ। ক্যালকুলাস, জ্যামিতি কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র যেমন যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় প্রযোজ্য, তেমনিভাবে প্রযোজ্য সামাজিক বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সূত্রগুলো। এগুলোর পেছনে কোনো আদর্শ বা মতামত নেই। কেবল নিরেট তথ্য-উপাত্ত, বাস্তবতা আর যুক্তি। জাস্ট প্লেইন ফ্যাক্টস।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলো পযিটিভ। নরম্যাটিভ না।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেক্যুলার দর্শনের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো তৈরি হয়েছে পশ্চিমের এক নিজস্ব দর্শন ও ধ্যানধারণাকে ঘিরে। এবং এ শাস্ত্রগুলো কাজ করে সেক্যুলার মূল্যবোধ ও সমাজ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে। নৈতিকতার নিজস্ব ধ্যানধারণার ওপর দাঁড়ানো এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো তাই নিশ্চিতভাবেই সাবজেক্টিভ, যদিও পশ্চিমা বিশ্ব এগুলোকে সন্দেহাতীত সত্য বলে দাবি করতে চায়।

দুঃখজনকভাবে, মোটাদাগে আমরা মুসলিমরা তাদের এ দাবি মেনে নিয়েছি। এ দাবি মেনে নেয়ার কারণে সত্যিকারের বিকল্প খোঁজার বদলে আমরা মনোযোগী হয়েছি পশ্চিমা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামীকরণে। সত্যিকার অর্থে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকগুলোর একটি হলো, ভুল দাবি থেকে জন্ম নেয়া ইসলামীকরণের এ ভুল পদ্ধতি। সেক্যুলার সামাজিক বিজ্ঞান আর ইসলাম একই ধরনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির উদ্দেশ্যে কাজ করে না। বরং এসব বিষয়ে তাদের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীতমুখী। পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ভিত্তি হলো এমন কিছু সেক্যুলার মূলনীতি ও পূর্বধারণা যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আশির দশকে শুরু হওয়া 'জ্ঞানের ইসলামীকরণ' প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চেহারা দেয়া। পাশাপাশি শুরু হয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের ইসলামীকরণ। ইসলামীকরণের এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও ব্যবস্থা নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়। ফলে সত্যিকারের ইসলামী বিকল্প গড়ে তোলার বদলে বিদ্যমান পশ্চিমা কাঠামোর মধ্যে ইসলামকে খাপ খাওয়াতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ দিকেই ব্যয় করতে শুরু করি আমাদের সব সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা।

গত দুই শ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতা অভাবনীয় উন্নতি করেছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। গাড়ি, ট্রেইন, এরোপ্লেইন, ফ্রিজ, রকেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন–এ উন্নতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। প্রযুক্তিগত এ উন্নতি আমাদের জীবনকেও বদলে দিয়েছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানের চোখধাঁধানো এ সাফল্যের কারণে আমাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে একই রকম সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্বের চোখে দেখে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনা সংখ্যা আর অঙ্ক নিয়ে না, মানুষ আর সমাজকে নিয়ে। স্রষ্টা, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বজনীন নৈতিকতার ব্যাপারে পশ্চিমা অস্বীকৃতি সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন ভুল ধারণার।

একদিকে দুনিয়াবি বিষয়ে গভীর বুঝ আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা ও মানুষকে বোঝার ক্ষেত্রে অন্ধত্বের এ মিশ্রণ নতুন না। মক্কায় আবু জাহল পরিচিত ছিল আবুল হাকাম নামে। আল-মাসীহ আদ-দাজ্জাল দুহাত ভরে দুনিয়ার প্রাচুর্য নিয়ে এসে নিজেকে রব দাবি করবে, আর অধিকাংশ তাকে মেনেও নেবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেন :

> *'যখন তাদেরকে বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের মতো তোমরাও ঈমান আনো। তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব?' আসলে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।' (সূরা আল-বাক্বারা, ১৩)*

দুনিয়াবি আর বৈষয়িক ব্যাপারগুলোতে যাদের 'বুদ্ধিমান' মনে করা হয়, সাধারণ মানুষের মতো সরলভাবে বিশ্বাস করা তাদের অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যায়। বিনা প্রশ্নে সত্যকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকতা অনেকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনটাই হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষেত্রে। অভাবনীয় প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষ ও মানবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে পশ্চিমের হয়েছে অভাবনীয় অবনতিও।

পশ্চিমা বিজ্ঞানের সাফল্যের যেমন অনেক প্রমাণ আছে তেমনি প্রমাণ আছে তাদের সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যর্থতার। বেশ কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা সমাজ মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান ও মৌলিক ইউনিট পরিবার। বাড়ছে ডিভোর্স, পরকীয়া আর জারজ সন্তান। প্রতিবছর বৈধভাবে হত্যা করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ গর্ভের শিশুকে। চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে মাদকাসক্তি। পর্ন প্রভাবিত সিনেমা আর মিউযিক ইন্ড্রাস্টি যৌনতার বিকৃত ধারণা ঢুকিয়ে চলেছে সমাজে। সমকামিতা এবং ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মতো বিকৃতিকে শুধু বৈধতাই দেয়া হচ্ছে না; বরং রীতিমতো উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ঘুণে খাওয়া সমাজ, ভাঙা পরিবার আর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব পড়ছে সন্তানদের মনস্তত্ত্ব, পড়াশোনা ও আর্থিক জীবনে। পরিবার থেকে সমাজ ও জীবনের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখার বদলে দশকের পর দশক ধরে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর বেড়ে উঠছে গভীর মানবীয় বন্ধন স্থাপনে অক্ষম হয়ে–হতাশা, ক্ষোভ, মাদকাসক্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে।

অন্যদিকে 'সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার অর্থ অন্যের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা' এ নীতিতে বিশ্বাসী যুদ্ধবাজ অ্যামেরিকা আর জাতিসংঘের 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' কর্মকাণ্ড সংকেত দিচ্ছে জঙ্গলের আইনে ফিরে যাবার। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে পশ্চিমা বিশ্ব খুঁজে বের করেছে নির্যাতনের বৈজ্ঞানিক সব পদ্ধতি। ম্যাস ভায়োলেন্স, গণহত্যা এবং

সমাজ ও মূল্যবোধের ভাঙনের পেছনে আধুনিকতার প্রভাব ও সম্পর্কের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণায়।

অনেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেন। বারবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশগ্রহণ ও উন্নতির ওপর জোর দেয়ার কারণ কী? কারণ, জ্ঞানের এ শাখাগুলোর সাফল্য, উন্নতি ও ফলাফল স্পষ্ট। একই যুক্তিতে আমাদের উচিত পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। কারণ, এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো বয়ে এনেছে ভয়ংকর সব ফলাফল, আজকের পতনোন্মুখ পশ্চিমা সমাজের চিত্র থেকে যা স্পষ্ট। বিস্ময়কর মাত্রার বস্তুগত ও জাগতিক উন্নতি সত্ত্বেও এসব সমাজের মানুষগুলো আজ জীবন কাটাচ্ছে প্রগাঢ় হতাশা, আর বিষণ্ণতায়। সাময়িক সস্তা সুখের উত্তেজনাকে ছাপিয়ে আজ তাদের গ্রাস করে নিয়েছে অর্থহীন অস্তিত্ব আর গন্তব্যহীনতার অনুভূতি।

বিজ্ঞান আর সামাজিক বিজ্ঞানের পার্থক্য

সামাজিক তত্ত্ব আর দর্শনগুলো শুধু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না; বরং বাস্তবতা দ্বারাও অসমর্থিত। তবু কেন আমরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হলাম? এ প্রশ্নের এক লাইনের কোনো উত্তর নেই। এর পেছনে আছে বিভিন্ন ফ্যাক্টর। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামী আলিম ও চিন্তাবিদদের লেখায় পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। পরে একপর্যায়ে দেখা দেয় মুসলিমবিশ্বে রেখে যাওয়া ঔপনিবেশিক ইউরোপিয়ানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করে, কোন কোন দর্শনের ভিত্তিতে এবং কীভাবে এগুলোর সংস্কার সম্ভব, তা বোঝার জন্য পশ্চিমা শিক্ষা অর্জন করা দরকার ছিল।

কিন্তু পশ্চিমা শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে মুসলিমদের অনেকেই নিজস্ব জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাপারে পশ্চিমের অনেক মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এমনই এক মিথ্যা দাবি হলো, পশ্চিমা বিজ্ঞান আর সামাজিক বিজ্ঞান একই রকম সত্য—দুটোর ভিত্তিই হলো নিরেট তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি। অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র আর চাহিদা-জোগানের সূত্র একই রকম, একই মাত্রায় সঠিক। এ মিথ্যা দাবিকে মেনে নেয়ার ফলে মুসলিমরা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে সঠিক হিসেবে ধরে নেয় এবং ইসলামের আলোকে এ দাবিগুলোর মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র কি ইসলামী? এ সূত্রের কি ইসলামী হবার দরকার আছে? আদৌ কি দরকার আছে এ নিয়ে চিন্তা করার? যদি চাহিদা-জোগানের সূত্রও তৃতীয় গতিসূত্রের মতো হয়, তাহলে সেটা নিয়েও নিশ্চয় চিন্তা করার দরকার নেই?

তাই না?

নিতান্ত বোকা ছাড়া আর কেউ কি গাড়ি, বিমান কিংবা অন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করবে, কারণ এগুলো সুন্নাহসম্মত না এবং এগুলো আমাদের শত্রু পশ্চিমাদের বানানো?

নিশ্চয় না।

কিন্তু সমস্যা হলো এ কথা পশ্চিমাদের তৈরি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে খাটলেও তাদের তৈরি সামাজিক বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে খাটে না। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র আর সামাজিক বিজ্ঞানের সূত্র এক না। নিউটনের গতিসূত্রগুলো যেভাবে সঠিক ও নিরপেক্ষ, অর্থনীতির সূত্রগুলো তেমনটা না। কিন্তু আমরা ধরে নিলাম, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রযোজ্য সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। আর এভাবে একসময়, হয়তো নিজেদের অজান্তেই, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিক ক্রমধারায় আমরা পশ্চিমা রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকরী হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আমরা এ উপসংহারে পৌঁছালাম যে, ইলেক্ট্রিসিটি কিংবা গাড়ির মতোই ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, স্টক মার্কেট, সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতিরাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রও আধুনিক বিশ্বে অপরিহার্য। এবং ধরে নিলাম মুসলিমদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের উপায় হলো এসব প্রতিষ্ঠানের ইসলামীকরণ।

পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের শেকড়

অনেক অমিল সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর দিকে মুসলিম ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। দুই সমাজের চিন্তা আবর্তিত হতো ধর্মকে কেন্দ্র করে। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো ধর্মের আলোকে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এ অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন এক বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উত্থান ঘটে সেক্যুলার চিন্তার, যা সীমাবদ্ধ করে ফেলে ধর্ম ও ধর্মের প্রভাবকে। ঠিক কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে, পর্যায়ক্রমে সেক্যুলারিযমের জন্ম ও উত্থান ঘটেছিল তা বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ কাজটা করতে গিয়ে আমাদের মুখোমুখি হতে হয় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার। যেসব উৎস ও আলোচনাকে বর্তমানে পশ্চিমের 'মূলধারা' ধরা হয় সেখানে আপনি এ আলোচনাগুলো খুঁজে পাবেন না। এ বিষয়ে ইউরোপীয় নিজস্ব বয়ানের অধিকাংশই ইতিহাসের এমন এক ছবি তুলে ধরে যা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক এবং মৌলিকভাবে ভুল। এসব ভুল উত্তরের মাঝ থেকে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন।

বাস্তবতা হলো ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর আবির্ভাব ঘটে ধর্মের বিকল্প হিসেবে। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষ ও সমাজের ব্যাপারে মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের আলোকে দিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ সেক্যুলারিযম এবং পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভবই হয়েছে ধর্মের বিকল্প হিসেবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার জন্যে। আর তাই সহজাতভাবেই এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য করা কিংবা এগুলোর ইসলামীকরণ বেশ কঠিন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সেক্যুলারায়নকে আধুনিক পশ্চিম কীভাবে উপস্থাপন করে? ধর্মের জায়গায় সেক্যুলার দর্শন বসানোকে উপস্থাপন করা হয় কুসংস্কারের ওপর যুক্তির বিজয় হিসেবে। এখানে যুক্তি মানে 'বিজ্ঞান' আর কুসংস্কার হলো ক্রিশ্চিয়ানিটি বা ধর্ম। ইতিহাসকে যখন এভাবে তুলে ধরা হয়, যখন ধর্মকে উপস্থাপন করা হয় যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ও নিম্নশ্রেণির হিসেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের ভিতে আঘাত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের আগে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় অনেক চিন্তাবিদ ও লেখক একটি কথা ব্যবহার করতে শুরু করে, Age of Reason। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল অজ্ঞতা ও অন্ধকারের কাল থেকে বের হয়ে তারা প্রবেশ করেছেন যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার আলোয় আলোকিত এক নতুন সময়ে।

কিন্তু বাস্তবতা এতটা গ্ল্যামারাস না। পশ্চিমে তৈরি হওয়া বিশ্বাসের সংকটের কারণ ছিল ক্যাথলিক চার্চের ওপরতলার লোকেদের আদর্শিক দেউলিয়াত্ব। একের পর এক দুর্নীতিপরায়ণ পোপ, তাদের অসুস্থ বিলাসিতা, অনৈতিকতা, চার্চের মাধ্যমে টাকা নিয়ে 'গুনাহ মাফ করা', রক্ষিতার গর্ভে জন্ম নেয়া জারজ সন্তানদের প্রকাশ্যে বৈধতা দেয়ার মতো বিভিন্ন ঘটনা জন্ম দেয় এক চরম সংকটের, যাকে অনেকে ইউরোপের ইতিহাসে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে থাকেন। এ সংকটের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রোটেস্ট্যান্ট ধারা।

নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রোটেস্ট্যান্টরা আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে নানা দল-উপদলে। এ দলগুলো একইসাথে নিজেদের মধ্যে এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। ক্রিশ্চিয়ানিটির নামে চলা এদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ধ্বংস, যুলুম, অবিচার ইত্যাদির কারণে ইউরোপিয়ানদের মনে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। এমনকি ধর্মীয় নেতারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এমন কিছু মৌলিক নীতি প্রয়োজন যেগুলোর ব্যাপারে সমাজের সবাই একমত হবে। ইউরোপের সেক্যুলার চিন্তার উত্থানের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল এই নীতি–ধর্মীয় মূলনীতির বদলে সমাজ তৈরি হবে যুক্তি ও বাস্তবিক জ্ঞানের মাধ্যমে।

ধর্মকে ত্যাগ করার ফলে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ইউরোপীয় সমাজের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যেগুলোর উত্তর আগে ধর্ম থেকে নেয়া হতো। আর এ উত্তরগুলো খোঁজার প্রচেষ্টা হিসেবে জন্ম নেয় পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞান। ধর্ম যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় সেগুলোর বিকল্প উত্তর দেয়াই যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ, তাই ধর্মের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না। তাই শুধু বাইরের চেহারা দেখেই পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে গ্রহণ করা সম্ভব না, আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হওয়াই জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রকল্পের অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণ।

এ কথাগুলো হয়তো খুব বেশি তাত্ত্বিক কথার কচকচি মনে হতে পারে তবে স্রষ্টাকে সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সেক্যুলার চিন্তা খোঁজার চেষ্টা করে, সেগুলোর দিকে তাকালেই সেক্যুলারিযম এবং পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেক্যুলার চিন্তা ৫টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে :

১) মহাবিশ্বের সূচনা কীভাবে হলো?

২) মানুষ কোথা থেকে, কীভাবে এল?

৩) পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? নৈতিকতার ভিত্তি কী?

৪) সমাজব্যবস্থাকে কীভাবে সাজানো উচিত?

৫) জ্ঞানের প্রকৃতি কী? কোন ধারণা বৈধ (valid) আর কোন ধারণা অবৈধ (invalid) সেটা আমরা কীভাবে বুঝব?

এসব প্রশ্নের উত্তরের বেলায় ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। কিন্তু সেক্যুলারিযমের দেয়া উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। স্রষ্টা ও ধর্মকে বাদ দিয়ে এ মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার যে চেষ্টা, তারই নাম সামাজিক বিজ্ঞান। যেহেতু সেক্যুলারিযমের উত্তর সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই যৌক্তিকভাবেই আমাদের পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর প্রথম ধাপ যেহেতু স্রষ্টাকে অস্বীকার করে মানবজীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা, তাই এ শেকড়ের ওপর গজিয়ে ওঠা পশ্চিমা জ্ঞানের ইসলামী বনসাই বানানো সম্ভব না। এ কারণে পশ্চিমা জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোটখাটো ও অমৌলিক কিছু পরিবর্তন এনে সেগুলোকে ইসলামী রূপ দেয়ার চেষ্টা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছে। এ নিষ্ফল ও ক্ষতিকর চেষ্টার বদলে ইবনু খালদুনসহ আমাদের অন্যান্য পূর্বপুরুষদের গড়ে তোলা ভিত্তির ওপর কাজ করার দিকে আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত, যেখানে প্রয়োজনমতো পশ্চিমা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে কাজে লাগানো যাবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধর্মের বদলে সেক্যুলার চিন্তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে ইউরোপীয়রা ৫টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর নতুন করে খুঁজতে বাধ্য হয়। আধুনিক পশ্চিমা অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বগুলোর ওপর এ উত্তরগুলোর প্রভাব ব্যাপক। যেহেতু এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও গ্বাইবকে অস্বীকারের মাধ্যমে, তাই বর্তমানে যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে সেভাবে এসব সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ সম্ভব না। বর্তমানে এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মূল ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে গ্রহণ করে চেষ্টা করা হচ্ছে সেগুলোর ইসলামী রূপ দেয়ার। এ এক অসম্ভব কাজ। বরং আমরা যদি আসলেই এ কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের শুরু করতে হবে আমাদের নিজস্ব ইসলামী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে।[৫০]

---

[৫০] ড. আসাদ যামানের *The Origin of Western Social Sciences* অবলম্বনে।

শুভঙ্করের ফাঁকি

অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ঘরে আটকে রেখে কীভাবে সামনে আগাবেন? মেয়েদের বস্তাবন্দী করে রেখে উন্নয়ন, প্রগতি আর পশ্চিমের সাথে পাল্লা দেয়ার স্বপ্ন দেখেন কীভাবে?

খুব জনপ্রিয় প্রশ্ন। তবে প্রশ্নগুলো মুখ্য না, মুখ্য হলো এর আড়ালে থাকা বক্তব্যটা– অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অংশ নেয়া প্রয়োজন। জাতির অর্ধেকটা ঘরে বসিয়ে রাখার অর্থ হলো, তারা অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এটা একটা বিশাল লস। এটা অপটিমাল না, এটা ইন-এফিশিয়েন্ট। আমাদের মানবসম্পদের সঠিক ব্যবহার এভাবে হবে না। এভাবে কস্মিনকালেও আমাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আমরা অর্জন করতে পারব না। কর্মক্ষেত্র থেকে মেয়েদের দূরে রাখা, তাদের ঘরে আটকে রাখা আর বাইরে 'বস্তাবন্দী' করে আনা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, উন্নতির পথে বাধা, সমাজের জন্য হুমকি।

শুনতে বেশ যৌক্তিক মনে হয়, স্বীকার করতেই হবে। প্রতিটাতে দশজন করে যাত্রী থাকা দুটো নৌকার একটাতে যদি দশজন দাঁড় চালায় আর অন্যটায় পাঁচজন, তাহলে কোনটা সামনে যাবে?

খুব সহজ যুক্তি। এ যুক্তি বোঝার জন্য বিশাল বিদ্বান হবার প্রয়োজন হয় না। ফেমিনিস্টদের জনপ্রিয় করা এ যুক্তির এতবার, এত বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, ঘোরতর ধার্মিক বলে পরিচিত অনেক মানুষও এখন একে সত্য বলে মেনে নেন। তবে সহজ এবং আপাতদৃষ্টিতে শক্ত এ যুক্তির মাঝে ফাঁকি আছে। এ পুরো আর্গুমেন্টটা দাঁড়িয়ে আছে দুটো নির্দিষ্ট ধারণার ওপর। সহজ দুটো প্রশ্ন দিয়ে এ পুরো বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করা যায়,

ক) সম্পদ কী?

খ) উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি কী? কীভাবে এর সংজ্ঞায়ন করা হবে?

এ যুক্তির ফাঁকিটা ধরতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে এ দুটো কনসেপ্ট এবং তাদের সংজ্ঞায়ন নিয়ে।

অর্থনীতির ভুল নীতি

মাদক ব্যবসা আর জুয়াকে কি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলা যায়?

এসব করে ব্যবসায়ী নিজে প্রচুর টাকা কামায়, এটুকু নিশ্চিত। কাজেই বলা যেতে পারে যে, মাদক ব্যবসা বা জুয়া ব্যবসায়ীর জন্য লাভজনক। কিন্তু এ ব্যবসাগুলোর কারণে সমাজের কী অর্থনৈতিক উন্নতি হয়? নতুন সম্পদ কি তৈরি হয় সমাজে? অবশ্যই না।

যেকোনো সমাজের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন নতুন সম্পদ সৃষ্টি ও পুরোনো সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ। ব্যক্তিবিশেষের জন্য লাভজনক হলেও মাদক ব্যবসা কিংবা জুয়া এ দুটো কাজের কোনোটাই করে না। এগুলোর মাধ্যমে অর্থনীতিতে কোনো নতুন সম্পদ তো সৃষ্টি হয়ই না; বরং এগুলোর পেছনে নষ্ট হয় সমাজের অনেক সদস্যের সময়, শ্রম ও সম্পদ। উন্নয়নের বদলে এগুলোর কারণে বরং সমাজের ক্ষতি হয়। তবুও এ কাজগুলো কিন্তু লাভজনক। একই রকমভাবে আপনি চুরির কথাও চিন্তা করতে পারেন। চোরের জন্য চুরি একটি লাভজনক কাজ (সফল হতে পারলে আরকি)। কিন্তু সমাজের জন্য এটা ক্ষতিকর। আর এখানেই প্রফিট (লাভ) আর সম্পদের মধ্যে পার্থক্য।

এমন অনেক কাজ আছে যেগুলোর মাধ্যমে নতুন সম্পদ তৈরি হয়। যেমন : কৃষক কিংবা ডাক্তারের সময় ও শ্রমের দ্বারা তৈরি হয় নতুন পণ্য বা সেবা (সম্পদ)। আবার অনেক কাজের মধ্য দিয়ে কেবল সম্পদের হাতবদল হয়। মাদক ব্যবসা, জুয়া, চুরি এ ধরনের কাজ। মাদক ব্যবসায়ী কিংবা ক্যাসিনোর হাতে প্রতিদিন জমা হয় হাজারো মানুষের টাকা। এর বাইরে ব্যাংকিং এবং ফাইন্যানশিয়াল মার্কেটের মতো অনেক বৈধ ইন্ডাস্ট্রিও এ ধরনের কাজের মধ্যে পড়ে। এগুলো বিশাল বড়, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, কিন্তু কোনো ভ্যালু তৈরি করে না, কোনো নতুন সম্পদ তৈরি করে না। এখানে কেবল সম্পদের হাতবদল হয় এবং অধিকাংশ সময় অনেকের হাত থেকে সম্পদ বেরিয়ে গিয়ে জমা হয় অল্প কিছু হাতে।

সম্পদ তৈরি আর সম্পদের হাতবদল–দু-ধরনের কাজের মাধ্যমেই কিন্তু প্রফিট হয়।

কৃষকও টাকা ইনকাম করে, পাবলো এস্কোবার আর ওলফ অফ ওয়ালস্ট্রিটরাও করে। কিন্তু সমাজের ওপর দুদলের উপার্জনের প্রভাব বিপরীতমুখী। একটা ভ্যালু-অ্যাডিটিভ, আরেকটা ভ্যালু সাবস্ট্র্যাক্টিভ।

কোনো সমাজের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ওপরের দু-ধরনের মধ্য থেকে কোন ধরনের কাজের ওপর তারা গুরুত্ব দিচ্ছে তার ওপর। কোনো সমাজ যখন সম্পদের উৎপাদনের বদলে হাতবদলের দিকে বেশি মনোযোগী হয় তখন সাধারণত সামাজিক কাঠামো ও সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের ব্যাপারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদ তৈরির বদলে সম্পদের হাতবদলকে প্রাধান্য দেয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ তৈরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হলো প্রফিটকেন্দ্রিক চিন্তা এবং সবকিছুকে অর্থমূল্যে মাপার প্রবণতা। কয়েকটা সংখ্যায় নামিয়ে আনা যায় না সব ধরনের সম্পদকে। টাকা দিয়ে সবকিছুর মূল্য মাপা যায় না। যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, তার দাম কত? আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উন্নতি কিংবা অবনতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা কিংবা শিক্ষার মানকে আপনি জিডিপি, জিএনপির হিসাবে ঢুকাতে পারবেন না। অর্থনীতির খেরো খাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না এগুলোর হিসাব। কিন্তু তার মানে এই না যে এগুলো অর্থনৈতিকভাবে মূল্যহীন। সম্পদ বৃদ্ধি আর অ্যাকাউন্টিং-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'লাভ' সব সময় সমান্তরাল হয় না। একটার উপস্থিতি নিশ্চয়তা দেয় না অন্যটার উপস্থিতির। সম্পদের সংজ্ঞা ও পরিমাপের এ সীমাবদ্ধতা আধুনিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় কাঠামোগত দুর্বলতার একটি। নারীকে ঘরের বাইরে এনে অর্থনৈতিক উন্নতির যে যুক্তি, তার ফাঁকি বোঝার জন্য সম্পদের সংজ্ঞায়নের এ ভুলটা বোঝা জরুরি।

অদ্ভুত উন্নয়ন

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নয়নকে বোঝা। উন্নয়ন বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? সময়ের সাথে সাথে উন্নয়নের সংজ্ঞা বদলেছে। একেক সভ্যতা উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছে একেকভাবে। নিছক খেয়ালখুশি অনুযায়ী, কিংবা যখন যেটার চল তার ভিত্তিতে এ সংজ্ঞাগুলো তৈরি হয়নি। বরং প্রতি যুগের পরাশক্তি 'উন্নয়ন'-কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যা তাদেরকে সবচেয়ে উন্নত প্রমাণিত করবে। ওই সব ফ্যাক্টরের দিকে তারা মনোযোগী হয়েছে যেগুলো তৈরি করবে তাদের এক গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত ছবি। সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে ওই দিকগুলো যা সতর্কতার সাথে তৈরি করা নিজেদের ইমেজের জন্য হুমকিস্বরূপ। ইতিহাস সব সময় বিজয়ীদের কলমে লেখা হয়।

ইসলাম উন্নয়ন বলতে সমাজের মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতিকে বোঝায়। ইসলাম উন্নয়নকে মাপে তাওহিদ, তাক্বওয়া, তাওয়াক্কুল, তাসাওউফ, ইখলাস, ইত্যাদির প্যারামিটারে। আবার অনেক সভ্যতা উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছিল জ্ঞান, দর্শন আর শিল্পে অগ্রগতির মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর 'গ্রেট' ব্রিটেনের সংজ্ঞা অনুযায়ী উন্নয়ন ছিল সামুদ্রিক শক্তি, জ্বালানির মজুদ ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব মোড়লের ভূমিকা গ্রহণ করা অ্যামেরিকার কাছে উন্নয়ন মানে হলো মাথাপিছু জিএনপি আর জিডিপির হিসেব।

উন্নয়নকে কিসের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যদি উন্নয়ন বলতে দর্শন, জ্ঞান বা শিল্পে অগ্রগতিকে বোঝানো হয়, তাহলে সমাজগুলো এই ক্ষেত্রগুলোতে উন্নতির দিকে মনযোগী হবে। উন্নয়ন বলতে যদি পশ্চিমা সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়, তাহলে সবাই চেষ্টা করবে তার অনুকরণের। যেমন : বর্তমানের মুসলিম দেশগুলোসহ অধিকাংশ নিম্ন আয়ের দেশগুলো করছে। জিডিপি-জিএনপির পরিসংখ্যানে উন্নয়নকে সীমাবদ্ধ করার অর্থ হলো সবাই এ সংখ্যাগুলোর বাড়া-কমাকে উন্নয়নের মাপকাঠি ধরে নেবে।

কিন্তু যেমনটা আমরা এরই মধ্যে দেখছি, জিডিপি-জিএনপির এই হিসেব অন্ধ। আসলে শুধু অন্ধই না; বোবা, কালা এবং পঙ্গুও। বাস্তবতাবিচ্ছিন্ন জিডিপির এ অদ্ভুত কারচুপি বোঝার জন্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থার দিকে তাকানো যেতে পারে। কানা অর্থনীতির হিসেবখাতা অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের কাতারে জায়গা পাবার পর বাংলাদেশ এখন রওনা দিয়েছে মধ্যম আয়ের দেশ হবার পথে। অভাবনীয় উন্নতি, বাড়তে থাকা প্রবৃদ্ধির কল্যাণে 'অতি ধনী' বাড়ার হারে শীর্ষে থাকা বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে এক 'সাকসেস স্টোরি'। এই সাকসেস আসলেই অভাবনীয়, আসলেই বিস্ময়কর। অবিশ্বাস্যও বলা যায়। কতটা অবিশ্বাস্য সেটা ওপরের প্যারাগ্রাফের তথ্যগুলো থেকে বুঝতে পারবেন না। তাই আসুন আরও কিছু তথ্যের দিকে তাকানো যাক।

বাংলাদেশে এমনই উন্নতি হয়েছে যে ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছয় বছরে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় বেড়েছে প্রায় ৫৭%। তাঁদের মাসিক আয় এখন প্রায় ৯০ হাজার টাকা। একই সময়ে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে ৫৯ শতাংশ। ২০১০ সালের ১ হাজার ৭৯১ টাকা থেকে কমে তাদের মাসিক আয় এখন ৭৩৩ টাকা।[৫১]

---

[৫১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয়-ব্যয়

কী, উন্নয়নের হিসেব মিলছে না?

আচ্ছা, মিলিয়ে দিচ্ছি।

চটপট একটা ধনী পরিবার আর একটা গরিব পরিবারের মাসিক আয়ের গড় হিসাব করে ফেলুন তো। ৯০,০০০ আর ৭৯১ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখুন কত আসে। দু-পরিবারের মাসিক গড় আয় পাবেন এখন ৪৫,০০০ এর বেশি।

কী, মিলল তো এবার হিসাব? এভাবেই মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধি, আর জিডিপি-জিএনপির হিসেব মিলিয়ে উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের।

শুধু কী তাই?

সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এবং খেলাপি ঋণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ফার্স্ট হবার পরও কিন্তু আমাদের জিডিপি বাড়ছে। আইনের শাসন, যৌন-সহিংসতা ও জীবনের নিরাপত্তা, পরিবেশ ও নদী ধ্বংস, এ সবগুলো সূচকে তলানির দিকে থাকার পরও আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী সুখী দেশের তালিকায় ১৫৬টি দেশের মধ্যে ১২৫তম স্থান পেলে কী হবে, উন্নয়নশীল এই আমরা ঠিকই মোটা মানিব্যাগ নিয়ে টাকা গুনতে গুনতে অসুখী মনে দিন কাটাচ্ছি।[৫২]

মহামারির মতো দুর্নীতি, কমতে থাকা কর্মসংস্থান, ৭ বছরে দ্বিগুণ হওয়া তরুণ বেকারত্বের হার[৫৩], শেয়ারবাজার থেকে লোপাট হওয়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে 'হারিয়ে যাওয়া' ৮০০ কোটি, দশ বছরে ব্যাংকখাত থেকে লুট হওয়া ২২ হাজার ৫০২ কোটি[৫৪] আর অর্থনীতি থেকে পাচার হওয়া ৬ লাখ কোটি টাকা[৫৫], স্থবির হয়ে আসা শিল্পখাত, সংকুচিত হতে থাকা কৃষি কর্মসংস্থান–এ সবকিছু সত্ত্বেও উন্নয়নের মহাসড়ক দিয়ে আমরা কিন্তু সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছি। আমাদের জিডিপি, মাথাপিছু আয় ঠিকই বাড়ছে।

পুঁজিবাদের বিদঘুটে জাদুতে আজগুবি উন্নয়নের মই বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছি আমরা, আর অপ্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান হিসেবে নিচে ফেলে যাচ্ছি কিছু কোটি অপ্রাসঙ্গিক মানুষকে।

---

[৫২] World Happiness Report 2019
[৫৩] আইএলওর প্রতিবেদন তরুণ বেকারের হার ৭ বছরে দ্বিগুণ, প্রথম আলো, নভেম্বর ১৮, ২০১৮
[৫৪] ব্যাংকখাত থেকে লুট হওয়া ২২ হাজার ৫০২ কোটি, প্রথম আলো, ডিসেম্বর ৯, ২০১৮
[৫৫] ছয় লাখ কোটি টাকা পাচার ১০ বছরে, যুগান্তর, জুন ৩০, ২০১৮

উন্নয়ন মাপার জিডিপি-জিএনপির এ হাস্যকর হিসেবের সমালোচনা করেছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জৌসেফ স্টিগলিটয, অমর্ত্য সেনসহ আরও অনেকেই বলেছেন এভাবে উন্নয়নের হিসাব কষা জন্ম দেয় ভুল পলিসির। প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি, সমাজের ভাঙন, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের জায়গা মেলে না এ হিসাবে। জিডিপির অদ্ভুত হিসেব অনুযায়ী গাড়ি চুরি করে বিক্রি করে দিলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের প্রবৃদ্ধিতে, কিন্তু নিরাশ্রয় মানুষ কিংবা অনাথকে আশ্রয় দেয়া জিডিপির মাপকাঠিতে মূল্যহীন।

আজ উন্নতির এ ভুল অঙ্কের মাশুল দিতে হচ্ছে পুরো মানবজাতিকে। পুরো পৃথিবীজুড়ে এ মনোভাব গড়েছে যতটুকু, ধ্বংস করেছে তারচেয়ে অনেক বেশি। এ সংজ্ঞায়নে স্রষ্টাপ্রদত্ত অমূল্য সব নিয়ামত হয়ে যায় মূল্যহীন। হাজার বছরের পুরোনো বন কেটে উজাড় করার ক্ষতির কোনো বাজারমূল্য ধরা হয় না, কিন্তু সেই কাঠ বিক্রির অল্প কিছুকে টাকাকে বলা হয় সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদকে ইসলাম ব্যবহার করতে বলে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, কিন্তু প্রাইভেটাইযেইশানের মাধ্যমে অল্প কিছু মানুষের সীমাহীন লোভ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আজ মানবজাতিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দোরগোড়ায়। উন্নতি ও অগ্রগতির ফসলগুলো মানবজীবনের ওপর তাদের প্রভাবের ভিত্তিতে না মাপলে দিন শেষে সব 'সম্পদ' নিয়ে আমাদের রাজত্ব করতে হবে এক বিরান ধ্বংসস্তূপের ওপর। সম্পদের আজব এবং অসম্পূর্ণ এ সংজ্ঞায়ন আর উন্নয়ন মাপার এ পদ্ধতির মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্র হলো বাজার অর্থনীতিতে তৈরি হওয়া টাকা। এ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে করা বিশ্লেষণ টাকার খেলা ছাড়া কিছু বোঝে না।

অর্থনীতিবিদ পল অরমেরড তার ১৯৯৪ সালের বই 'দা ডেথ অফ ইকোনমিক্স' (অর্থনীতির মৃত্যু)-এ অর্থনীতিশাস্ত্রের এ দুর্বলতার কথা তুলে ধরেছিলেন,

> *'এমন অনেক ফ্যাক্টর আছে জাতীয় অর্থনীতির হিসাবের সময় যেগুলোকে আমলে নেয়া হয় না। পরিবেশের কথাই ধরুন। যদিও পরিবেশদূষণের মতো বিষয়গুলো বাজারে কেনাবেচা করা যায় না, তবু পরিবেশগত ফ্যাক্টরগুলো জাতীয় অর্থনীতির হিসেবে আনা উচিত। শুধু তাই না, এগুলো বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ারও দাবিদার। এগুলো হিসাবে না আনার কোনো মৌলিক কারণ নেই। একইভাবে ঘরের ভেতরে যে কাজগুলো করা হয়, জাতীয় অর্থনীতির হিসেবের সময় সেগুলোর মূল্যায়ন হয় না। ধরে নেয়া হয় রান্না, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি, ঝাড়ামোছা এবং সন্তানকে সময় দেয়া ও লালনপালন করার মতো কাজগুলো অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা রাখে না, কোনো ভ্যালু যুক্ত করে না।'*

কোনো মানুষ পারিবারিক দায়িত্বগুলোর আর্থিক মূল্য খাতায় লিখে রাখে? টাকার অঙ্কে আর পরিসংখ্যানের ছক অনুযায়ী কেই-বা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর বাজারমূল্য ঠিক করত বসে? কিন্তু তাই বলে কি সেগুলো মূল্যহীন? নারী কি কেবল ঘরে 'বন্দী' হয়ে নিশ্চল, জড়বৎ পড়ে থাকে? নাকি ঘরে 'বন্দী' নারী পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?

নারী ঘরে থাকা মানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা—এ সরল সমীকরণ কেবল তখনই সত্য হয় যখন আপনি উন্নয়নকে জিডিপি-জিএনপির অন্ধ স্কেলে মাপবেন। উন্নয়নকে এ সংকীর্ণ লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখলেই কেবল গৃহিণীর ভূমিকাকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যহীন মনে হবে। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার জন্য ঘরে বন্দী হয়ে থাকা 'বাক্সবন্দী' আর 'বস্তাবন্দী' এ নারীদের ভূমিকা কতটা, কানা অর্থনীতির ভাঙাচোরা মাপকাঠি নিয়ে মাপতে গেলে সেটা কখনোই বোঝা যাবে না। এভাবে হিসাব কষতে গেলে ভুল পলিসি আর বাংলাদেশের মতোন অদ্ভুত উন্নয়নই কেবল মিলবে।

যাদের উদাহরণ দেখিয়ে মেয়েদের ঘর থেকে বের করে এনে উন্নয়নের গল্প শোনানো হয় সেই পশ্চিমও কিন্তু নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরাশক্তি হয়নি। নারীদের কর্মক্ষেত্রে ঢোকানোর এ থিওরি তৈরি হবার অনেক আগেই ঔপনিবেশিক লুটপাটের মাধ্যমে পরাশক্তি বনে বসেছিল পশ্চিমা দেশগুলো। কাজেই কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের ফলে রাতারাতি অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, জিডিপি-জিএনপির বিচারে হালকা তারতম্য হয় বটে, কিন্তু অতটুকু পর্যন্তই। কাজেই নারীরা ঘরের বাইরে এলে উন্নয়ন আর ঘরের ভেতরে থাকা মানে পশ্চাৎপদতা, এই তত্ত্বের কোনো শক্ত ভিত্তি নেই। ঘর থেকে মেয়েদের বের করে এনে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের সাথে টেক্কা দিতে শুরু করব, এ ধরনের চিন্তা সম্পদ ও উন্নয়নের ভুল ধারণাগুলোর মতোই বাস্তবতা-বিবর্জিত।

অপরটুনিটি কস্ট

এখন বলা যেতে পারে, বেশ তো, আমাদের সুপারপাওয়ার হবার দরকার নেই। মেয়েরা কাজ করলে যদি জিডিপি-জিএনপি কিছুটা বাড়ে তাতে সমস্যা কী? তাই সই।

সমস্যা হলো, এ ধরনের কথা যারা বলেন তারা মেয়েদের বাইরে কাজ করার অপরটুনিটি কস্ট (Opportunity Cost) আমলে নেন না। যেকোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আমরা কিন্তু একই সাথে অনেকগুলো কাজ না করার সিদ্ধান্তও নিই। যেমন : এ মুহূর্তে এ লেখাটা না পড়ে আপনি আরও অন্য কিছু করতে পারতেন। সেটা হতে পারে

টিভি দেখা, ফেইসবুক ব্রাউযিং, বন্ধুর সাথে কথা বলা, অফিস কিংবা ক্লাসের কাজ ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের প্রতিটা সিদ্ধান্তের দুটো দিক আছে। যখন আপনি এ লেখাটা পড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তখন একই সাথে অন্যান্য কাজগুলো না করারও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যেকোনো একটা কাজ করার সময় আমাদের হারাতে হয় ওই মুহূর্তে অন্যান্য কাজগুলো করার সুযোগ বা অপরচুনিটি। এটাই হলো অপরচুনিটি কস্ট।

আরও স্পষ্ট করে বললে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নিলে অন্য কাজগুলো মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে সুযোগ ছেড়ে দিতে হয় সেটাকেই অর্থনীতিতে অপরচুনিটি কস্ট বলে। অর্থনীতির অনেক ভুল নীতি ও ধারণা থাকলেও অপরচুনিটি কস্টের এ কনসেপ্টটা আসলেই খুব কাজের।

নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে কাজে ঢুকিয়ে দেয়ার সময় শুধু মাথাপিছু উপার্জন বাড়ার ব্যাপারটা আপনি দেখছেন, কিন্তু এর যে অন্য প্রভাব আছে, অপরচুনিটি কস্ট আছে এটা আপনি দেখছেন না। দেখছেন না কারণ নারীর ঘরের কাজগুলোকে আপনি আগেই মূল্যহীন ধরে নিয়েছেন। আসুন দেখা যাক, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অপরচুনিটি কস্টের ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে।

সোজা বাংলায় মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসার ফল হলো ঘর খালি করা। একজন নারী সকাল থেকে সন্ধ্যা অফিসে কাটানোর অর্থ হলো তিনি এ সময়টুকু তার পরিবারকে দিতে পারছেন না। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের যেভাবে চিন্তা করতে শেখানো হয়েছে সেটা অনুযায়ী এটাকে খুব বড় কোনো ইস্যু মনে না হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুতর একটি বিষয় যার সাথে জড়িত পরিবার, সমাজ এবং অর্থনীতির কল্যাণের প্রশ্ন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাজ ও পরিবারে নারী ও পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সহজাত ভূমিকা। পুরুষের কাজ হলো পরিবারের জন্য উপার্জন করা, পরিবারকে নিরাপত্তা দেয়া। নারীর কাজ হলো মায়ের ভূমিকা পালন করা, একটা ইট-কাঠের কাঠামোকে ঘরে রূপান্তর করা। আমরা বাংলায় বলে থাকি পুরুষরা পরিবারের হাল ধরেন, কিন্তু আমার মতে শাব্দিকভাবে হাল ধরার অর্থটা পরিবারে নারীদের ভূমিকার সাথেই বেশি যায়।

হালের কাজ হলো নৌকা বা জাহাজ কোন দিকে যাবে তা ঠিক করা। ইঞ্জিন কিংবা দাঁড়টানা মাঝির কাজ হলো নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ কাজটা করেন বাবা। পরিবারের শিশুদের বিকাশের গতিপথ প্রাথমিকভাবে মায়ের ওপরই নির্ভর করে। যদি হাল বিগড়ে যায় কিংবা না থাকে তবে নৌকা এগোবে তো বটে, কিন্তু গন্তব্য পৌঁছানো

খুব কঠিন হয়ে যাবে। বিশেষ করে আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, আকাশসভ্যতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, আপেক্ষিক নৈতিকতা, মাদকাসক্তি আর পুঁজিবাদী যৌনায়নের যুগে।

সহজ কিংবা অনস্বীকার্য সত্য কথাটা হলো একজন নারী ঘরের ভেতরে যে ভূমিকা পালন করেন তার বাজারমূল্য নির্ধারণ এবং টাকা দিয়ে বিকল্প কেনা সম্ভব না। হ্যাঁ, রান্নাবান্নাসহ ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য বিকল্প হয়তো টাকা খরচ করে পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্তানকে সময় দেয়া? গড়ে তোলা? মায়ের ভালোবাসা? এগুলোর বিকল্প কী? আর সেটার দামই বা কেমন? মজবুত পরিবার, সামাজিক সংহতি এবং শিশুর সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের পেছনে এর গুরুত্ব জিডিপি-জিএনপির মতো পরিসংখ্যানের ছকে মাপা সম্ভব না।

নারীর সাথে পরিবারের এ নির্ভরতার সম্পর্কটা পারস্পরিক। পরিবার যেমন নারীর ওপর নির্ভরশীল তেমনি একজন নারীর সুখ ও সন্তুষ্টি তার সন্তান ও পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। জন্মের পর থেকেই পর্যায়ক্রমে নিজের অজান্তেই একটা মেয়ে মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। বয়ঃসন্ধির সময় শুরু হওয়া মেন্সট্রুয়াল সাইকেল, প্রেগন্যান্সির সময়ে মস্তিষ্কের কাঠামোগত পরিবর্তন, শিশুসন্তানের সাথে মায়ের গভীর, প্রায় ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক—এগুলো সমাজ কিংবা পুরুষতন্ত্রের বানানো কোনো মিথ না। সন্তানের কাঁদার শব্দে বাবা আর মায়ের মস্তিষ্কে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। পারিবারিক বিষয়গুলোতে নারী এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, টেম্পারমেন্ট এক রকম হয় না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এগুলো ধ্রুব সত্য। এটাই নারীর জন্য নির্ধারিত ভূমিকা। এগুলো সমাজ কিংবা 'পুরুষতন্ত্র' ঠিক করে দেয় না; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বেঁধে দেয়া অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী ঘটে। এ কারণেই নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। ক্যারিয়ার কিংবা মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে না।

নারীকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে পুরুষের ছাঁচে গড়তে চাওয়ার এ যুক্তি উপেক্ষা করে পরিবার ও নারীর এ পারস্পরিক সম্পর্ককে। এবং এ উপেক্ষার পরিণাম আছে। সেই পরিণামগুলো কী?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকালে আপনার চোখে ধরা দেবে বেশ কিছু প্যাটার্ন। দেখবেন মিডিয়া, কালচার-কাউন্টার কালচার, পপ-রক আইকনস, সেলিব্রিটি কাল্ট, ম্যাস মিডিয়া—ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে একটা জেনারেশানাল ডিভাইড বা প্রজন্মগত দূরত্ব। ফলে প্রতি প্রজন্মের সন্তানেরা ক্রমাগত দূরে সরে গেছে তাদের পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ আর চিন্তার অবস্থান থেকে।

নারীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা এবং এর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে আর একই সাথে ক্রমাগত আক্রমণ করা হয়েছে নারীর চিরন্তন প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকাকে।

নারীমুক্তি আর নারীবাদের নামে নারীকে (এবং পুরুষকেও) বোঝানো হয়েছে পুরুষের অনুকরণ, পুরুষ যা করতে পারে তা করতে পারার মাঝেই নারীজন্মের সার্থকতা নিহিত। আমাদের বোঝানো হয়েছে ঘরের ভেতরে নারী যে ভূমিকা পালন করে তা আসলে তুচ্ছ। এক ধরনের বন্দিত্ব। আর তাই ঘরের বাইরে নারীকে নিয়ে আসা এবং ঘরের বাইরে রাখার মাঝেই প্রগতি, উন্নয়ন আর সার্থকতা। সেই সাথে নারীর জন্য বেঁধে দেয়া হয়েছে কাজ আর পরিবার ব্যালেন্স করার অসম্ভব এক স্ট্যান্ডার্ড।

ঘরের বাইরে থাকা, পুরুষের সাথে পাল্লা দেয়া, শরীর প্রদর্শন আর যথেচ্ছ যৌনতার মতো বিষয়গুলো কোনো একভাবে চিন্তার জগতে চালু হয়ে গেছে স্বাধীনতা ও অধিকারের সমার্থক শব্দ হিসেবে। নারীবাদ, নারী-স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের এই যুগে নারীদেহ পরিণত হয়েছে সর্বাধিক ব্যবহৃত, সস্তা ও সহজলভ্য পণ্যে। আধুনিক বিজ্ঞাপনে নারীদেহ লবণের মতো। সব কিছুতেই একটু না একটু দিতে হয়। শেইভিং ক্রিম থেকে শুরু করে রঙ্গ, গাড়ি থেকে শুরু করে ইট-কাঠ-বালু-সিমেন্ট, কোনো কিছুই এ 'লবণ' ছাড়া উপস্থাপন করা যায় না।

পশ্চিমা লিবারেল আইডিওলজি এবং মিডিয়া 'ঘর নামের জেলখানার দরজা ভাঙার' মন্ত্র শুনিয়ে নারীর শরীরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে তার শরীরকে নিলামে তোলার। আস্তে আস্তে গুরুত্ব হারিয়েছে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সামাজিক ইউনিট হিসেবে দুর্বল হয়েছে পরিবার। পরিবার যত দুর্বল হয়েছে, ততই দুর্বল হয়েছে পারিবারিক শিক্ষা, ততই দুর্বল হয়েছে নৈতিকতার কাঠামো। বেড়েছে পরিবারের ভাঙন, ব্যভিচার, গর্ভপাত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস, সম্পর্কের টানাপোড়েন, শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ, মাদকাসক্তি এবং বিষণ্ণতার হার। পশ্চিমা এ হাওয়া আমাদের শরীরেও লেগেছে, উপনিবেশে এখন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কেন্দ্রের মতো সেই একই প্যাটার্নের।

ঐতিহাসিক গারট্রুড হিমেলফারব তার বই *The De-moralization Of Society: From Victorian Virtues to Modern Values*-এ দেখিয়েছেন মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তন কীভাবে পরিবারের ভাঙন এবং আমাদের চারদিকের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। জন্ম দিয়েছে মারি ও মড়ক। এ হলো সাদা মানুষদের উন্নত আর বাদামি মানুষদের সদ্য উন্নয়নশীল আজকের বাস্তবতা। এ হলো

নারীকে ঘর থেকে বের করে আনার অপরচুনিটি কস্টের ছোট্ট একটা স্ন্যাপশট।

এ সবকিছু কি শুধু নারীরা ঘরের বাইরে আসার কারণে হয়েছে? সব কি মেয়েদের দোষ?

না, অবশ্যই না। এখানে আছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর, অনেকগুলো জটিল সমীকরণ। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, মা ও ঘরের কর্ত্রী হিসেবে নারীর চিরায়ত ভূমিকার অস্বীকার এ ব্যাপারগুলোর সাথে সম্পর্কিত, এবং একমাত্র না হলেও এ পুরো সমীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর।

খুব বেশি না, আজ থেকে দুই শ বছর আগে ইউরোপজুড়ে শিশুশ্রম বৈধ ছিল। ৭-৮ বছর বয়স হবার পর শিশুরা কাজ শুরু করবে, কামাই করবে, এটা ছিল সমাজের রীতি। গড়ে দৈনিক ১০-১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করত ইউরোপ-অ্যামেরিকার শিশুরা। ১৮২১ এর দিকে ব্রিটেনের মোট শ্রমশক্তির ৪৯% ছিল শিশু। অবধারিতভাবেই শিশুদের উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থনীতি এবং প্রবৃদ্ধির জন্য।[৫৬] এক শ বছর আগেও অ্যামেরিকার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল প্রায় ২০ লক্ষ শিশুশ্রমিক।[৫৭] শুধু মাথাপিছু আয়ের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শিশুশ্রমের ব্যাপারটা লাভজনক। একসাথে অর্থনীতিতে অনেক সস্তা শ্রম পাওয়া যায়, লোকবল বাড়ে, কমে উৎপাদনের খরচ। প্রফিটেবল। কিন্তু তবুও একসময় ইউরোপ ও অ্যামেরিকাকে এ অবস্থান সরে আসতে হয়েছে। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে দেখা, জিডিপি-জিএনপির পাল্লায় মাপা শিশুশ্রমের এ লাভের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক চড়া দাম। যার অল্প কিছু ছবি চার্লস ডিকেন্স তুলে এনেছিলেন তার বিখ্যাত 'অলিভার টুইস্ট' বইটিতে। তাই পশ্চিমকে একসময় বাধ্য হতে হয়েছে 'লাভ' এর হিসেব বাদ দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে।

একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও সত্য। উন্নতি আর সম্পদের সংকীর্ণ সংজ্ঞার জায়গা থেকে দেখলে যেটাকে লাভ মনে হচ্ছে, একটু পিছিয়ে এসে পুরো ছবিটার দিকে তাকালে সেই উপসংহার বদলে যাবে। প্রশ্ন হলো, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সেই বদলে যাওয়া উপসংহার মেনে নেয়ার সৎসাহসটুকু আমাদের আছে কি না।

---

[৫৬] "Introduction." The Workhouse: Story of an Institution. http://www.workhouses.org.uk/intro/.

[৫৭] Teaching With Documents: Photographs of Lewis Hine: Documentation of Child Labor, US National Archives

স্থিতিস্থাপকতা, না-মানুষ ও অন্যান্য

অর্থনিতিতে ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা নামে একটা কনসেপ্ট আছে। কোনো জিনিসের দাম ওঠানামার সাথে সাথে সেটার চাহিদাও ওঠানামা করে। সহজ ভাষায়, দামের পরিবর্তনের কারণে কোনো কিছু দাম ওঠানামার মাত্রাকে প্রাইস ইলাস্টিসিটি (দামের স্থিতিস্থাপকতা) বলা হয়। সাধারণত, দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। দাম বাড়লে চাহিদা কমে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তবে কিছু পণ্য আছে যেগুলোর চাহিদা ইনিলাস্টিক। দামের সাথে এদের চাহিদায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। ইনিলাস্টিক ডিমান্ডের একটা টেক্সটবুক উদাহরণ হলো হেরোইন। যে হেরোইনের নেশা করে, দাম বাড়লেও তার আগের মতো একই পরিমাণে হেরোইন লাগবে।

অ্যাডিক্ট হেরোইন কেনার সময় অর্থনৈতিক লাভক্ষতির হিসাব মেলায় না, সে হিসাব করে নেশা 'ধরার' জন্য মিনিমাম কতটুকু কিনতে হবে। একই কথা অন্যান্য আরও অনেক মাদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিকল্প কোনো পণ্য বাজারে আসার পরই কেবল মাদকের চাহিদায় পরিবর্তন আসে। যেমন : একসময় অ্যামেরিকায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ড্রাগের একটি ছিল কোকেইন। সবচেয়ে অ্যাডিক্টিভ মাদকের একটা হবার পাশাপাশি ফ্রি-বেইস কোকেইন সবচেয়ে দামি মাদকগুলোরও অন্যতম। তাই কিছুদিন পর কম দামের ক্র্যাক-কোকেইন সহজলভ্য হলে কোকেইন ব্যবহারকারীদের বিশাল একটা অংশ ফ্রি বেইস কোকেইন ছেড়ে ঝুঁকে ক্র্যাকে। নব্বইয়ের দশকে বাজারে এল অনেক কম দামের, আরও বেশি শক্তিশালী (ও বিপজ্জনক) ক্রিস্টালমেথ (মেথঅ্যাম্ফেটামিন)। অ্যাডিক্টদের অধিকাংশই এবার কোকেইন আর ক্র্যাক ছেড়ে মেথ ধরল, পাশাপাশি তৈরি হলো আরও অনেক নতুন অ্যাডিক্ট।

অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে একটা মাদকের চাহিদা কমলেও প্রায় সমান পরিমাণে বাড়বে সমগোত্রীয় বিকল্প কোনো মাদকের চাহিদা। আবার কমদামি বিকল্প মাদক সহজলভ্য হলে বেড়ে যাবে মাদক ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

ইনিলাস্টিক ডিমান্ড এবং 'নিবেদিতপ্রাণ' কাস্টমারদের কারণে মাদকের বাজারটা অন্যসব পণ্যের বাজারের চেয়ে আলাদা। যদি অন্যসব ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত থাকে (সেটেরিস পেরিবাস), তাহলে সময়ের সাথে সাথে একটা দেশে মাদকের ব্যবহার বাড়বে। খুব দূরে যাবার দরকার নেই, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ইয়াবার বাজারের দিকে লক্ষ করলেই প্রমাণ মিলবে। আর এমন হবে না-ই বা কেন? উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সন্তানরা ড্রাগ ব্যবহার করবে না কেন? যদি সবার ওপর মানুষ সত্য হয়, জীবনের উদ্দেশ্য হয় যত বেশি সম্ভব আনন্দ বা ইউটিলিটি খোঁজা, অপরাধের সংজ্ঞা যদি হয় কেবল আরেকজনের ক্ষতি করা, যদি ভালোমন্দ নির্ভর করে মানুষের ওপর–তাহলে নিজে নিজে মাদক ব্যবহার করলে সমস্যা কোথায়? অন্য কারও তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। রাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া অপরাধের সংজ্ঞা কি একজন 'মুক্তচিন্তার' মানুষ মেনে চলতে বাধ্য? দিকনির্দেশনা, নৈতিকতা, আত্মপরিচয় এবং উদ্দেশ্যহীন, পপ কালচারে মন্ত্রমুগ্ধ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদে দীক্ষিত, বন্ধু-আড্ডা-গানে হারিয়ে যাওয়ার মন্ত্রজপা যুবসমাজ কেন নেশা করবে না? কেন সাময়িক কিন্তু তীব্র আনন্দের স্বাদ নেবে না? চেতনা, দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্বের বুলি শুনতে ভালো, কিন্তু ওগুলোতে ডোপামিনের বন্যা নামে না, রক্তে নাচন ধরে না, তীব্র সুখের আগুন ধরে না শিরায় শিরায়।

কজন পারে নগদ সুখ পায়ে ঠেলতে? আর কতবার?

যদি মৌলিক ও ব্যাপক কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে ড্রাগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বেই। এটাই বাস্তবতা; আমার-আপনার খারাপ লাগায় বদলাবে না।

তাহলে ড্রাগ সমস্যার সমাধান কী?

আমাদের দেশে প্রায়ই মাদকবিরোধী অভিযান হয়। লিস্ট করে মারা হয় মানুষ কিংবা মাদক ব্যবসায়ী। মাঝেমধ্যে দুটো মিলেমিশে যায়। গুলিয়ে যায় সংজ্ঞা। গুলি চলে, নাম কাটা পড়ে। এ ধরনের অভিযানগুলোকে সমর্থন করেন অনেকেই। তাদের কাছে এটাই মাদক মহামারির সমাধান। আবার অনেকে ঠিক ভরসা পান না, কারণ অভিযানে মারা পড়ে কেবল চুনোপুঁটিরা, রাঘববোয়ালরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে থাকে বাংলার এস্কোবাররা। আপাতভাবে শুনতে বিপরীতমুখী মনে হলেও দুদলের বক্তব্য মৌলিকভাবে এক–'যদি মূল ব্যবসায়ীদের মেরে ফেলা হয়,

তাহলে মাদক সমস্যার সমাধান হবে'।

ধরুন রাষ্ট্র রাঘববোয়ালের মেরে ফেলা শুরু করল, সত্যিকারভাবেই যুদ্ধ হলো মাদকের বিরুদ্ধে। তাহলে কি সমাধান আসবে?

আমাদের সমাজের অনেকের কাছেই এ ধরনের সমাধান আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু এভাবে সমাধান আসবে না। একজন এস্কোবারকে মারলে তার জায়গা নেবে দুজন কিংবা দশজন। এ ব্যবসায় খুব, খু-উ-ব বেশি লাভ। পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা তিনটি–মানুষ, মাদক, অস্ত্র। আর তিনটার মধ্যে সবচেয়ে সস্তা হলো মানুষ। তাই এক-দুই শ কিংবা এক-দুই হাজার মেরে এ বাজার বন্ধ করতে পারবেন না। কিছু লাশ ফেলে আমরা হয়তো আত্মতৃপ্তি পেতে পারি, কিন্তু যতদিন চাহিদা থাকছে, এস্কোবাররা আসবে যাবে। আর চুনোপুঁটিদের তো গোনায় ধরেও লাভ নেই। ব্যাপারটা অনেকটা মারিও পুজোর বিখ্যাত গডফাদারের গল্পের মতো। হেরোইন ব্যবসা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল গডফাদার ভিটো কর্লিওনি। এ জন্য মরতেও বসেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ ব্যবসায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল কর্লিওনিরা। ভিটো বুঝতে পেরেছিল তাকে ছাড়াও এ ব্যবসা চলবে, তার সিদ্ধান্তে কিছুই বদলাবে না। কেবল মাঝখান দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সে ও তার পরিবার। এমন হাই স্টেইক্সের খেলায় নীতি নিয়ে বিলাসিতার সুযোগ কোথায়?

ক্যাপিটালিযম–শীতল, হিসেবি, চতুর ক্যাপিটালিযম। খেলোয়ার আসবে যাবে, কিন্তু খেলা চলবে।

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখুন–ভর্তুকি দিয়ে চলা, চরম অদক্ষ, অকর্মণ্য সব কর্মচারী দিয়ে ভরা, নানা সমস্যায় জর্জরিত, মারাত্মক লসের মধ্যে থাকা রাষ্ট্র নামক কর্পোরেশান কীভাবে মোকাবেলা করবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী, টেক স্যাভি, ইনোভেটিভ, ক্রমাগত এক্সপ্যানশান, ইম্প্রুভমেন্ট এবং চরম পর্যায়ের প্রফিটে থাকা ইন্ডাস্ট্রিগুলোর একটির সাথে? অল্প কদিন না হয় লিস্ট-লিস্ট খেলা যাবে, তারপর? হয় তারা রাষ্ট্রকে আউটগান করবে, অথবা কিনে নেবে। মেক্সিকো কিংবা কলোম্বিয়ার দিকে তাকান। এ দেশগুলোর অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামো একরকম নিজেদের বানিয়ে নিয়েছে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সরকারি বাহিনী–কিনে নিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সব অংশের লোকজনকে। আমাদের ইয়াবার উৎস মায়ানমারেও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত খোদ সামরিক বাহিনী। আর এটা তো জানা কথা যে এমনিতেও বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির সত্যিকারের প্লেয়ারদের কখনো ছুঁতে পারবে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের বিরুদ্ধে মোট সাত বছর ধরে দুটো যুদ্ধ করেছিল ব্রিটেন। আফিম ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ভারতের (বিশেষভাবে বঙ্গের) কৃষকদের সাদা মানুষেরা পপি চাষে বাধ্য করত আর তারপর সেটা বিক্রি করত চীনে। এ ব্যবসায় যুক্ত ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এবং অ্যামেরিকাও। এ সময়টাতে পশ্চিমে ঘটা ইকোনমিক বুমের পেছনে বিশাল একটা ভূমিকা ছিল আফিম ব্যবসার। বিংশ আর একবিংশ শতাব্দীর গল্পগুলো খুব একটা আলাদা না। এলএসডির ব্যাপক প্রচলন, এলএসডিসহ অন্যান্য ড্রাগ ব্যবহার করে বিভিন্ন সাইকোলজিকাল এক্সপেরিমেন্ট, বিটনিক ও হিপিদের ড্রাগ কালচার, ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে চলা মাদক উৎপাদনে (বিশেষত হেরোইন ও কোকেইন) সিআইএ-এর ভূমিকা নিয়েও অনেক লেখালেখি হয়েছে।[৫৮] আমরা এমন একটা গ্লোবাল সিস্টেমের মধ্যে থাকি, যেই সিস্টেমই বৈশ্বিক ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই সিস্টেম চায় স্বল্পমেয়াদে ড্রাগের ব্যবহার একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখতে, আর দীর্ঘমেয়াদে বাড়াতে। এই সিস্টেম মূল প্লেয়ারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখে অথবা বলা যায় মূল প্লেয়ারদের অনেকেই সিস্টেমের ওপরের তলার অংশ। তাই সিস্টেমের ভেতরে থেকে, লিস্ট করে কিছু মানুষ কিংবা গডফাদার মারলে যে এই গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে, অথবা বাংলাদেশের মতো 'সম্ভাবনাময়' মার্কেট থেকে এই 'প্রডাক্ট' দূরে রাখা যাবে, এমন মনে করাটা সুখকর হলেও বাস্তবসম্মত না।

এ ছাড়া এ ধরনের ট্রিগার-হ্যাপি সমাধানের ব্যাপারে আরও কঠিন কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। যদি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকে ঢালাওভাবে পলিসি হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে সেটার শেষ কোথায়? এ ধরনের 'সমাধানে' বেশ বড় ধরণের সমস্যা আছে। ধরুন নিয়ম করে সব মাদক ব্যবসায়ী এবং ব্যবহারকারীকে মারা শুরু হলো। এখন এটা কোথায় গিয়ে থামবে? একজন মাদক ব্যবহারকারী কিংবা একজন রোহিঙ্গা মাদকবিক্রেতা কি একজন চোর কিংবা ডাকাতের চেয়ে বেশি অপরাধী? কিংবা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা ঋণখেলাপির চেয়ে? সরকারি অফিসে বসে থাকা ঘুষখোরের চেয়ে? কিংবা চাঁদাবাজ? ধর্ষক? লিস্টে অ্যাটলিস্ট ধর্ষকদের মনে হয় রাখা উচিত। নিশ্চয় ধর্ষকদেরও এভাবে লিস্ট করে মেরে ফেলা যায়। আচ্ছা, শিবির-সন্ত্রাসী-জঙ্গি-মাদক ব্যবসায়ী-ধর্ষকদের সাথে ঋণখেলাপিদেরও কি অ্যাটলিস্ট লিস্টে রাখা যায়?

---

[৫৮] আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন *The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade*, Alfred W. McCoy এবং The Search for the "Manchurian Candidate": The CIA and Mind Control: The Secret History of the Behavioral Sciences, Johon Marks।

একজন মাদক ব্যবহারকারী কিংবা মাদকের খুচরো ব্যবসায়ী কি একজন ঋণখেলাপির চেয়ে বড় অপরাধী? অপরাধের তীব্রতার মাত্রা কীভাবে ঠিক করা হবে?

আচ্ছা এভাবে কি কখনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মেরে ফেলার সম্ভাবনা আছে? অথবা যেকোনো বিরোধিতাকারীকে? কোটাবিরোধী আন্দোলন কিংবা শিক্ষাখাতে ভ্যাটবিরোধীদের মেরে ফেলা কি এভাবে জায়েজ হতে পারে? কাদের কাদের এভাবে নিশ্চিন্ত মনে বিচার ছাড়া মেরে ফেলা যাবে সেটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক হবে?

জনমত? ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছে? সুশীল সমাজের মত?

মধ্যবিত্তের ভোট?

মানুষের বানানো সংবিধান?

নাকি জঙ্গলের নিয়মে?

চিন্তা করার ক্ষমতা একেবারেই যারা বিসজর্ন দেননি তাদের বুঝতে পারার কথা যে, এ ধরনের প্রেসক্রিপশানে কোনো সমাধান আসবে না; বরং তৈরি হবে আরও বড় সমস্যা।

মাদক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য আরেকটা জনপ্রিয় সমাধান হলো মাদকবিরোধী আইন জোরদার করা, শাস্তি কঠিন করা এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আপাতভাবে এটাকে বেশ লজিকাল সমাধান মনে হয়। তবে ৭৬-এ অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া মিল্টন ফ্রিডম্যান এ ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। তার বিখ্যাত (কুখ্যাত) বক্তব্য ছিল, নেশাদ্রব্যগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রেখে মাদক সমস্যার সমাধান হবে না। অ্যামেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণের পলিসির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৯১৯ সালে অ্যামেরিকায় মদ উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রি ও পান করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এটার ফলাফল কী ছিল? মদ্যপানের পরিমাণ কমেনি, কিন্তু বেড়েছিল মদ্যপানের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা। বৈধ মদের অবর্তমানে মানুষ তখন ঝুঁকেছিল বিভিন্ন ধরনের চোলাই মদের দিকে। ঘরে মদ বানানো শুরু করেছিল অনেকেই। গড়ে উঠেছিল মদের বিশাল একটা ব্ল্যাকমার্কেট, এবং সেই বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য ব্যাপক খুনোখুনি শুরু করে দিয়েছিল মাফিয়াগুলো। আগে যে আইন মেনে চলা সুনাগরিক ছিল, শুধু মদ পান করার কারণে সে এখন অপরাধী হয়ে গেল।

সবগুলো কথা মাদকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তাই ফ্রিডম্যানের মতে সমাধান হলো, সব ড্রাগ বৈধ করে দেয়া। বৈধ করে দেয়া হলে মাদক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত অপরাধগুলো—যেমন : চুরি, ছিনতাই, খুন, ব্যবসায়ীদের নিজেদের ভেতরকার যুদ্ধ—কমিয়ে আনা যাবে—যেহেতু মাদকগুলো অবৈধ করে রাখার কারণে ড্রাগ ব্যবহারকারীরা অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। যদিও এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের সাধারণত অন্যান্য সব আইন মেনে চলা সুনাগরিক বলা চলে। আবার ব্যাপক চাহিদা থাকায় মাদকগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রাখার অর্থ হলো ড্রাগের ব্ল্যাকমার্কেট তৈরি করা এবং টিকিয়ে রাখা। যার কারণে মাদকগুলোর দাম বেড়ে যাচ্ছে। বেশি দাম দিয়ে ড্রাগ কিনতে গিয়ে বাড়ছে অপরাধ। নিম্নমানের প্রডাক্টের কারণে বাড়ছে ড্রাগ-রিলেটেড মৃত্যুও। এবং এতকিছুর পরও মাদকের ব্যবহার কমছে না; বরং দিন দিন বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। সবচেয়ে অ্যাডিক্টিভ মাদক হলো সিগারেট, যে মাদকের কারণে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় সেটা হলো অ্যালকোহল, অথচ এ দুটোই বৈধ। তাহলে অন্যান্য ড্রাগগুলো অবৈধ করে রাখার ক্ষেত্রে যুক্তি কী, আর কেন সেই যুক্তিগুলো সিগারেট বা মদের ক্ষেত্রে খাটবে না?

বাস্তবতা হলো, চাহিদা এবং জোগান চালু থাকলে মাদকগুলোকে অবৈধ বানিয়ে রেখে মাদকের ব্যবহার এবং মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ কোনোটাই কমানো যাবে না।

ইনফ্যাক্ট ড. ফ্রিডম্যানের দাবি হলো, মাদক বৈধ করে দিলে অ্যামেরিকাতে জেল এবং কয়েদির সংখ্যা কমবে। প্রতিবছর কমবে কমপক্ষে ১০ হাজার খুন। কমে আসবে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে অপরাধের মাত্রা, পরিমাণ ইত্যাদি।[৫৯]

মজার ব্যাপারটা হলো, সহজাতভাবে প্রায় ৯০% বা তারচেয়েও বেশি মানুষের কাছে ড. ফ্রিডম্যানের কথা ভুল মনে হলেও লিবারেল সেক্যুলারিযমের অবস্থান থেকে ঢালাওভাবে তার কথাকে উড়িয়ে দেয়া বেশ কঠিন। ড. ফ্রিডম্যান নিজ বক্তব্যের পক্ষে বেশ কিছু শক্ত ডেইটা এনেছেন এবং আংশিকভাবে হলেও পশ্চিমে এ অবস্থান মেনে নেয়া শুরু হয়েছে। অ্যামেরিকার অনেক রাজ্যে এখন মারিওয়ানা (ক্যানাবিস, গাঁজা) বৈধ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্ক্যান্ডেনেইভিয়ার কিছু দেশে, বিশেষ করে নরওয়েতে নেশাজাতীয় ড্রাগগুলোকে ডিক্রিমিনালাইয (লিগালাইয না) করা হয়েছে। কাজেই, আপাতভাবে আমাদের কাছে যে সমাধানকে মানবিক এবং লজিকাল মনে হয় (শক্ত আইন, কঠিন শাস্তি) সেটাও আসলে অতটা সোজাসাপ্টা এবং কার্যকর না।

---

[৫৯] আরও জানতে দেখতে পারেন, 'America's Drug Forum, Interview with Milton Friedman (1991) - https://bit.ly/28T24qp, https://bit.ly/2sqgV42,

তাহলে সমাধান কী? এভাবেই কি আমাদের ড্রাগ ও ড্রাগমানির ক্রমবৃদ্ধিমান ব্যবহার ও প্রভাব দেখতে হবে?

সমাধান আছে, তবে সম্ভবত আপনার পছন্দ হবে না।

প্যারাসিটামলের সমাধান না, অপারেশনের সমাধান।

২০০০ এর মাঝামাঝি তালিবান নেতা মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার ঘোষণা করেন আফগানিস্তানে আর কোনো পপি চাষ হবে না। পৃথিবীর মোট পপির প্রায় ৯০% এবং হেরোইনের প্রায় ৭০% আসে আফগানিস্তান থেকে। তাই এ ধরনের ঘোষণার প্রতিফলন বাস্তবে কতটুকু ঘটবে এ নিয়ে প্রশ্ন ছিল শুরু থেকেই। বিশেষ করে ত্রিশের দশকে অ্যামেরিকার মদ নিষিদ্ধ করার পলিসির ব্যর্থতার উদাহরণ বিশ্বের সামনে থাকার কারণে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ১ বছরের মাথায় তালিবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পপি চাষ ৯৯% কমে এল। কীভাবে তালিবান এই 'অসাধ্য' সাধন করল?

তালিবানের মাদকবিরোধী অভিযানের মোটাদাগে চারটি মূলনীতি পাওয়া যায় :

১) মাদক এবং মাদক উৎপাদনের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ব্যাপকভাবে প্রচার করা; জনমত তৈরি,

২) শরীয়াহ অনুযায়ী অপরাধীর দ্রুত ও কঠোর শাস্তির হুমকি,

৩) তৃণমূল পর্যায়ে মনিটরিং এবং পপি খেত ধ্বংস করা, ব্যর্থতার জন্য চাষিদের পাশপাশি তৃণমূলের দায়িত্বশীলদের শাস্তির ব্যবস্থা করা,

৪) অপরাধীদের পাবলিকলি শাস্তি দেয়া ও অপমানিত করা।[৬০]

আইনশৃঙ্খলা বা অপরাধ পরিস্থিতির বদলে তালিবান পুরো ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রোচ করল শরীয়াহর হুকুম বাস্তবায়ন হিসেবে। আধুনিক, সভ্য, সফিসটিকেইটেড অ্যামেরিকান রাষ্ট্রযন্ত্র যেখানে ব্যর্থ, 'বর্বর, মধ্যযুগীয়, আনকালচারড' জঙ্গি তালিবান সেখানে সফল হলো। কান্দাহার আর হেলমান্দের কৃষকরা বলা শুরু করল, না খেয়ে মারা গেলেও তারা আর কখনো পপি চাষ করবে না। অপরাধের সাথে যুক্ত বিশাল একটা অংশকে তারা অপরাধ ছেড়ে দিতে কনভিন্স করলো। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিংবা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে না, এটা করা হল আল্লাহর সার্বভৌম আইনের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে।

---

[৬০] দেখুন : Where have all the flowers gone?: Evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, Graham Farrell & John Thorne (2004).

'আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর কেবল আমাদেরই অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার আছে, তাই আমরা যা বলব তা-ই আইন', আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের এ মেসেজের বদলে বলা হল–'আসমান ও যমিনের মালিক এ কাজ হারাম করেছেন, আর আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইনই চলবে। যে আল্লাহর আইন মানবে না সে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। আর দুনিয়াতে, আমরা শরীয়াহ অনুযায়ী তাদের বিচার করব। এর চেয়ে বিন্দুমাত্র কম বা বেশি করার এখতিয়ার আমাদের নেই।'

তালিবান মানুষের সামনে এমন একটি আদর্শ দিলো যা তাদের ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করল। বাস্তবতা বলে–মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, মুক্তচিন্তা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তালিবান এমন একটি বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসন গড়ে তুলল যেখানে আসলেই বিচার হয়, অপরাধী যে-ই হোক না কেন। সেক্যুলার সিস্টেমের মতো না, যেখানে বিচার হয় কেবল দুর্বলদের। এবং তারা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলল যা পশ্চিমের গড়ে তোলা গ্লোবাল সিস্টেমের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, আর তাই গ্লোবাল ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির মূল প্লেয়ারদের তোয়াজ করাকেও দরকার মনে করে না। ভালো ও মন্দের মানবরচিত পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার বদলে তারা নিজেদের কাজগুলোকে সাজাল পরম, ধ্রুব সংজ্ঞার কাঠামোতে। অপরাধীও স্বীকার করল সে যা করছে তা আসলেই অপরাধ। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতাসীনদের দেয়া সংজ্ঞা, মানবরচিত আইন কিংবা নির্বাচনী হিসেব-নিকেশের কারণে না, তারা স্বীকার করল কারণ সৃষ্টিজগতের মালিক বলেছেন এটা অপরাধ।

আধুনিক ইতিহাসে এর চেয়ে সফল আর কোনো মাদকবিরোধী অভিযানের দৃষ্টান্ত নেই।

এটা কি তালিবানের কৃতিত্ব? না, এটা আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাযিলকৃত শরীয়াহর সৌন্দর্য। পশ্চিমা সেক্যুলার মানবরচিত আইনের বদলে তালিবান আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল, তাঁদের কৃতিত্ব এটুকুই।

২০০১ সালে অ্যামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পর আফিম উৎপাদন আবার আগের অবস্থায় ফেরত যায়। ২০১৭ সালে উৎপাদিত হয় আফগান ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ হেরোইন।

প্রাচীন রোমে এক শ্রেণির মানুষকে বলা হত হোমো সাসের (Homo Sacer), এরা না-মানুষ। নিষিদ্ধ। যে কেউ এদের মেরে ফেলতে পারে। মানবতার বুলি আওড়াতে আওড়াতে, সভ্যতার সবক দিতে দিতে আমরাও তৈরি করে নিয়েছি আমাদের হোমো সাসের। পশ্চিমের কাছে, সাম্রাজ্যের কাছে হোমো সাসের হলো জঙ্গি, সন্ত্রাসী। জঙ্গি হলে গর্ভের শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ এবং এ দুয়ের মাঝে বাকি সবাই হত্যাযোগ্য। ২ কোটি মানুষ জাস্ট সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কোলেটরাল ড্যামেজ।[৬১] কারও ওপর একবার জঙ্গি নামটা লাগিয়ে দিতে পারলেই হলো, আর কিছুর দরকার নেই।

জঙ্গি ট্যাগ লাগানো গেলে যারা জঙ্গিত্ব থেকে বাঁচতে বেপরোয়া, সাম্রাজ্যবাদের কুনজর এড়াতে, স্বীকৃতি পেতে আর 'শত্রু' হওয়া এড়াতে নতজানু, সেই 'মূলধারাকেও' পাইকারিভাবে মেরে ফেলা যায় রাতের অন্ধকারে। সকালের পত্রিকায় গাছ কাটা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেই হয়ে যায়। ফিরিঙ্গি হতে চেয়েও হতে না পারা আমাদের কাছে না-মানুষ হলো এমন যে কেউ যার সাথে আমরা নিজেদের মেলাতে পারি না, অথবা চাই না। এদের পরিবার নেই, অধিকার নেই, এদের নিয়ে কথা বলার কিছু নেই, অর্থ নেই এদের পেছনে দামি আবেগ খরচ করার। এদের স্ত্রী নেই, বাচ্চা নেই, পরিবার নেই, এদের নিয়ে হা-হুতাশ, আদিখ্যেতা আর পাবলিক রিলেশনের মাস্টারপিস তৈরি করার কেউ নেই। এদের জীবনের দাম নেই। এদের মৃত্যুকে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মানবিক বানানোর জন্য নেই অডিও কিংবা ভিডিও, নেই প্রতিবাদ কিংবা প্রতিবাদ করে সেলিব্রিটিদের সভ্য হবার আর দুঃখপ্রকাশ করে নিজের মনুষ্যত্ব প্রমাণের সুযোগ। এদের মৃত্যুর পর অপরাধ ও শাস্তি, বিচার ও ইনসাফ নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনায় মগ্ন হয়ে নিজেকে গোপনে বাহবা দেয়া যায় না। ফেইসবুকে 'রেস্ট ইন পিস', 'ওপারে ভালো থাকিস' জাতীয় স্ট্যাটাস দেয়া যায় না। চিন্তা করা যায় না মোমবাতি কিংবা ফানুশ জ্বেলে হাত ধরাধরি করে শোক পালনের আদিখ্যেতার কথা। এদের নিয়ে চিন্তা, কথা, আবেগ, দুঃখ কিংবা প্রশ্ন বৃথা; অলাভজনক। এরা না-মানুষ, প্রায় অস্তিত্বহীন। পত্রিকার শেষ পাতায় কিংবা ভেতরে দু-তিন ইঞ্চির কলাম, চিন্তার ফুটনোট, আড্ডায় কিছু একটা বলে নিজের উপস্থিতি কিংবা চিন্তার অস্তিত্ব জানান দেয়ার রসদ। যতক্ষণ আমার জীবনে ব্যাঘাত ঘটছে না, ততক্ষণ যাকে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে মেরে ফেলা হোক। আমার আপত্তি নেই।

ইচ্ছেমতো মানুষকে হত্যাযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার মতো এত ভয়ংকর পর্যায়ের যুলুমও আমরা মেনে নেব, কিন্তু সমাধানের দিকে তাকাব না। আমাদের মধ্যে কেউ

---

[৬১] Direct War Death toll, Costs of War, https://bit.ly/2PcDV0w
Refugees & Health, Costs of War, https://bit.ly/2ItTsrn

সুষ্ঠু ও অবাধ গণতন্ত্রের কথা বলবে, কেউ মানবাধিকারের মুখস্থ বুলি আওড়াবে, কেউ বলবে দেশপ্রেম, চেতনা, মুক্তচিন্তা আর বাক্‌স্বাধীনতার কথা; কেউ পোস্ট-মর্ডানিস্ট ব্যাখ্যা দেবে, রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ আর সমাজের অভিজাতদের শক্তি উপাসনার আলোকে 'বাবা তুমি কানতেসো যে' কথাটাকে ডিনকন্সট্রাক্ট করবে, কেউ বলবে পশ্চিম কত ভালো, কেউ বলবে বিএনপি কত ভালো, কেউ 'আই হেইট পলিটিক্স' কপচাবে; কেউ ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলবে নৌকায় কিংবা দুই নৌকায় পা দিয়ে; কেউ স্বপ্ন দেখবে ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রভাব অর্জনের বালুর প্রাসাদের, মগজে পশ্চিম আর অন্তরের অর্ধেকটাতে ইসলাম রেখে কেউ কেউ প্রলাপ বকে যাবে, নিজের কাপুরুষতার ওপর প্রলেপ দেবে সংবেদনশীলতা, হিকমাহ আর বুদ্ধিবৃত্তির; আর কেউ কেউ বলবে 'শালার জাতটাই খারাপ'–কিন্তু কেউ সমাধানের কথা বলবে না। পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়াহর কথা কেউ বলবে না, সাম্রাজ্যের মোকাবেলার কথা কেউ বলবে না। সমাধানের প্রয়োজনীয় দাম দিতে কেউ রাজি না ।

ঘ্যানঘ্যানে কিছু বুড়ো মানুষ থাকেন। প্রায় সারা বছর ইনারা অনুযোগ করবেন কোনো না কোনো অসুখ নিয়ে। প্রতিবার কথা বলার সময় কত কষ্টে আছেন, শরীরের কত জায়গায় সমস্যা–সেটার লম্বা ফিরিস্তি দেবেন। কিন্তু পিছিয়ে যাবেন আগাগোড়া চেকআপ, বড় কোনো সমস্যা থাকলে প্রয়োজনীয় অপারেশন বা অন্য কোনো চিকিৎসার কথা বললে। সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করতে প্রায় অসীম আগ্রহ থাকলেও তারা সমাধানে আগ্রহী না। আসলে বলা উচিত, সহজ সমাধান না থাকলে কঠিন সমাধানের বদলে সমস্যা নিয়েই বেঁচে থাকাই তাদের পছন্দ। আমার কেন জানি মনে হয়, আমাদের অবস্থা এই ঘ্যানঘ্যানে বুড়োদের মতো। সেই ছোটকাল দেখে আসছি সমস্যা। সমস্যার আর শেষ নেই। সবাই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চায়। সবার কোনো না কোনো মতামত আছে। সবাই বিশেষজ্ঞ, সবাই ইমোশনালি ইনভেস্টেড। কিন্তু ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করার বদলে, মূল সমস্যা নিয়ে কথা বলতে বলুন– তখন আর কাউকে পাবেন না। আমরা ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হিসেবে প্যারাসিটামল চাই। ফাঁপা হয়ে যাওয়া হাড় সারাতে ব্যান্ডএইড লাগাই। ধর্ষণ বলুন কিংবা মাদক সমস্যা– এই সমস্যাগুলো সিস্টেমিক। যায়নিস্ট ব্যাংকার আর ক্রুসেইডার জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত যে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি এগুলো সেই ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা। এগুলো সুশাসনের সমস্যা না, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল কিংবা জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃতিগত সমস্যাও না। এগুলো সভ্যতার সমস্যা। লিবারেল সেক্যুলার সভ্যতার চূড়োয় থাকা দেশগুলোর দিকে তাকান–তারা কি ধর্ষণ, মাদক, মানবপাচার, শিশুকামের মতো সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পেরেছে? বরং যত 'সভ্য' হয়েছে তত বেড়েছে এ অপরাধগুলোর পরিমাণ, মাত্রা এবং অপরাধী কার্টেলদের কাজের সূক্ষ্মতা আর মুনশিয়ানা।

অন্যদিকে সভ্য আমরা যে সমস্যার সমাধান বের করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি, জলজ্যান্ত মানুষকে লিস্টে থাকা নাম বানিয়ে ফেলছি, যখন-তখন যাকে-তাকে না-মানুষ বানিয়ে হ্যাঁ-মানুষদের বানানো আইনে মেরে ফেলার লাইসেন্স দিচ্ছি, এবং এত সবকিছুর পরও ব্যর্থ হচ্ছি—১৪০০ বছর আগে মদীনাতে খুব সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। মদীনার উদাহরণ অনুসরণ করে, বেশি না মাত্র ১৮ বছর আগে আফগানিস্তানে এই সমস্যার সমাধান করে দেখিয়েছে আমাদের ভাষায় পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী। কিন্তু তবু আমরা চোখ বুজে থাকব, ওই সমাধানের দিকে তাকাব না। আমরা কখনো বাহবা দেবো, কখনো অডিও নিয়ে তোলপাড় করব, কখনো ভুলে যাব, চিন্তায় জাবর কাটব, কখনো বা 'কনসার্নড' হব। কিন্তু সমাধান করব না। সমাধানের দিকে তাকাব না। সমাধান নিয়ে চিন্তাও করব না। কেবল মৌসুমি অভিযোগ, অনুযোগ, ক্ষোভ আর নিন্দাজ্ঞাপনের দুঃখবিলাস করে যাব।

সমাধান আছে। সমাধানের বাস্তব দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু আমরা সমাধানে আগ্রহী না। আমরা আগ্রহী দুঃখবিলাস আর জাতে ওঠায়। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা ঘুরপাক খেতে থাকব রুটিন অনুযায়ী সমর্থন-নিন্দা-ক্ষোভ আর তারপর ভুলে যাওয়ার চক্রে।

আমাদের জন্য সমাধান একটাই, রোজ প্যারাসিটামল দুই বেলা।

ভুল মাপকাঠি

প্রত্যেক মানুষ স্রষ্টা, তাঁর একত্ব এবং নৈতিকতার ব্যাপারে এক সহজাত বোধ নিয়ে জন্মায়।[৬২] আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা, তাঁর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্যের প্রবণতা মানুষের মধ্যে কাজ করে জন্মগতভাবে। একইসাথে মানুষের মধ্যে কাজ করে সহজাত কিছু মূল্যবোধ। মানুষের এই সহজাত বোধকে বলা হয় ফিতরাহ। মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) এমন দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যা এ ফিতরাহ বা সহজাত মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষা ও বিধানগুলো তাই সহজাতভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে।

> *'অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দ্বীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির (ফিতরাহ) ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সূরা আর-রুম, ৩০)*

একজন মুমিন ইসলামের বিধানগুলো মেনে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সে জানে তাঁর ধর্ম তাঁকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে বলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় আখিরাতে পুরস্কারের। একজন বিশ্বাসীর কাছে নৈতিকতা দিনবদলের সাথে বদলাতে থাকা আপেক্ষিকতার নাম না। নৈতিকতা তার কাছে আল্লাহর নির্ধারিত ভালো ও মন্দের অমোঘ শ্রেণিবিভাগ। ঈমানের দ্বারা সুদৃঢ় হওয়া ফিতরাহ মুমিনকে এ নৈতিকতা মেনে চলতে প্রভাবিত করে।

---

[৬২] প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর অর্থাৎ ঈমান ও সত্য-ন্যায়ের যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদী বানায় অথবা নাসরানী বানায় অথবা অগ্নিপূজারি বানায়।- সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৮৫

অন্যদিকে সেক্যুলারিযম নৈতিকতার এ দুটি ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেলে। সেক্যুলারিযমের যত ধারা আছে সবগুলোর জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। তুলনামূলকভাবে নিরীহ যে ধারা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চায় এবং আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে ধর্মের এবং স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, সেটার ক্ষেত্রে যেমন এ কথা সত্য, তেমনি আবার ধর্মবিরোধিতা ও ধর্মকে তাচ্ছিল্য করার সেক্যুলারিযমের চরমপন্থী নাস্তিকতার ধারার ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

নৈতিকতার মাপকাঠিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে সেক্যুলারিযম সেখানে বসায় মানবীয় খেয়ালখুশিকে। একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, ফ্যাশিস্ট, নাকি সমাজতান্ত্রিক, তাতে কিছু যায় আসে না। কাঠামো যা-ই হোক সেক্যুলারিযম নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে মানুষের খেয়ালখুশিকে, সেই খেয়ালখুশি হতে পারে একজন স্বৈরশাসকের, গুটিকয়েক নেতার অথবা সংখ্যাগুরুর।

> *'তুমি কি তাকে দেখোনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?' (সূরা আল-ফুরক্বান, ৪৩)*

মানুষের খেয়ালখুশি এবং কামনা-বাসনা প্রায় প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। এর কোনো স্থিতিশীলতা, তাল-লয়-মাত্রা নেই। তাই এগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আদর্শও বদলাতে থাকে ক্রমাগত। এক যুগের অসুস্থতা আরেক যুগের আবশ্যিকতা হয়ে দাঁড়ায়, এক সময়ের অন্যায় অন্য সময়ে পরিণত হয় বৈধ কিংবা প্রশংসনীয় কাজে। কোনো সমাজকে যখন মানুষের সহজাত নৈতিকতা এবং অন্তর্নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তখন দুটো ব্যাপার ঘটে।

অতি দ্রুত এবং অনিশ্চিত গতিতে ভালোমন্দের সংজ্ঞা বদলায়, এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ এগিয়ে যায় নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে। আজকের পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজে এ দুটো ব্যাপারই ঘটছে। আর সেক্যুলারায়নের সাথে সাথে ঘটতে শুরু করেছে আমাদের সমাজেও। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে জাহাঙ্গীর নগরের ছাত্রী হস্টেলের ট্রাঙ্কে বন্দী আর ডাস্টবিনে পড়ে থাকা পলিথিনে প্যাঁচানো পরিত্যক্ত অপাপবিদ্ধ শিশুদের মৃতদেহ, পর্নোগ্রাফি আর মাদকের নেশায় আসক্ত লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর-যুবকদের অন্ধকারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীরব নিভৃত ধ্বংস, আর পাইকারী হারে ধর্ষিত, নির্যাতিত আর খুন হওয়া নারীদের মিছিল।

বিভিন্ন অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও ট্র্যাডিশানাল সমাজের মধ্যে একটা সহজাত শক্তি থাকে। এর কারণ হলো কিছু না কিছু সহজাত বৈশিষ্ট্য কিংবা ফিতরাতী মূল্যবোধ ট্র্যাডিশানাল সমাজের মানুষের মধ্যে টিকে থাকে। এ ছাড়া যেসব ফিতরাতী মূল্যবোধ

তাদের খেয়ালখুশির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক না, নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে সেগুলো আঁকড়ে থাকে বিভিন্ন ট্র্যাডিশানাল সমাজ। যেমন : সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, সতীত্বের মতো মূল্যবোধগুলো, বিয়ে, পরিবার, মা ও স্ত্রী হিসেবে নারীর ভূমিকা সব ধরনের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে দেখা হয়। কারণ, এ বুঝগুলো মানুষের ফিতরাহর অংশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের অন্তরে এগুলো গেঁথে দিয়েছেন।

কিন্তু একটা সমাজে সেক্যুলারিযমের প্রসারের সাথে সাথে কমতে থাকে এ ধরনের মানুষ ও মূল্যবোধ; কমতে থাকে সমাজে তাদের প্রভাবও। ধীরে ধীরে একপর্যায়ে পুরো সমাজ ওই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে যা একসময় তারা সযত্নে লালন করত।

জাহেলি সভ্যতার এ ক্রমপরিবর্তনশীল, স্ববিরোধী চেহারার সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো এখনকার পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজগুলো। একদিকে এরা সংস্কৃতি এবং এর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল মনে করে। অন্যদিকে নিজেদের ঠিক করা কিছু কিছু মূল্যবোধকে এরা সর্বজনীন ঘোষণা করে, এগুলোর লঙ্ঘন মারাত্মক অপরাধ মনে করে এবং লঙ্ঘনকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়।

এ স্ববিরোধিতার উৎস হলো এমন দুটি মৌলিক নীতি যেগুলোকে আধুনিক গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সমাজগুলো তাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

প্রথমটি হলো, সংখ্যাগুরুর মতকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়টি হলো, ব্যক্তিস্বাধীনতা।

মজার ব্যাপার হলো, এ দুটি নীতি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। তৃতীয় কোনো মূলনীতির অধীনে এদের মধ্যে মিটমাট না করে দিলে এ দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ অবধারিত।

সেক্যুলারিযম সহজাতভাবে ধর্মকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি মানবজাতির জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রে ফিতরাহকে (সহজাত মূল্যবোধ) গোনায় ধরে না। কোন আচরণগুলো বৈধ ও উপযুক্ত তা ঠিক করার মানদণ্ড হিসেবে সংখ্যাগুরুর মত আর ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতিকে গ্রহণ করার কোনো বিকল্পও তাই সেক্যুলার সমাজের থাকে না।

সেক্যুলার সমাজে এ দুটো নীতির বিভিন্ন বিকৃত ফলাফল সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যু থেকে স্পষ্ট। যেমন : এসব সমাজে একদল মানুষ সমকামিতাকে মেনে

নেয়ার কথা বলে। সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে এরা সমকামীদের সমান অধিকার চায়। গত কয়েক দশকে এরা এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপকভাবে সফলও হয়েছে। তাদের এ দাবির ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা ব্যক্তি-অধিকারের মূলনীতি। ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী একজনের 'যৌনতা' নিয়ে আরেজনের কথা বলার অধিকার নেই। অন্যদিকে গর্ভপাতের পক্ষেও ঠিক একই যুক্তি দেয় আরেকদল। এরা বলে, 'আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমার আছে। আমার শরীরের কী হবে, সেটা ঠিক করব আমি। এখানে অন্যদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই।' এ কথার বিপরীতে বিরোধী পক্ষ কেবল এটুকুই বলতে পারে যে, এ ধরনের আচরণ সমাজের অধিকাংশ মানুষের মূল্যবোধের পরিপন্থী। যদিও বাস্তবতা হলো তাদের অনেকেই গর্ভপাতের বিরোধিতা করে নৈতিক ও ধর্মীয় জায়গা থেকে। কিন্তু সেক্যুলার সমাজের সেক্যুলার সদস্য হিসেবে সেটা তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কারণ, সেক্যুলার সমাজ কখনো সেটা মেনে নেবে না। নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো স্থান সেক্যুলার সমাজে নেই।

সংখ্যাগুরুর মত আর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পর মূল্যবোধগুলোর নিত্য পরিবর্তনকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। একটি সমাজ কোন মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করছে আর কোনগুলো বর্জন করছে, তাতে আসলে কিছু যায় আসে না। যেহেতু সবকিছু আপেক্ষিক তাই সবগুলোই সমানভাবে সঠিক। আজকের সেক্যুলার সমাজে যেসব আচরণকে জঘন্য মনে করা হচ্ছে, যেমন : ধর্ষণ কিংবা শিশুদের ওপর যৌন-নির্যাতন, এগুলোকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করার একমাত্র কারণ হলো এগুলোর ব্যাপারে মানুষের বর্তমান মনোভাব। কিন্তু এ মনোভাব কাল বদলে যেতে পারে। যেমন ব্যভিচার, বহুগামিতা ও সমকামিতার ব্যাপারে পশ্চিমের মনোভাব বদলেছে। একসময় সমকামিতাকে জঘন্য যৌনবিকৃতি আর অসুস্থতা মনে করা হতো, আর এখন সমকামীদের 'বিয়ে'কে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আর এর বিরোধিতাকে বলা হচ্ছে 'ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ'। মানুষের মনোভাব বদলানোর সাথে সাথে বদলে গেছে নৈতিকতা।

একইভাবে মনোভাব বদলে গেলে আজকের অবৈধ কাজগুলোকে আর ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা হবে না; বরং বৈধ কিংবা প্রশংসনীয়ও ভাবা হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভয়ংকর সব অপরাধও এক সময় পেতে পারে সামাজিক ও আইনি বৈধতা।

এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে সেক্যুলাররা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়, কারণ ধর্ষণ কিংবা শিশুদের ওপর যৌন-নির্যাতনের মতো অপরাধগুলোর প্রতি তাদের মধ্যেও সহজাত ঘৃণা

কাজ করে। কিন্তু এ ঘৃণার ভিত্তি সংখ্যাগুরুর মত কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতা না; বরং সেক্যুলারিযমের বিষ সত্ত্বেও এখনো তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকা আল্লাহপ্রদত্ত ওই সহজাত মূল্যবোধের ছিটেফোঁটা।

'কেন তুমি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করো?' 'কেন তুমি সংখ্যাগুরুর মতকে অন্য সব মূল্যবোধ ও আচরণের মাপকাঠি বানিয়েছ?' এ প্রশ্নগুলো করলে একজন সেক্যুলারিস্ট হয়তো আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সে হয়তো বলবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সে শ্রদ্ধা করে নিজের ব্যক্তিগত অনুরক্তি ও আদর্শিক অবস্থান থেকে। অথবা সে বলতে পারে, সে মনে করে গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ।

কিন্তু আরেকজন যদি তার ব্যক্তিগত পছন্দ, আদর্শিক অবস্থান ও মতের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নেয়? সে ক্ষেত্রে সেক্যুলারিস্টের জবাব কী হবে? সবই যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে একজনের মত আরেকজনের ওপর প্রাধান্য পাবে না; দুজনের মত সমানভাবে সঠিক হতে বাধ্য। তাহলে দুটো বিপরীত সাংঘর্ষিক অবস্থার সুরাহা কীভাবে হবে? অধিকাংশের মত? অধিকাংশ কি সব সময় নৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে? হিটলার কিংবা স্টালিনের গণহত্যার পেছনে কিন্তু অধিকাংশের সমর্থন ছিল। নড়বড়ে ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠার কারণে যা কিছু মূল্যবান মনে করে সেক্যুলার সমাজগুলো আজ আঁকড়ে ধরছে কালই হয়তো তারা অবস্থান নেবে সেটার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া এ মূলনীতিগুলো দখলদারিত্ব ও উপনিবেশবাদের দিকে সেক্যুলার সমাজের অধঃপতনের পথ সুগম করে দেয়। কারণ, আগ্রাসন থেকে বিরত থাকার ভালো কোনো কারণ তাদের আদর্শ থেকে পাওয়া যায় না।

একজন দাঁড়িয়ে বলবে, 'অমুক দেশ আক্রমণ করলে আমাদের দেশ ও অর্থনীতির এই এই লাভ হবে।' অন্যান্য নাগরিকরা এ কথা বিশ্বাস করে তার পক্ষে নেবে। যদি সংখ্যাগুরু তার পক্ষ নেয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পরিণত হবে রাষ্ট্রীয় পলিসিতে। কিন্তু আদতে এর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। এর পেছনে একমাত্র কারণ হলো লোভ। ইতিহাসের সব সীমালঙ্ঘনের পক্ষে বারবার এ যুক্তিই দেয়া হয়েছে। এ যুক্তিতেই এক পশু আরেক পশুকে আক্রমণ করে। ইউরোপিয়ান এবং অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সারা বিশ্বজুড়ে তারা লুটপাট চালিয়েছে এ ধরনের যুক্তির ওপর ভর করেই।

বাস্তবতা হলো, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংখ্যাগুরুর মত সেক্যুলার সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি না। কারণ, স্বাধীনতার ফলাফল হলো সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা। কিন্তু স্বাধীনতা

সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি না। অর্থাৎ কাউকে যদি সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দেয়াও হয় তবুও সে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। তাই স্বাধীনতা থাকলেও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একটি মাপকাঠির। একইভাবে সংখ্যাগুরুর মতও কোনো মাপকাঠি হতে পারে না। সংখ্যাগুরুর মত হলো বিভিন্ন ব্যক্তির নেয়া সিদ্ধান্তের সামষ্টিক ফল। কিন্তু এই ব্যক্তিরা কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? তাদের মাপকাঠি কী?

সেক্যুলার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি হলো তাদের খেয়ালখুশি ও কামনা-বাসনা, যেগুলোকে তারা নিজেদের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য হলো শরীয়াহ মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার (Natural Disposition) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেক্যুলার ব্যবস্থা ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষ ফেরেশতা না। প্রাণী হিসেবে মানুষ একই সাথে ধারণ করে অত্যন্ত মহৎ এবং অত্যন্ত পাশবিক আচরণের সক্ষমতা ও প্রবণতা। মানুষের পক্ষে সম্ভব না নিষ্পাপ হওয়া। সম্ভব না নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলা। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ভেতর উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এবং তার চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি তৈরি করা যার কারণে ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করবে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকার, সেগুলোকে ঘৃণা ও বর্জন করার আকাঙ্ক্ষা। পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে চাইলেও সীমালঙ্ঘন করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হাতের নাগালে যিনা, অশ্লীলতা, নেশা, জালিয়াতি, বাটপারির সুযোগ রেখে তারপর মানুষ নিজে নিজে ভালো থাকবে, এই আশা করে লাভ নেই।

এ কাজগুলোতে জড়িয়ে যাবার পর ফিরে আসতে চেয়েও নিজের দুর্বলতার কারণে যে বারবার ব্যর্থ হয়, শরীয়াহ তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করা ব্যক্তি যেন পা পিছলে এই খাদগুলোতে পড়ে না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ তৈরি করে দেয় প্রয়োজনীয় সেইফটি লকগুলো। সবশেষে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে শরীয়াহ জবাবদিহির ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট শাস্তির। আর এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গাফলতি, স্বজনপ্রীতি বা অযৌক্তিক শিথিলতার সুযোগ দেয় না।

এভাবে মানবজাতির আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও সমাধান দেয় শরীয়াহ। শরীয়াহ মানুষের জন্য এমন একটি বাহ্যিক পরিবেশ এবং

অভ্যন্তরীণ নৈতিকতার মানদণ্ড ঠিক করে দেয়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখে মানুষের নফস এবং কুপ্রবৃত্তিকে।

আধুনিক সেক্যুলার পশ্চিম করে উল্টোটা। পদে পদে মানুষের ফিতরাহকে নষ্ট করে। উসকে দেয় মানুষের নফস ও কুপ্রবৃত্তিকে। বদলে দেয়ার চেষ্টা করে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ভূমিকা ও পরিচয়কে। স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, অপ্রয়োজনীয়, অসভ্য, অ-আধুনিক সাব্যস্ত করে। খেয়ালখুশি আর কামনা-বাসনাকে নৈতিকতার মাপকাঠি মেনে ভালোমন্দ ঠিক করে ইউটিলিটি বা উপযোগের ভিত্তিতে। এ সভ্যতা মূল্যবোধ মাপতে শেখায় ইন্দ্রিয়সুখ, সুবিধাবাদ আর বস্তুগত লাভ-ক্ষতির পাল্লায়। ভোগবাদ আর বস্তুবাদের ছকে পড়ে আপেক্ষিক হয়ে যায় সবকিছু। সেক্যুলার দর্শন আমাদের শেখায় নৈতিকতার কোনো পরম মানদণ্ড নেই, যা ইচ্ছে তা করার মাঝেই জীবনের সার্থকতা। ভোগ আর আনন্দই সব। আর ইচ্ছেমতো ভোগ করার সক্ষমতাই হলো স্বাধীনতা।

নৈতিকতার এ ভুল মাপকাঠির কারণেই আধুনিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে থাকার পরও আজ পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজগুলো থামাতে পারছে সমাজের অবক্ষয় আর ভাঙনের নীল স্রোত,পতনকালের অঙ্কুরিত অগ্ন্যুৎসব। মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙন, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, অবাধ ও বিকৃত যৌনতা, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, যৌনায়িত ম্যাস মিডিয়া, সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা, শিশুকামিতা, নারী-পুরুষের সংজ্ঞাকে ঝাপসা করে দেয়া ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা, বিনোদনে বুঁদ হয়ে থাকা থাকা সমাজ, নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, ভোগবাদ আর অবিশ্বাসে নিমজ্জিত তারুণ্য–সভ্যতার বাঁধন ছিঁড়ে পড়ছে চারদিক থেকে। বাঁধভাঙা গতিতে আধুনিক সভ্যতা ছুটে চলছে ধ্বংসপাহাড়ের কিনারায়, এক অনতিক্রম্য অন্তহীন অন্ধকারের দিকে–আদ, সামুদ, কওমে লূতসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নাম না জানা আরও অনেকে জনপদের মতো। মানুষিক খেয়ালখুশিকে দেবতার আসনে বসানো সেক্যুলারিযম এবং ভোগবাদের নেশাতুর নির্লিপ্ত কাচ-চোখে চেয়ে থাকা সেক্যুলার মানুষ এ পতন থামাতে অক্ষম।[৬৩]

---

[৬৩] মূল: *Secularism & Moral Values*, শাইখ জাফর ইদ্রিস। পরিবর্ধিত ও সম্পাদিত।

সমকামী এজেন্ডা : ব্লু-প্রিন্ট

১৯৮৭ সালে অ্যামেরিকান ম্যাগাযিন 'গাইড' এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মার্শাল কার্ক এবং হান্টার ম্যাডসেনের লেখা প্রায় ৫,০০০ শব্দের একটি আর্টিকেল। দু-বছর পর নিউরোসাইক্রিয়াট্রি রিসার্চার কার্ক এবং পাবলিক রিলেইশান্স কনসালটেন্ট ম্যাডসেন একে পরিণত করে ৩৯৮ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে। পরবর্তী তিন দশকজুড়ে কার্ক ও ম্যাডসেনের এই আর্টিকেলে উপস্থাপিত ধারণা ও নীতিগুলো সারা বিশ্বজুড়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রাজনীতি, মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিন্তার জগতে। সমকামীদের ম্যাগাযিন গাইডে প্রকাশিত মূল আর্টিকেলটির নাম ছিল 'The Overhauling of Straight America'। ৮৯ তে প্রকাশিত সম্প্রসারিত বইয়ের নাম দেয়া হয়, *After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90*। কার্ক ও ম্যাডসেনের উদ্দেশ্য ছিল সিম্পল—সমকামিতা ও সমকামীদের প্রতি অ্যামেরিকানদের মনোভাব বদলে দেয়ার জন্য এক স্টেপ বাই স্টেপ ব্লু-প্রিন্ট বা ম্যানুয়াল তৈরি করা।

কিন্তু প্রায় তিন দশক পর বাংলাদেশে বসে কার্ক-ম্যাডসেনকে নিয়ে চিন্তা করা কেন? কার্ক-ম্যাডসেনের নাম শুনেছেন বা তাদের লেখার সম্পর্কে জানেন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু বাংলাদেশেই না, বিশ্বজুড়ে। কিন্তু তাদের ব্লু-প্রিন্টের প্রভাব কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করেনি এমন সমাজ বা রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়াটাও কঠিন। গত ৩০ বছরে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ, সমকামিতাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং সমকামিতার মতো এতটা অস্বাভাবিক একটি বিষয়ের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা প্রায় হুবহু মিলে যায় কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের সাথে। আর বাংলাদেশেও সমকামিতার প্রচার, প্রসার এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য এখন একই পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে, অনুসরণ করা

হচ্ছে একই পদ্ধতি। বর্তমানে ২২টি দেশে সমলৈঙ্গিক 'বিয়ে' আইনগতভাবে স্বীকৃত। শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আগ্রাসী কোনো সেনাবাহিনী এসব দেশের ওপর সমকামিতা চাপিয়ে দেয়নি। তবে নিঃসন্দেহে মানুষের স্বভাবজাত মূল্যবোধ, ফিতরাহর বিরুদ্ধে গিয়ে জঘন্য একটি বিকৃতিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেয়া, মানুষের মাঝে এই বিকৃতির গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা একটি যুদ্ধের অংশ। এই যুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক, আদর্শিক। এই যুদ্ধ সর্বব্যাপী এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনি ও আমি এই যুদ্ধের অংশ। আর এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের রণকৌশলের মূল ভিত্তি কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট। তাই কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট সম্পর্কে জানা, শত্রুর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানা একটি আবশিক্যতা, নিছক অ্যাকাডেমিক কৌতূহল না। তবে এ নীলনকশার দিকে তাকানোর আগে গত তিন দশকে অর্জিত সাফল্যের দিকে একটু তাকানো যাক।

The Overhauling of Straight America

একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। Gallup এর হিসেব অনুযায়ী ৮৭ তে, অর্থাৎ আর্টিকেলটি লেখার সময়, যাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৩% সমকামী সম্পর্ক বৈধ হওয়া উচিত বলে জানিয়েছিল। ৫৫% বলেছিল এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণভাবে বেআইনি ঘোষণা করা উচিত। ত্রিশ বছর পর ২০১৭ তে এসে দেখা গেল ব্যাপারটা প্রায় পুরোপুরি উল্টে গেছে। ৬৪% উত্তরদাতা এখন মনে করছে সমকামী সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিক না; বরং এ ধরনের বিয়ে বৈধ হওয়া উচিত, আর মাত্র ৩৪% এর বিরুদ্ধে।[৬৪] ১৯৮৯ সালে মাত্র ১৯% উত্তরদাতা বিশ্বাস করতেন মানুষ জন্মসূত্রে সমকামী হয়। ৪৮% মনে করতেন সমকামীরা স্বেচ্ছায় বেছে নেয় সমকামিতাকে। ত্রিশ বছরের কম সময়ের মধ্যে ২০১৫ তে ৪২% উত্তরদাতা বিশ্বাস করা শুরু করল সমকামিতা জন্মগত।[৬৫] অথচ ১৯৭৩ সালের আগ পর্যন্ত খোদ অ্যামেরিকান সাইক্রিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশান সমকামিতাকে বিবেচনা করত একটি মানসিক অসুস্থতা হিসেবে।[৬৬]

---

[৬৪] Gay and Lesbian Rights, Gallup

[৬৫] Americans are still divided on why people are gay, Pew Research Center, 2015

[৬৬] Psychiatrists, in a Shift, Declare Homosexuality No Mental Illness, *Times*, DEC. 16, 1973

অর্থাৎ ৫০ বছর আগে যা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল আজ অর্ধেকের বেশি মানুষ তার উল্টোটা বিশ্বাস করছে, যদিও সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বারবার বলছে সমকামিতার কোনো জেনেটিক ভিত্তি নেই, এটি জন্মগত না; বরং স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া একটি বিকৃতি।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৫ তে এসে অ্যামেরিকান খ্রিষ্টানদের ৫৪% মনে করে সমকামিতার বিরোধিতা করার বদলে বরং একে সামাজিকভাবে মেনে নেয়া উচিত। অ্যামেরিকান প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ৬২% সমকামী 'বিয়ে'-কে সমর্থন করে, আর ৬৩% মনে করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর সমকামিতার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।[৬৭] অথচ সমকামিতা যে একটি জঘন্য বিকৃতি, চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন এবং অত্যন্ত ঘৃণিত পাপাচার এ ব্যাপারে বাইবেলের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট।

অ্যামেরিকান সমকামিতা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৮ সালে রিলিয হওয়া প্রায় ১২.৮% হলিউড সিনেমাতে LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Queer) চরিত্রের উপস্থিতি ছিল।[৬৮] পাশাপাশি গত ১৫ বছরের প্রায় সব প্রাইমটাইম টেলিভিশন শো-তে কমপক্ষে একটি সমকামী বা অন্য কোনো বিকৃতকামী চরিত্র রাখা হয়েছে, যদিও Gallup এর মতে অ্যামেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৫% সমকামী।[৬৯] মিডিয়াতে সমকামীদের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থাপনার সঠিক মাত্রাটা বোঝার জন্য এ তথ্য মাথায় রাখুন যে, অ্যামেরিকান মিডিয়ার দর্শক শুধু অ্যামেরিকাতেই সীমাবদ্ধ না। সারা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মানুষ অ্যামেরিকান মিডিয়ার দর্শক ও ভোক্তা। এই কোটি কোটি মানুষের কাছে অ্যামেরিকান মিডিয়া সমকামিতা, সমকামী 'বিয়ে', সমকামী যৌনাচারকে উপস্থাপন করছে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে। সর্বশেষ হিসেবে অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর ১৯৫টির মধ্যে ১২৪টি দেশে সমকামিতা বৈধ।[৭০] সমকামী 'বিয়ে'-কে বৈধতা দেয়া হয়েছে ২৭টি দেশে।[৭১] আরও বেশ কয়েকটি দেশে চলছে স্বীকৃতি দেয়ার প্রক্রিয়া।

---

[৬৭] Most U.S. Christian groups grow more accepting of homosexuality, Pew Research Center, 2015

[৬৮] 2018 GLAAD Studio Responsibility Index

[৬৯] In U.S., Estimate of LGBT Population Rises to 4.5%

[৭০] Brunei stoning: Which places have the death penalty for gay sex? BBC, April 3, 2019

[৭১] Here are the 27 countries where same-sex marriage is officially legal, *ABC News*, Jun 22, 2018

রাজনীতি, অ্যাকাডেমিয়া এবং মিডিয়ার ওপর বিকৃত মানসিকতার এই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রভাবের মাত্রা কতটুকু তা শুধু ওপরের তথ্যগুলো থেকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না। তবে একটা বেইসিক আইডিয়া এখান থেকে আপনি পাবেন।

এই প্রভাবের উৎস কী? আর এই প্রভাবের ব্যাপ্তি কতটুকু?

আর একটা তথ্য দিই, আপনি নিজেই বাকি হিসাবটা মিলিয়ে নিন।

পৃথিবীজুড়ে অনেকগুলো অ্যাডভোকেসি গ্রুপ সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ধনী গ্রুপ হলো HRC বা Human Rights Campaign। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে HRC এর বার্ষিক আয় ছিল ৬.৭৮ কোটি ডলার।[৭২] এই অর্থের উৎস হলো বড় বড় কর্পোরেশানগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অনুদান। HRC এর ডোনার এবং কর্পোরেট পার্টনারদের মধ্যে আছে স্টারবাকস, লিবার্টি মিউচুয়াল ইনশুরেন্স, অ্যামেরিকান এয়ারলাইন্স, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, ব্যাংক অফ অ্যামেরিকা, শেভরন, কোকাকোলা, পেপসিকো, লেক্সাস অটো, গুগল, অ্যামাযন, আইবিএম, নাইকি, গোল্ডম্যান অ্যান্ড স্যাক্স, জেপি মরগান চেইস অ্যান্ড কো, ডেল, শেল অয়েলসহ আরও অনেকে।[৭৩]

বিশাল বাজেটের ব্যাপক প্রভাবশালী এসব অ্যাডভোকেসি গ্রুপ আসলে কী করে? লবিয়িং-এর মাধ্যমে, প্রেশার গ্রুপ তৈরি করে এবং অর্থের জোরে এরা প্রভাবিত করে মিডিয়া, রাজনীতিবিদ, অ্যাকাডেমিয়া[৭৪] এবং সরকারের পলিসিকে। যেমন : এই মুহূর্তে অ্যামেরিকাতে অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলোর একটি প্রধান লক্ষ্য হলো প্রতিটি স্কুলে, হাইস্কুল ও প্রাইমারি পর্যায়ে Gay-Straight Alliance Club অর্থাৎ স্বাভাবিক শিশু ও 'সমকামি শিশু' ঐক্য পরিষদ জাতীয় কিছু তৈরি করা। প্রতিটি স্কুলে গড়ে ওঠা এই ক্লাবগুলোর কাজ হবে শিশুদের মধ্যে সমকামিতার প্রসার এবং স্বাভাবিকীকরণ।

পশ্চিমা অনেক দেশেই প্রাইমারি স্কুল থেকেই যৌনশিক্ষার নামে শিশুদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে সমকামী প্রপাগ্যান্ডা। সম্প্রতি ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের প্রতিবাদের মুখে সমকামী প্রপাগ্যান্ডা প্রচারের কারিকুলাম সাময়িকভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে

---

[৭২] Human Rights Campain Inc, Combined Financial Statement, Year Ending March 31, 2018, https://bit.ly/2P5rhjE

[৭৩] HRC Corporate Partners,

[৭৪] সমকামিতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিসার্চের অর্থায়ন, যাতে করে সমকামিতার 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' তৈরি করা যায়

ব্রিটেনের বার্মিংহামের একটি স্কুল।[৭৫] তবে ইউরোপের অনেক জায়গাতে সন্তানদের এসব ক্লাসে পাঠানো শুধু বাধ্যতামূলক না; বরং এ ধরনের বিকৃত শিক্ষা থেকে সন্তানকে রক্ষা করার চেষ্টাও বেআইনি।

গ্লোবাল এজেন্ডা ও বাংলাদেশ :

বিষয়গুলো শুধু অ্যামেরিকাতে বা পশ্চিমা বিশ্বে সীমাবদ্ধ না। বরং সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণের এই এজেন্ডা বৈশ্বিক এবং এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষণা করে সমকামিতা কোনো অসুস্থতা না কোনো বিকৃতিও না। অর্থাৎ সমকামিতা স্বাভাবিক। OHCHR, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, WFP, ILO, UNESCO, World Bank এবং UNAIDS সহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে বৈষম্য নিরসন, মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নামে উন্নতশীল দেশগুলোতে; বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণের জন্য। এদের মধ্যে Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) সমকামিতাকে মানবাধিকারের সংজ্ঞার ভেতরে ফেলে এর প্রচার করছে।[৭৬] OHCHR সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য Free & Equal নামে একটি আলাদা ক্যাম্পেইন চালু করেছে যার ঘোষিত উদ্দেশ্যের মাঝে আছে শিশুদের সমকামিতা সম্পর্কে সচেতন করা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে সমকামিতা ও সমকামের প্রতি সহনশীলতা তৈরি করা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সমকামিতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। Free & Equal ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ সমকামী 'বিয়ে'-কে বৈধতা দেয়ার জন্য বলিউডে মিউযিক ভিডিও-ও তৈরি করেছে।[৭৭]

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য যা কিছু করা হচ্ছে, যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তার সবই এই গ্লোবাল এজেন্ডার অংশ। বাংলাদেশে সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণের জন্য এখনো পর্যন্ত যেসব কাজ করা হয়েছে তার সবকিছুই খাপেখাপে মিলে যায় কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের সাথে। এ কারণে তাদের কর্মপদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বোঝার জন্য কার্ক-

---

[৭৫] Muslims halt pro-gay curriculum in UK school - https://www.lifesitenews.com/news/muslims-halt-pro-gay-curriculum-in-uk-school

[৭৬] LGBT rights at the United Nations, Wikipedia, https://bit.ly/2GknP27

[৭৭] UN Free & Equal, https://www.unfe.org/about/

ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট সম্পর্কে ধারণা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আলাদাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বরং যে মডেলের মাধ্যমে অ্যামেরিকায় অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে এখন সেই একই মডেল বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই সমকাম প্রচার করা ইয়াহু চ্যাট গ্রুপ, ফোরাম, ফেইসবুক গ্রুপ, রূপবান ম্যাগাযিন, শাহবাগে সমকামী প্যারেড, বইমেলায় সমকামিতা নিয়ে কবিতার বই প্রকাশ, গ্রামীণফোনের ফান্ডিংয়ে আরটিভিতে প্রচারিত নাটক, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও এনজিওগুলোর মাধ্যমে সমকামে উৎসাহিত করা, বিনামূল্যে কনডম-লুব্রিকেন্ট বিতরণ, যৌনশিক্ষার নামে শিশুদের সামনে অবাধ যৌনতা এবং বিকৃত যৌনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করা–এই সবকিছুকে দেখতে হবে একটি বৃহৎ গ্লোবাল এজেন্ডার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে।

যে বিষয়টা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো শত্রুপক্ষ জানে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা কম্পোনেন্টের যেকোনো একটা দিয়ে রাতারাতি জনমত বদলে ফেলা যাবে না। সেটা তাদের উদ্দেশ্যও না। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সামাজিক মূল্যবোধকে বদলে দেয়া। এটাই কালচারাল সাবভারশানের টাইম-টেস্টেড পদ্ধতি। হঠাৎ করে একটা বড় পরিবর্তন সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে সেটা ব্যাকফায়ার করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পরিবর্তনটা উপস্থাপন করা হয় তখন এক পর্যায়ে গিয়ে সমাজ তা মেনে নেয়। সহজ একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একটা সময় বাংলাদেশে বুকে ওড়না না দিয়ে গলায় ওড়না দেয়াটা খারাপ মনে করা হতো। সেই সময়টাতে জিন্স-টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের ব্যাপারে সমাজের অধিকাংশের ধারণা ছিল যে এরা উগ্র, অশ্লীল ইত্যাদি। কিন্তু পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে যারা একসময় জিন্স-টিশার্ট পরিহিতাদের উগ্র বলতেন তারাই এখন নিজেদের মেয়েদের জিন্স-টিশার্ট পরাচ্ছেন এবং ব্যাপারটা এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে 'নরমাল'। গলায় ওড়না ঝোলানো থেকে টি-শার্টে আসার ব্যাপারটা রাতারাতি করার চেষ্টা সমাজ মেনে নেয়নি। বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন পরিবর্তন হয়েছে তখন সেই একই সমাজ একে মেনে নিয়েছে খুশিমনে।

কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের প্রথম ধাপ এটাই। মানুষকে সমকামিতার ব্যাপারে ডিসেনসেটাইয করা।

> *'প্রথম কাজ হলো সমকামী এবং সমকামীদের অধিকারের ব্যাপারে অ্যামেরিকার জনগণের চিন্তাকে অবশ করে দেয়া, তাদের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দেয়া (desensitization)। মানুষের চিন্তাকে অবশ করে দেয়ার অর্থ হলো সমকামিতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উদাসীনতা তৈরি করা... একজন স্ট্রবেরি ফ্লেইভারের আইসক্রিম*

পছন্দ করে আরেকজন ভ্যানিলা ফ্লেইভারের। একজন বেইসবল দেখে আরেকজন ফুটবল। এ আর এমন কী!'[৭৮]

কার্ক-ম্যাডসেনের মতে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য এই একটিই। সমকামিতা যে একটি জঘন্য বিকৃতি, চরম সীমালঙ্ঘন ও ঘৃণ্য পাপাচার, তা সম্পর্কে মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়া। তাদের ভাষায়,

'সমকামিতা একটি ভালো জিনিস–একেবারেই শুরুতেই সাধারণ মানুষকে এটা বিশ্বাস করানো যাবে না, এমন আশা বাদ দাও। তবে তুমি যদি তাদের মনে করাতে পারো যে সমকামিতা হলো আরেকটা জিনিস কেবল (ভালো না, খারাপ না–জাস্ট আরেকটা ব্যাপার), তাহলে ধরে নাও আইনগত ও সামাজিক অধিকারের আদায়ের লড়াইয়ে তুমি জিতে গেছ।'[৭৯]

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা কাজ করছে তাদের রেটোরিক খেয়াল করলে দেখবেন তাদের অধিকাংশ ঠিক এই মেসেজটাই দিতে চাচ্ছে, 'সমকামিতা ভালো বা খারাপ না, জীবনের একটা বাস্তবতা মাত্র'। পহেলা বৈশাখের সময় শাহবাগে সমকামী প্যারেড কিংবা ঈদের নাটক হিসেবে সমকামীদের গল্প তুলে ধরার পেছনে একটি মূল উদ্দেশ্য হলো বিকৃতকামী চরম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা। একই সাথে সমকামিতাকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা, যেমনটা জাতিসংঘের Free & Equal ক্যাম্পেইনে করা হয়েছে।

কার্ক-ম্যাডসেনের আরেকটি পরামর্শ হলো সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা। সমকামীদের ভিকটিম হিসেবে চিত্রিত করার দুটি ডাইমেনশান থাকবে। প্রথমত, স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া সিদ্ধান্তের বদলে সমকামিতাকে প্রাকৃতিক বা জন্মগত হিসেবে উপস্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে সমকামীদের জন্মগতভাবেই ভিকটিম হিসেবে দেখানো। দ্বিতীয়ত, সমকামীদের বৃহত্তর সমাজ দ্বারা নির্যাতিত হিসেবে চিহ্নিত করা।

বাংলাদেশে এবং বিশ্বজুড়ে যারা সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের কাজ করে তাদের প্রপাগ্যান্ডা ও বক্তব্য সব সময় এ দুটো মোটিফ দেখতে পাবেন।

সমকামীরা জন্মগতভাবেই সমকামী এটা প্রমাণের উদ্দেশ্য কী?

---

[৭৮] Kirk & Madsen (1987), *The Overhauling of Straight America*
[৭৯] Ibid

যদি সমকামিতাকে জন্মগত বা প্রাকৃতিক প্রমাণ করা যায়, তাহলে সমকামীদের সম্পূর্ণ নৈতিক দায়মুক্তি সম্ভব। সমকামিতা যদি জন্মগত হয়, তাহলে সমকামিতা একটি 'অ্যাক্ট' বা ক্রিয়া হিসেবে নৈতিকভাবে নিউট্রাল, কারণ এর ওপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু সমকামী জন্মগত–এই দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নেই-ই, বরং বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল ইঙ্গিত করে যে Sexual Orientation নির্ভর করে ব্যক্তির 'চয়েস' বা স্বেচ্ছায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর।[৮০]

আরেকটি বিষয় হলো সমকামিতা যদি জন্মগত হয়, তাহলে অন্যান্য বিকৃত যৌনাচার কেন জন্মগত বলে গণ্য হবে না? শিশুকামী, বা পশুকামীদের কেন অপরাধী গণ্য করা হবে? ইন ফ্যাক্ট শিশুকামের সাথে সমকামের, বিশেষ করে পায়ুকামের, সম্পর্ক তো হাজার বছরের পুরোনো। প্রাচীন গ্রিসে শিশুদের সাথে মধ্য বয়স্ক পুরুষদের পায়ুকামী সম্পর্ক বা Pederasty প্রায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু ছিল। গ্রিক দার্শনিক প্লেইটো তার রিপাবলিক ও ল'স রচনাতে প্রাচীন পেডেরাস্টি এবং সমকামিতার ব্যাপক প্রচলনকে গ্রিসের অধঃপতনের একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। অ্যামেরিকাতেও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের যৌনসম্পর্ক স্থাপনের অধিকারের জন্য আন্দোলন করা NAMBLA (North American Man Boy Love Association) দীর্ঘদিন ছিল গে-প্রাইড প্যারেডের নিয়মিত অংশ। বিখ্যাত অ্যামেরিকান সমকামী কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ ('সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' এর রচয়িতা) ছিল NAMBLA এর সদস্য। এ ছাড়া অসংখ্য সমীক্ষার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত যে, সমকামিতার সাথে অন্যান্য যৌন-বিকৃতির বিশেষ করে শিশুকামিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।[৮১]

---

[৮০] Born Or Bred? Science Does Not Support the Claim That Homosexuality Is Genetic, Robert Knight

[৮১] ক) ১৯৭৯ তে পায়ুকামী গবেষক জে এবং ইয়াং এর 'The Gay Report' অনুযায়ী ৭৩% পায়ুকামী উত্তরদাতা বলেছে তারা কোনো না কোনো সময়ে ১৬-১৯ বছরের কমবয়সী ছেলেদের সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করেছে। Jay and A. Young, *The Gay Report* (*New York: Summit Books*, 1979), p. 275

খ) শিশু যৌন-নির্যাতনের ওপর চালানো একটি কানেইডিয়ান সমীক্ষা দেখা যায় অপরিচিত শিশুদের (non-familial victims) ওপর যৌন-নির্যাতন চালানো ৯১% শিশু নির্যাতনকারী বলেছে, তারা কখনো সম/পায়ুকামী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনোরকম যৌন-সম্পর্কে জড়ায়নি। অর্থাৎ তারা সমকামী।

W. L. Marshall, et al., *"Early onset and deviant sexuality in child molesters,"* Journal of interpersonal Violence 6 (1991): 323-336, cited in "Pedophilia: The Part of Homosexuality They Don't Want You to see," Colorado for Family Values Report, Vol. 14, March 1994.

গ) যদিও পুরুষ সমকামীরা অ্যামেরিকার মোট জনগোষ্ঠীর ২% এরও কম, কিন্তু শিশুদের ওপর

সমকামিতার বিশেষ করে পায়ুকামিতার সাথে শিশুকামের গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে সংক্ষেপে বোঝার জন্য পায়ুকামী ও শিশুকামী কেভিন বিশপের এই উক্তিটি যথেষ্ট,

> *'অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রত্যেক সমকামীর ভেতরে তুমি একটা শিশুকামীকে খুঁজে পাবে।'*[৮২]

সুতরাং সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যদি জন্মগত হতে পারে, তাহলে সমলিঙ্গের অল্পবয়সীদের প্রতি আকর্ষণ কেন জন্মগত হতে পারবে না? কেন ধর্ষণের তাড়না অনুভব করা ধর্ষকরা জন্মগত বিচ্যুতির কারণে ভিকটিম গণ্য হবে না? কেন পশুকাম কিংবা অজাচারের তাড়না জন্মগত বলে গণ্য হবে না? Sexual Orientation যদি জন্মগতই, তবে কেন তা কেবল সমকামীদের ক্ষেত্রে জন্মগত বলে বিবেচিত হবে?

কিন্তু সব যুক্তি, প্রমাণ এবং বিবেচনাবোধের বিরুদ্ধে গিয়ে সমকামিতাকে জন্মগত বলে যাচ্ছে এর প্রচারকরা। 'জন্মগত' এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কেন সমকামীদের আলাদাভাবে দেখা হবে, সম্মান আর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এ নিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আবেগঘন বক্তৃতা। এবং এ দুটি দিক থেকে সমকামীদের ভিকটিম প্রমাণ করার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করছে সাধারণ মানুষকে।

কার্ক-ম্যাডসেনের মতে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের একটি হলো মিডিয়া। বিশেষ করে ভিযুয়াল মিডিয়া :

চালানো যৌন-নির্যাতনের এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংঘটিত হয় তাদের দ্বারাই।
The Proportions of Heterosexual and Homosexual Pedophiles Among Sex Offenders Against Children: An Exploratory Study," Journal of Sex and Marital Therapy 18 (Spring 1992): 3443, cited in *"The Problem of Pedophilia,"* op. cit. Also, K. Freund and R.I. Watson, *"Pedophilia and Heterosexuality vs. Homosexuality,"* Journal of Sex and Marital Therapy 10 (Fall 1984): 197, cited in NARTH Fact Sheet.

ঘ) সমকামী ম্যাগাযিন 'Advocate' এর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন সেকশানের ওপর চালানো একটি কন্টেন্ট স্টাডিতে ড. জুডিথ রেইসমান এবং ড. চার্লস জনসন দেখতে পান, পায়ুকামী যৌন-সম্পর্কের জন্য সঙ্গীর খোঁজে দেয়া এসব বিজ্ঞাপনের বিশাল একটি অংশ হলো 'চিকেন'-দের (সমকামীদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত স্ল্যাং) বা অপ্রাপ্তবয়স্ক খোঁজে।
Judith A. Reisman, Ph.D., *"A Content Analysis of 'The Advocate,'"* unpublished manuscript p. 18, quoted in *"Pedophilia: The Part of Homosexuality They Don't Want You to See,"* Colorado for Family Values Report, Vol. 14, March 1994.

ঙ) *Child Molestation And The Homosexual Movement*, Steve Baldwin (2002)

[৮২] Kevin Bishop in an interview. Angella Johnson, "The man who loves to love boys," *Electronic Mail & Guardian*, June 30, 1997

'সোজা ভাষায়, ভিযুয়াল মিডিয়া–টিভি ও সিনেমা–হলো ভাবমূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। অ্যামেরিকানরা প্রতিদিন গড়ে ৭ ঘণ্টা টিভি দেখে। এই সাত ঘণ্টা সময় সাধারণ মানুষ তাদের চিন্তার জগতে ঢোকার এমন একটি দরজা আমাদের জন্য খুলে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে একটা ট্রোজান হর্স ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব... যত বেশি ও যত উচ্চৈঃস্বরে সম্ভব, সমকাম, সমকামিতা এবং সমকামীদের কথা বলুন। বারবার দেখতে দেখতে থাকলে প্রায় যেকোনো কাজই মানুষের কাছে একসময় 'স্বাভাবিক' মনে হওয়া শুরু করে... তবে মানুষের সামনে আগেই সমকামী (যৌন) আচরণ উপস্থাপন করা যাবে না–কারণ তা মানুষের কাছে জঘন্য মনে হবে এবং মানুষ সমকামিতার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাই সমকামীদের যৌনাচার সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যাবে না। আগে তাঁবুর মধ্যে উটের নাক ঢুকাতে দিন, তারপর আস্তে আস্তে বাকিটাও ঢুকানো যাবে।'[৮৩]

আর সত্যিই ধীরে ধীরে সমকামী মাফিয়া এই দরজার মধ্য দিয়ে ট্রোজান হর্স ঢুকিয়ে ফেলেছে। ৯০ এবং ২০০০ এর প্রথম দশক জুড়ে ধীরে ধীরে সাধারণ অ্যামেরিকানদের মধ্যে সমকামিতার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বিভিন্ন ডেইলি সোপ। এমনকি সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জৌ বাইডেন ২০১২ সালে সমকামিতা প্রচার করা টিভি সিরিয 'উইল অ্যান্ড গ্রেইস' এর নাম সরাসরি উল্লেখ করে বলে,

'একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে একজন নারী আরেকজন নারীকে বিয়ে করবে এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই... আমার মনে হয় না অ্যামেরিকান মানুষকে (সমকামিতা সম্পর্কে) শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে উইল অ্যান্ড গ্রেইসের মতো ভূমিকা আর কেউ বা আর কোনো কিছু রাখতে পেরেছে। যা অন্যরকম, যা আলাদা, মানুষ সেটাকে ভয় পায়। কিন্তু এখন মানুষ (সমকামিতার ব্যাপারে) বুঝতে শুরু করেছে।'[৮৪]

আর একইভাবে আজ বাংলাদেশেও চলছে সেই একই দরজার ভেতর দিয়ে সেই একই ট্রোজান হর্স ঢোকানোর কর্মতৎপরতা। কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট বাংলাদেশে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সমকামিতার প্রচারে মিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্ক-ম্যাডসেনের মত ছিল প্রাথমিকভাবে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করা এবং তারপর ধীরে ধীরে ভিযুয়াল মিডিয়ার দিকে আগানো। বাংলাদেশে সমকামিতা প্রচারের কাজ শুরু হয় ৯০ এর দশকের শেষের দিকে। প্রাথমিকভাবে

---

[৮৩] Kirk & Madsen (1987), *The Overhauling of Straight America*

[৮৪] Joe Biden on gay marriage: 'Will and Grace' helped educate America, *Entertainment Weekly*, May 06, 2012

সমকামিতা প্রচারকদের কাজ ছিল অনলাইন চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ, ফোরাম ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিপর্যায়ে পরিচিতি তৈরি করা, বিভিন্ন সময় একত্রে 'মিলিত' হওয়া, কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গনে সমকামিতার প্রচার করা এবং সমকামিতার পক্ষে জনমত তৈরি করা। পাবলিকলি তাদের বিকৃতি প্রচারের শুরুটা হয় প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে।

২০১০ সালে বইমেলায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে বের হয় কুখ্যাত মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অ্যামেরিকা প্রবাসী অভিজিৎ রায়ের বই 'সমকামিতা'[৮৫]। অভিজিৎ রায় এ বইয়ে বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ি ব্যাখ্যা দিয়ে এবং নানা লজিকাল ফ্যালাসি ব্যবহার করে চেষ্টা করে সমকামিতাকে স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হিসেবে প্রমাণ করার। তার অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাটিও ছিল মূলত বিভিন্ন পশ্চিমা লেখকের লেখার ছায়া অনুবাদ। ২০১০ সালে অগাস্টে আলতাফ শাহনেওয়াজ নামে একজনের লেখা অভিজিৎ রায়ের বইয়ের রিভিউ প্রকাশ করে প্রথম আলো, আর এর মাধ্যমে প্রায় সবার অলক্ষ্যে তাদের পাঠকবেইসের ঘরে ঘরে এই জঘন্য বিকৃতির সাফাই পৌঁছে দেয়।[৮৬]

বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামিতার প্রসারে পরবর্তী বড় পদক্ষেপটি আসে ২০১৪ সালে, রূপবান নামে একটি ম্যাগাযিনের মাধ্যমে। আর এই ম্যাগাযিনের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয় প্রিন্ট মিডিয়া (যেমন : ডেইলি স্টারে দেয়া বিজ্ঞাপন) এবং অনলাইনের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরও অনেক দেশি-বিদেশি রথীমহারথী। এ থেকে গ্লোবাল সমকামী মাফিয়ার প্রভাব এবং বাংলাদেশে এদের বিস্তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ম্যাগাযিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করা হয় ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসিসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যমে।[৮৭] ২০১৫ এর সেপ্টেম্বরে ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিলে আয়োজন করা হয় সমকামী সমাবেশ। প্রায় শ' দুয়েক সমকামীর এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে লঞ্চ করা হয় 'ধী' নামের সমকামী চরিত্রকে

---

[৮৫] সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, অভিজিৎ রায় (২০১০), শুদ্ধস্বর

[৮৬] অবগুণ্ঠন সরে গেল, আলতাফ শাহনেয়াজ, অগাস্ট ৬, ২০১০

[৮৭] Bangladesh Gets Its First LGBT Magazine, 'Roopbaan', *The Daily Star*, January 26, 2014

'রূপবানের যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া অতিথিদের মধ্যে ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গিভসন এবং ব্যারিস্টার সারা হোসেনও ছিলেন। অনুষ্ঠানে নারী উপস্থিতি কম ছিল। আর সেটি সারা হোসেনসহ বেশ কয়েকজন অতিথির নজরে আসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে কম নারীর উপস্থিতিকে

নিয়ে তৈরি করা কমিক স্ট্রিপ।[৮৮]

কার্ক-ম্যাডসেনের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারের পর এবার বাংলাদেশে সমকামিতার প্রচারকরা মনোযোগ দেয়া শুরু করে ভিয়ুয়াল মিডিয়ার দিকে। বছর দুয়েক আগে আরটিভিতে 'ঈদের নাটক' হিসেবে প্রচার করা হয় সমকামিতা প্রপাগ্যান্ডা। এটা নতুন কিছু না, বরং প্রায় দুই দশক পুরোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নতুন একটা পর্যায়ের শুরু কেবল। গ্রামীণফোন প্রযোজিত এই নাটকে হুবহু কার্ক-ম্যাডসেনের শিখিয়ে দেয়া 'যুক্তি'গুলোই তুলে ধরা হয়, এবং নাটকের ডায়ালগের মাধ্যমে সমকামিতাকে প্রচার করা হয় জন্মগত, স্বাভাবিক, নৈতিকভাবে নিউট্রাল একটি কাজ হিসেবে। নাটকে দেখানো হয়েছে সমকামী চরিত্রের পক্ষ নিয়ে একটি চরিত্র আরেকটি চরিত্রকে বলছে :

> 'ও সমকামী (not straight), এটা কি ওর দোষ? সে কি এটাকে বেছে নিয়েছে? না। ওয়ার্ল্ডে নানা ধরনের মানুষ থাকে, তাহলে ও কেন থাকতে পারবে না?
>
> ও কি অস্বাভাবিক?
>
> না।
>
> ও কি একজন অপরাধী?
>
> না।
>
> ও তোমার আমার মতোই নরমাল মানুষ।'[৮৯]

যদি বাংলাদেশে কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট নির্বিঘ্নে অনুসৃত হতে থাকে, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এ রকম আরও অনেক বই, নাটক, শর্টফিল্ম, স্কিট এবং জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেখতে পাব। এক সময় পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতাগুলোতে ছাপা হবে সমকামিতার পক্ষে প্রবন্ধ। সমকামিতা নিয়ে বানানো নাটক ও সিনেমাকে জাতীয় পুরস্কার, মেরিল প্রথম-আলো পুরস্কারসহ দেয়া হবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার। পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমকামী অধিকার সম্পর্কে

ইঙ্গিত করে সারা হোসেন বলেছিলেন, যৌনতা ও যৌন পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিকভাবেই নারীরা কম উপস্থিত থাকেন।'

দেশের একমাত্র গে ম্যাগাজিন 'রূপবান' কাহিনী, বাংলা ট্রিবিউন, এপ্রিল ২৬, ২০১৬

[৮৮] বাংলাদেশে সমকামী নারীদের নিয়ে কমিক স্ট্রিপ, ডয়েচ ভেল, সেপ্টেম্বর ৭, ২০১৫

[৮৯] রেইনবো, আরটিভি, নির্মাতা : আশফাক নিপুণ, প্রযোজনা : গ্রামীণফোন, ২০১৭

আয়োজন করা হবে প্রকাশ্যে নানা ওয়ার্কশপের[৯০], পাবলিক স্কুলের কারিকুলামে যৌনশিক্ষার ক্লাসে যুক্ত করা হবে সমকামিতা ও সমকামী অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে দেশি ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে সমকামী কোনো তরুণ বা তরুণীকে উপস্থাপন করা হবে ইয়ুথ আইকন হিসেবে। আর এভাবে ধীরে ধীরে সমকামিতাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পর একসময় আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হবে। অথবা আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই এক সময় সমকামিতা সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রচলিত হতে যাবে, যেমনটা বর্তমানে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে হয়েছে।

যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যতের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের। তাই এ ব্যাপারটা বোঝা জরুরি যে, এ কোনো সাময়িক দ্বন্দ্ব না। কোনো একটা নাটক, বই বা ম্যাগাযিনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ সমকামিতাকে রাতারাতি গ্রহণযোগ্যতা দিতে চাচ্ছে না। এই নাটক, বই বা ম্যাগাযিনগুলো এভাবে বানানোও হচ্ছে না। তারা চাচ্ছে এ ব্যাপারে মানুষের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দিতে, ক্রমাগত মানুষের সামনে সমকামিতা, ও সমকামিতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে, সমকামিতাকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণ করতে। তারা জনমতকে পরিবর্তন করতে চাইছে, বদলে দিতে চাইছে সামাজিক মূল্যবোধ।

সমকামিতার অবাধ প্রচলন এক দিনে হয় না। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমে সমকামিতাকে একটি যৌনবিকৃতি মনে করা হতো। পঞ্চাশের দশকে একে মনে করা হতো মানসিক অসুস্থতা। ৭০ এর দশকে এসে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে সমকামিতা বিকৃতিও না, অসুস্থতাও না; স্বাভাবিক মানবিক আচরণ। কিন্তু তখনো সমাজে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হয় মিডিয়া ও সেলিব্রিটিদের মাধ্যমে সমকামিতাকে স্বাভাবিক, সুন্দর, এমনকি গ্ল্যামারাস একটি লাইফস্টাইল হিসেবে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া। একইসাথে চলে বিভিন্ন সিনেমা ও টিভি সিরিয়েল মাধ্যমে এ জঘন্য যৌনবিকৃতি নিয়ে হাইপার ইমোশনাল প্রপাগ্যান্ডা। হলিউডের সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকের বড় বড় সব নায়কদের প্রায় সবাই সমকামী চরিত্রে অভিনয় করেছে। এ লম্বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুই অ্যামেরিকাই না, বরং বিশ্বজুড়ে সমকামিতার

[৯০] বাংলাদেশি সমকামীদের গোপন সংগঠন 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের ভাষ্যমতে এরই মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং গোয়েথ ইন্সটিটিউটসহ বেশ কিছু জায়গায় এমন বেশ কিছু ওয়ার্কশপ হয়েছে। দেখুন, https://bit.ly/2IwjniB

পক্ষে তৈরি করা হয়েছে জনমত ও সহানুভূতি। এতকিছুর পর ওবামার সময়ে এসে আইনি বৈধতা দেয়া হয়েছে সমকামী 'বিয়ে'-কে।

যৌনবিকৃতি থেকে সমকামী বিয়েকে আইনি বৈধতা দেয়া পর্যন্ত আসতে অ্যামেরিকার লেগেছে ছয় দশক। ভারতের কিন্তু এত সময় লাগছে না। কারণ, এরই মধ্যে সমকামিতাকে বিশ্বব্যাপী বৈধতা দেয়ার কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আমলে, ১৮৬০ সালে, সেকশন ৩৭৭ নামে একটি আইন করা হয়েছিল যেটার মূল বক্তব্য ছিল নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনমিলন ছাড়া বাকি সব ধরনের যৌনতা অপ্রাকৃতিক ও বেআইনি। শাব্দিকভাবে এ আইনের আওতা বেশ ব্যাপক হলেও মূলত এটি ছিল সমকামিতার ব্যাপারে। ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় হাই কোর্টের রায়ে সেকশন ৩৭৭-কে বাতিল করা হয় এবং এর মাধ্যমে দেয়া হয় সমকামিতার আইনি বৈধতা[৯১]। এর পরের ধাপ হলো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকেও সেকশন ৩৭৭ বাতিল করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। অনেকে মনে করেন বাংলাদেশে এটা এমন একসময় হবে যখন অধিকাংশ মানুষ একে সমর্থন দেবে। এটা ভুল ধারণা। ভারতের অধিকাংশ মানুষ সমকামিতাকে সমর্থন না করা সত্ত্বেও ভারতে একে আইনি বৈধতা দেয়া হয়েছে, কারণ গণতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষের চেয়ে সমকামী লবি, মিডিয়া, বিদেশি এনজিও এগুলোর ক্ষমতা সব সময় বেশি। গণতন্ত্র দিন শেষে অলিগার্কি, অভিজাততন্ত্র। অভিজাতদের অধিকাংশের সমর্থন আর মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা পেলেই বাংলাদেশেও দেখবেন সমকামিতার বৈধতা দেয়া হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রসার ও এর স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া এরই মধ্যে এগিয়েছে অনেক দূর। ইউএস এইড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতে বাংলাদেশে সমকামীর সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ১০,০০০। যদিও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া তথ্যে অতিরঞ্জন থাকা অস্বাভাবিক না, কারণ সমকামীদের সংখ্যা যত বেশি দেখানো যাবে তত শক্তিশালী হবে 'অধিকার আদায়ের আন্দোলন'। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্টে উঠে এসেছে এই সমকামীরা বিভিন্ন ফেইসবুক ও ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে একে অপরের সাথে 'হুকআপ' করছে। চলছে এদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, গেটটুগেদার।[৯২] কিছুদিন আগে কেরানীগঞ্জের এক কমিউনিটি সেন্টারে এমনই এক গেটটুগেদার চলার সময় কনডম, লুব্রিকেটিং জেল, মদ আর ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে ২৭ জনকে।

---

[৯১] সমকামিতা ভারতে আর অপরাধ নয়: সুপ্রিম কোর্ট, বিবিসি বাংলা, সেপ্টেম্বর ৬, ২০১৮
[৯২] ঢাকায় সমকামী ক্লাব, মানবজমিন, মার্চ ২, ২০১৮

এদের বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে, বেশির ভাগই ছাত্র।[৯৩] এলাকাবাসীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি দেড় থেকে দুই মাস পরপর বৃহস্পতিবারে তারা কমিউনিটি সেন্টারে জড়ো হতো উদ্যম সমকামিতায় লিপ্ত হবার জন্য।

বাংলাদেশের মিডিয়া সেলিব্রিটি ও প্রগতিশীলদের মধ্যেও বাড়ছে সমকামিতাকে মানবাধিকার বলে প্রচার করার প্রবণতা। সোশ্যাল মিডিয়া ও বিশেষ করে ইউটিউব সেলিব্রিটিদের অনেকেই একে 'স্বাভাবিক' বলে প্রমোট করছে। ইউটিউবে প্রকাশ করা হচ্ছে সমকামিতার পক্ষে বিভিন্ন ভিডিও এবং নাটক। উচ্ছৃঙ্খল লাইফস্টাইল, নৈতিকতার অবক্ষয় এবং উত্তেজক ড্রাগ ইয়াবার ব্যবহারের কারণে মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে বাড়ছে সমকামিতা। এ নিয়ে মুখ খুলেছেন মিডিয়ার অনেকে। সেলিব্রিটি স্বামীর সমকামিতা আসক্তি নিয়ে মিডিয়াতে কান্নাকাটিও করেছে সেলিব্রিটি স্ত্রীরা। শহরগুলোর পাশাপাশি দেশি-বিদেশি অনেক এনজিও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমকামিতা প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। এদের বিভিন্ন সেন্টারে দেয়া হচ্ছে ফ্রি কনডম, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি। এসব এনজিওর জন্য ফান্ডিং আসছে বিদেশ থেকে।

এই প্রপাগ্যান্ডার প্রভাবে ১৩ থেকে ২৫ বছর বয়সী শহুরে গ্লোবালাইযড অথবা বলিউড প্রভাবিত কিশোর-তরুণদের মধ্যে 'সমকামিতা কোনো পাপ না, কোনো অপরাধ না' এ ধরনের মনোভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সমকামিতায় কোনো সমস্যা দেখে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এর কাছে এ ব্যাপারটি কত ঘৃণিত সেটা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। তাদের বিরোধিতা থেকে থাকলে সেটা বড়জোর 'আমার ঘিন্না লাগে' বা 'এটা আমার জন্য না' জাতীয় চিন্তা পর্যন্তই।

আমাদের চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে সমাজের মূল্যবোধ, নৈতিকতার কাঠামো।

প্রতিপক্ষের আছে প্রায় অফুরন্ত ফান্ডিং, মিডিয়া এবং আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক সমর্থন। যদি আসলেই এই বিশাল মেশিনারীকে থামাতে হয়, যদি এই এজেন্ডার বাস্তবায়নকে বন্ধ করতে হয়, তাহলে এই নীলনকশা ও এর পেছনের কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে; গড়ে তুলতে হবে সচেতনতা ও জনমত। আর যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদেরও গ্রাস করবে পশ্চিমা সমাজকে লন্ডভন্ড করে দেয়া বিকৃতি ও অবক্ষয়। আমাদের ঘর থেকে ঘরে লাগবে অশ্লীল সভ্যতার মড়ক। ধ্বংসের সেই স্রোতে হারিয়ে যাব আমরা আর আমাদের সন্তান-সন্ততিরা।

---

[৯৩] ঢাকার কেরানীগঞ্জে ২৭ জন 'সমকামী' আটক করেছে র‌্যাব, মে ১৯, ২০১৭

মরীচিকা

১.

পৃথিবীতে দুটো ধর্মের অনুসারীরা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে মসীহ বা মেসায়াহ হিসেবে মানে। ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম। দুটো ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে শেষ যুগে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ফিরে আসবেন। তাঁর জীবন, কর্ম ও পরিবারের অনেক খুঁটিনাটির ব্যাপার নিয়ে এ দুই ধর্মের অনুসারীরা একমত, কিংবা তাদের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। বর্তমানে পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান এ দুই ধর্মের মানুষের। কিন্তু এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও যখন কোনো খ্রিষ্টান আপনাকে প্রশ্ন করবে,

'Do you accept Jesus?'

'তুমি কি মসীহকে স্বীকার করো?'

একজন মুসলিম হিসেবে আপনি 'হ্যাঁ' বলতে পারবেন না। কারণ, একজন খ্রিষ্টানের আকিদার জায়গা থেকে যিশুকে স্বীকার করা ও মেনে নেয়া বলতে বোঝায় তাঁকে তিনের (ট্রিনিটির) এক ও 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে মেনে নেয়া, এ কথা স্বীকার করে নেয়া যে যিশুকে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তির পরকালের ফয়সালা হবে ইত্যাদি।

স্বাভাবিকভাবেই একজন মুসলিম কখনোই এ ধরনের স্পষ্ট কুফর এবং শিরক স্বীকার করবে না, করতে পারবেও না। বিশ্বাসের যে কাঠামো থেকে খ্রিষ্টানরা তাঁকে মানছে তাঁর ভিত্তি হলো কুফর এবং শিরক। অন্যদিকে যে কাঠামো থেকে মুসলিমরা তাঁকে নবী এবং মসীহ হিসেবে মানছে তাঁর ভিত্তি হলো ঈমান ও তাওহিদ। ঈসা ইবনু

মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অনেক কিছুতে মুসলিম এবং খ্রিষ্টানরা একমত হবার পরও এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কারণে ব্যক্তি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা একে অপরের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। মুসলিমদের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টানরা কাফির এবং শিরকে লিপ্ত, অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিমরা যিসাসকে অস্বীকারকারী, অবিশ্বাসী। এত মিল থাকার পরও দুটো বিশ্বাস পরস্পর সাংঘর্ষিক হচ্ছে বিশ্বাসের কাঠামো এবং প্রাথমিক মূলনীতিতে পার্থক্যের কারণে।

বিশ্বাসের কাঠামো এবং প্রাথমিক মূলনীতিগত পার্থক্যের এ গুরুত্বের ব্যাপারটা আমাদের কাজে লাগবে পরের আলোচনায়।

২.

ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, নারী অধিকার, সাম্য, সম্প্রীতি, প্রগতি, উন্নতিসহ বেশ কিছু ধারণা আছে যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন। জাতিসংঘ যখন সমকামিতাকে বৈধতা দেয়ার পক্ষে পলিসি বানায়[৯৪], কিংবা মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে শাইখ আহমাদ শফির বক্তব্যকে যখন উন্নয়নবিরোধী বা পশ্চাৎপদ বলা হয় তখন সেটা করা হয় এ ধারণাগুলোর ওপর গড়ে ওঠা চিন্তার কাঠামোর জায়গা থেকে। এ ধারণাগুলো স্বীকার না করাকে আখ্যায়িত করা হয় বর্বরতা, অসভ্যতা, অজ্ঞানতা কিংবা পশ্চাৎপদতা হিসেবে, এবং বারবার এগুলো ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলিমদের সমালোচনা করা হয়। আবার তীব্র এ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ার মুসলিমদের মধ্যে অনেকে বলেন যে এ ধারণাগুলো ইসলামেও আছে, তবে ইসলাম এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধান যোগ করে।

কিন্তু ইসলামের অবস্থান থেকে এ ধারণাগুলো এবং এগুলোর উপসংহার হিসেবে পাওয়া পলিসিগুলোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের বুঝতে হবে, এ শব্দ ও পরিভাষাগুলো আসলে কোন অর্থ ও মতাদর্শ ধারণ করে। বাহ্যিক সাদৃশ্যের হিসেব কষতে বসার আগে, পরিভাষার শাব্দিক অগভীরতার জায়গা থেকে সরে এসে তাকাতে হবে এ ধারণাগুলোর পেছনের ফার্স্ট প্রিন্সিপালস বা প্রাথমিক মূলনীতিগুলোর দিকে।

---

[৯৪] "Universal decriminalization of homosexuality a human rights imperative – Ban Ki-moon, *UN News*, 10 December, 2010.

তবে সবার আগে আমাদের একটা প্রশ্ন করা শিখতে হবে :

পাশ্চাত্য যখন মানবাধিকার, নারী অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা কিংবা এ রকম অন্য কোনো 'অধিকার'-এর কথা বলে তখন 'অধিকার' বলতে তারা কী বোঝায়?

এ ধারণাগুলোকে তারা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে?

আমরা যদি এ প্রশ্নটা করতে পারি এবং আন্তরিকতা, সততা ও অধ্যবসায়ের সাথে এর উত্তর খুঁজি, তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন মুসলিম হিসেবে আমরা এই ধারণাগুলো প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। এ প্রতিটি পরিভাষা, প্রতিটি ধারণার শাব্দিক যে অর্থ আমরা ধরে নিই তার বাইরেও এগুলোর আছে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শিক অর্থ। এবং এ শব্দগুলো ব্যবহার করার সময় সেক্যুলার পশ্চিম এ সুনির্দিষ্ট মতাদর্শিক অর্থেই ব্যবহার করে; শাব্দিক অর্থে না। এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় চিন্তা ও বিশ্বাসের একটা নির্দিষ্ট কাঠামো থেকে। ঠিক যেমন, আমরা মুসলিমরা যখন 'সালাত' বলি তখন সাধারণত আমরা শাব্দিক অর্থ বোঝাই না।[৯৫] শরীয়াহর কাঠামোর ভেতরে সালাতের যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, সেটাকে বোঝাই।

পশ্চিমের এ ধারণাগুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এ শব্দ ও কনসেপ্টগুলোকে তারা ব্যবহার করে এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামোর ভেতর সুনির্দিষ্ট অর্থে। একটি লিবারেল দার্শনিক কাঠামোর ভেতর থেকে এ শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ দেয়া যাক।

আমরা যেগুলোকে 'সোশ্যাল সায়েন্সেস' বা সামাজিক বিজ্ঞান বলি সেগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু কী? 'মোটাদাগে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র'–আপাতভাবে বলে দেয়া যায়। কিন্তু যদি সত্যিকারভাবে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেন, বাইরের খোলস সরিয়ে শেকড়ের দিকে তাকান–তাহলে দেখবেন সামাজিক এ বিজ্ঞানগুলো ব্যক্তির একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তির এ সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে তারা 'অধিকারের' সংজ্ঞা দেয়–সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আলোচনায় যায়।

এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামোর ফসল হিসেবে বেরিয়ে আসা এ সংজ্ঞায় বলা হয় এক নির্দিষ্ট চিন্তার, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, বিশেষ ধরনের মানুষের কথা। এমন কেউ যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে। যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধরে নেয়, স্ব-প্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে (freedom as self-evident value)।

[৯৫] সালাত : শাব্দিকভাবে এর অর্থ দু'আ করা, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এনলাইটেনমেন্টের প্রধান দার্শনিকদের একজন, ইম্যানুয়েল কান্টের মতে, ব্যক্তি অন্য কারও ঠিক করে দেয়া ভালোমন্দের মাপকাঠি মেনে নিতে বাধ্য না। ব্যক্তি বাধ্য না কোনো উচ্চতর শক্তির ঠিক করে দেয়া নৈতিকতা মেনে চলতে। নিজের ইচ্ছেমতো ভালোমন্দ নির্ধারণের এ ক্ষমতাই ব্যক্তির এনলাইটেনমেন্টের (আলোকিত হওয়া, জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া) বৈশিষ্ট্য।[৯৬] জীবনে কী করা উচিত, কী করা উচিত না–এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিক করবে ব্যক্তি নিজে, এটা তার একচ্ছত্র অধিকার। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অধিকার আছে বলে স্বাধীন ব্যক্তি স্বীকার করে না। নিজ কল্যাণের প্রশ্নে শ্রেষ্ঠ বিচারক ব্যক্তি নিজেই। এ অর্থেই ব্যক্তি স্বাধীন, স্বশাসিত (autonomous)।[৯৭]

এ দর্শন অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্বার্থ অর্জিত হয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিস্বাধীনতার মাধ্যমে। আমার স্বার্থ নির্ভর করে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু করার সক্ষমতা ও স্বাধীনতার ওপর। কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 'কী বেছে নেয়া হচ্ছে' তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো 'যেকোনো কিছু বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা' থাকা। ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার এ সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তারিত আলোচনা এনেছেন অমর্ত্য সেন।[৯৮]

সহজ ভাষায়–আমরা সবাই রাজা। আমরা নিজেরাই ঠিক করি ভালোমন্দ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ। কোন সমাজ বা স্রষ্টার ঠিক করা নিয়ম মানতে আমরা বাধ্য না। এই স্ব-নির্ভর স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতাই স্বাধীনতা, আলোকিত হওয়া। যিনা করা হয়তো কারো জন্য খারাপ হতে পারে, তবে তার অধিকার আছে এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার।

যত সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধারণা ও প্রতিষ্ঠান আধুনিক পাশ্চাত্য থেকে এসেছে, তার সবগুলো সেগুলো গড়ে উঠেছে ব্যক্তির এই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং এর অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে।

এগুলোর উদ্দেশ্য?

এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা Human Being এর জন্য উপযুক্ত বাজার, সমাজ, কাঠামো ও সরকার গড়ে তোলা। যেমন : অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিকভাবে ব্যক্তির

[৯৬] *Answering the Question: What is Enlightenment?* Kant (1784)
[৯৭] Kant (১৯৬৪)। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বশাসনের তুলনামূলক সহজ বর্ণনার জন্য দেখুন : Ethical Theory and Moral Problems, Curzer (১৯৯৯)
[৯৮] *Rationality & Freedom*, Sen (2000); *Development As Freedom*, Sen (1999)

উন্নতির ক্ষেত্র ও সুযোগগুলোকে সহজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, কাঠামো, সমাজ ও নেতৃত্ব প্রস্তুত করা।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কল্যাণের ব্যাপারে নিজেই সবচেয়ে ভালো জানে এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধিই যদি সামাজিক কল্যাণের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হয়, তাহলে কোনো রাষ্ট্র, মাওলানা, চার্চ, কারও অধিকার নেই ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনে বাধা দেয়ার। নিজ স্বার্থ অর্জনই প্রত্যেকে কাজের বৈধতার মানদণ্ড।

অ্যামেরিকান নিও ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ জন বেইটস ক্লার্কের ভাষায়,

> *'একজন ব্যক্তির লোভকে অপরের লোভের ওপর যথাযথ প্রতিরোধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং সার্বজনীন লোভ (universal greed) সকলের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ কল্যাণ অর্জন করতে পারে। প্রথমে আপনার হাত সরিয়ে নিন, তারপর রাষ্ট্র, গির্জা ইত্যাদিরও এবং স্বার্থপরতাকে তার নিখুঁত কাজ করতে দিন।'*[৯৯]

এক শ দশ বছর পর হিট হলিউড মুভি 'ওয়ালস্ট্রিট' এর চরিত্র গর্ডন গেকোর 'Greed is good' উচ্চারণে ক্লার্কের এ কথার প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পুঁজিবাদী বিনোদন ও অবক্ষয়ের কেন্দ্র থেকে শিল্পের মোড়কে ফুটে উঠেছে আধুনিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত এ বাস্তবতা।[১০০]

উপযোগবাদ (utilitarianism) এর আধুনিক দর্শনের জনক জেরেমি বেন্থামের ভাষায়,

> *'প্রকৃতি মানবজাতিকে ২টি সার্বভৌম মালিকের অধীন করেছে, কষ্ট ও আনন্দ। আমাদের কী করা উচিত এবং আমরা কী করব এটা নির্ধারণের কাজ কেবল এ দুজনেরই।'*[১০১]

এ ধরনের চিন্তার ওপর ভর দিয়েই আধুনিক পশ্চিমা সমাজ ভালোমন্দ ঠিক করে হার্ম প্রিন্সিপালের (Harm Principle) মাপকাঠিতে। যদি কোনো কাজ অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে সেটা খারাপ; অন্যথায় সেটা বৈধ। আবার ক্ষতির সংজ্ঞাও ঠিক করা

---

[৯৯] Clark, 1877

[১০০] *"The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. And greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much."*, *Wall Street* (1987)

[১০১] Bentham, 1789

হবে লিবারেল-সেক্যুলার কাঠামোর সাপেক্ষে। আপেক্ষিক নৈতিকতা আর অদ্ভ কথা মূল্যবোধের এ জগতে ধীরে ধীরে তাই বৈধ হয়ে যায় যিনা, অবাধ গর্ভপাত থেকে শুরু করে পর্নোগ্রাফি, সমকামিতা, শিশুকামিতা, পশুকামিতা, ধর্ষকাম, মর্ষকাম, মাদক ব্যবহার সবই।

ইসলামের অবস্থানের সাথে তুলনা করলে এটা বোঝা একেবারেই সোজা যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদির ব্যাপারে এই ধারণাগুলো সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইন ফ্যাক্ট স্বাধীনতা ও স্বশাসিত হবার যে সংজ্ঞা আমরা এনলাইটেনমেন্টের ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে পাচ্ছি সেটা স্পষ্ট শিরক। কারণ আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আপন খেয়ালখুশিকে, আপন প্রবৃত্তিকে, আল্লাহর বদলে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহর আদেশনিষেধের বদলে প্রবৃত্তির দাস আপন কামনাবাসনাকে গ্রহণ করে তার মাপকাঠি হিসেবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

> *'তুমি কি তাকে দেখোনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল ফুরক্বান, ৪৩-৪৪)*

মুসলিম হিসেবে আমরা যখন শরীয়াহ দ্বারা নির্ধারিত অধিকারগুলোর কথা বলি তখন দুটো মূলনীতি আমাদের পুরো আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১) মানুষের প্রথম পরিচয় হলো সে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর গোলাম। সে স্বাধীন না।

২) মানবজীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রতি শর্তহীন ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

কিন্তু সেক্যুলার-লিবারেল পশ্চিমের ফ্রেইমওয়ার্ক এ দুটো মূলনীতিকেই অস্বীকার করে। পশ্চিমা ফ্রেইমওয়ার্ক অনুযায়ী মানুষ স্বনির্ভর, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন সত্তা, যার কোনো স্রষ্টা কিংবা রব্বের প্রয়োজন নেই। সে উচ্চতর কোনো কর্তৃত্ব কিংবা কর্তৃপক্ষকে মানে না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিম হিসেবে আমরা অধিকারকে বুঝি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আলোকে, আল্লাহর গোলাম হিসেবে। পশ্চিমা চিন্তার কাঠামো মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করে।

পশ্চিমা চিন্তা অধিকারকে দেখে 'লা ইলাহা ইল্লান্নাস' ('মানুষ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', 'সবার ওপর মানুষ সত্য') এর আলোকে।

অর্থাৎ ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার কাঠামো, বিশ্বাস ও অবস্থানের মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। এটা আকিদাহ, বিশ্বাসের পার্থক্য। এটা একটা এপিস্টেমলোজিকাল বা জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্য। এ দুই কাঠামোর ভিত্তি, কেন্দ্র, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা। শুধু আলাদা না, বরং সাংঘর্ষিক। ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এ ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে যে ধারণাগুলো বের হয়ে আসে সেগুলোও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা 'মানবাধিকার', 'নারী অধিকার', 'ব্যক্তি অধিকার', 'মুক্তচিন্তা' যাই হোক না কেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমা এ ধারণাগুলোর কিছু কিছু দিকের সাথে ইসলামের অনেক ধারণার বাহ্যিক এবং শাখাগত অল্প কিছু মিল থাকলেও সার্বিকভাবে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে নারীর জন্য নির্ধারিত অধিকার আর পশ্চিমা ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে বের হয়ে আসা 'নারী অধিকার' এর মধ্যে পার্থক্য আকাশ আর পাতালের।

মুসলিম হিসেবে আমরা এই ধারণাগুলো, এগুলোর অন্তর্নিহিত মতাদর্শ এবং প্রাথমিক মূলনীতিগুলোকে অস্বীকার করি। ঠিক যেমন আমরা ওই যিশুকে অস্বীকার করি যে তিনের এক, যে 'ঈশ্বরের পুত্র', যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হবার পর আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে (slain & resurrected)।

কিন্তু এ প্রত্যাখ্যানের অর্থ এই না যে আমরা সাইয়্যিদিনা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে অস্বীকার করি, যিনি জন্ম নিয়েছিলেন কুমারী মারইয়ামের গর্ভে। যিনি আল্লাহর নবী, যার ওপর নাযিল হয়েছিল ইনযিল।[১০২] যিনি সুসংবাদ দিয়েছিলেন উম্মী নবীর আগমনের, যাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইহুদীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন,[১০৩] যিনি কিয়ামতের আগে অবতরণ করবেন দামাসকাসের শ্বেতমিনারের কাছে,[১০৪] হত্যা করবেন আল-মসীহ আদ-দাজ্জালকে, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, জিযিয়া রহিত করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন স্বীকার করবেন না[১০৫]—তাঁর ওপর শান্তি, যেদিন তিনি জন্মেছেন এবং যেদিন তিনি মারা যাবেন আর যেদিন তাঁকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।[১০৬]

---

[১০২] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৪৫-৪৭
[১০৩] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৫৫
[১০৪] মুসলিম, আসসাহিহ : ৭৫৬০; আহমাদ, আলমুসনাদ : ১৭৬৬৬
[১০৫] বুখারি, আসসাহিহ : ৩২৬৪; মুসলিম, আসসাহিহ : ৪০৬
[১০৬] The Muslims' Beliefs Concerning the Messiah 'Eesa ibn Maryam, IslamQA, question #43148

একইভাবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নাযিল করেছেন তার কোনো কিছুই অস্বীকার করি না; যেখানে যতটুকু তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমরা ততটুকুই স্বীকার করি। ইসলামের ধারণাগুলোকে ব্যাখ্যা অথবা বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমের ফ্রেইমওয়ার্ককে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বিশ্বাস এবং করণীয় কী, তা বোঝার জন্য আমাদের অন্য কারও কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই পশ্চিমা সভ্যতার কাছে উপাদেয় হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপনের জন্য ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যার। একবার ইসলামের পরিভাষা দিয়ে পশ্চিমা দর্শনকে ইসলামীকরণ, আরেকবার পশ্চিমা পরিভাষা দিয়ে ইসলামী কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে, নানা রকম শিশুসুলভ ক্যাটাগরি এরর[১০৭]-এর খিচুড়ি বানিয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তালগোল পাকানোর কোনো প্রয়োজনও নেই।

কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই ধারণাগুলো এবং সেগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান কিংবা পদ্ধতির ইসলামীকরণ সম্ভব না। সেটা ব্যাংক, গণতন্ত্র, কল্যাণরাষ্ট্র কিংবা অন্য কিছু হোক। পশ্চিমা ধারণাগুলোর ওপর নিছক কিছু শারঈ বিধিনিষেধ আর আরবী শব্দ চাপিয়ে দিয়ে সেগুলোী 'ইসলামীকরণ ' করা সম্ভব না, যতই শাখাগত সাদৃশ্য থাকুক না কেন। ইসলামের সাথে এগুলোর পার্থক্য ও সংঘর্ষ মৌলিক। যারা আসলেই বিশ্বাস করেন যে এগুলোর ইসলামীকরণ সম্ভব তারা হয় পশ্চিমা এ ধারণাগুলোকে ঠিকমতো বোঝেননি অথবা ইসলামকে ঠিকমতো বোঝেননি। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এ অবস্থান প্রত্যাখ্যাত। আর যারা পশ্চিমের ইসলামীকরণকে সাময়িক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করছেন তারা কেবল নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছেন। পশ্চিমকে পশ্চিমের খেলায় হারানো যাবে না। সাময়িকভাবে 'উপকারী নির্বোধ'[১০৮] হিসেবে ব্যবহৃত হলেও একসময় তারা পশ্চিমের কাছেও প্রত্যাখ্যাত হবেন।

---

[১০৭] একটা লজিকাল ফ্যালাসি। যখন এক ক্যাটাগরির জিনিসকে অন্য কাট্যাগরির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথবা এক ক্যাটাগরির বৈশিষ্ট্যকে অন্য ক্যাটাগরির মনে করা হয়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির সদস্যকে একই ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। বিস্তারিত : On the Category Error, Denedict Beckeld লিঙ্ক - https://bit.ly/2DbPrV7

[১০৮] Useful idiot (Wikipedia) - https://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot

বালির বাঁধ

১.

কোন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আমরা ভালো বা খারাপ ঠিক করব? আমরা কি মানদণ্ড হিসেবে নেব প্রচলন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতির ঐতিহ্য অথবা সংস্কৃতিকে? নাকি একটি সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড থাকতে হবে?

২০১৬ সালের অ্যামেরিকান নির্বাচনী প্রচারণা ও প্রপাগ্যান্ডার বড় একটা অংশ হয়েছিল অনলাইনে। মূলধারার মিডিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও ট্রাম্প সমর্থকরা এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল এই ইন্টারনেট প্রচারণার কল্যাণে। প্রচারণার অংশ হিসেবে ট্রাম্প সমর্থকরা বানিয়েছিল হিলারি-বিরোধী অনেক ভিডিও। এমনই একটা ভিডিওতে তুলে ধরা হয়েছে সময়ের সাথে সাথে সমকামী বিয়ের ব্যাপারে হিলারির বদলাতে থাকা অবস্থান।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ এ হিলারি বলেছিল, 'আমি বিশ্বাস করি বিয়ে হলো (কেবল) নারী ও পুরুষের মধ্যে পবিত্র বন্ধন'।

৬ বছর পর ২০১০ এ, 'আমি সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে বিয়েকে সমর্থন করিনি, তবে (তাদের মধ্যে) সিভিল পার্টনারশিপ ও কন্ট্র্যাকচুয়াল রিলেশানশিপ সমর্থন করি।'

২০১৩ তে, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং পলিসি হিসেবে গে এবং লেসবিয়ানদের বিয়ে সমর্থন করি।'

আর ২০১৫ তে অ্যামেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সমকামী বিয়েকে আইনি বৈধতা দেয়ার পর হিলারি বলেছিল, 'প্রেম বিজয়ী হয়েছে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে।'[১০৯]

হিলারি রাজনীতিবিদ। রাজনীতিবিদদের সাধারণত কোনো নৈতিকতা থাকে না, তবে ভালো ধারণা থাকে সমাজের নৈতিকতার ব্যাপারে। তাই মাত্র ১১ বছরের মধ্যে 'শুধুই নারী-পুরুষের পবিত্র বন্ধন' থেকে বিয়ে হয়ে গেছে সমলিঙ্গের 'প্রেমের বিজয়'। ১১ বছর আগে যেটা অগ্রহণযোগ্য ছিল, এখন সেটা হয়ে গেছে স্বাভাবিক। আর তা বুঝতে পেরে সুর মিলিয়েছে হিলারিও। এটা শুধু ১১ বছরের ব্যাপার না। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে নৈতিকতা, বিশেষ করে যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন অবিশ্বাস্য মাত্রার পরিবর্তন।

একই কথা কিছুটা ভিন্নমাত্রায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ছেলেমেয়ে ভার্সিটিতে উঠে প্রেম করবে, একসময় এটাকে খুব খারাপ মনে করা হতো। এখন এটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রেমের এই স্বাভাবিকীকরণের জন্য এক নতুন ধরনের ভাষাও তৈরি করে ফেলেছি আমরা।

'ভাবি ছেলের বিয়ে দিয়েছেন?'

'জি ভাবি, গত মাসে। ছেলের নিজের পছন্দ ছিল।'

ক্রমাগত বদলাতে থাকা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসেবে নেয়ার এই হলো ফলাফল। সময়ের সাথে বদলাতে থাকা নৈতিকতার কম্পাস বাঁধ দিতে পারে না; বরং হয়ে ওঠে অধঃপতন আর অবক্ষয়ের কারণ। পাবলিক পারসেপশান বদলায়, খুব দ্রুতই বদলায়। এক প্রজন্মের কাছে যা অকল্পনীয়, অন্য প্রজন্মের কাছে তা-ই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে সমাজ আর কী কী গ্রহণ করে নেবে তা নিয়েও সহজেই পূর্বাভাস করা যায়। কারণ, কোন উৎসগুলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করছে সেটা আমাদের জানা। টিভি, হলিউড-বলিউড, শিল্প, সাহিত্য, গ্লোবাল সেলিব্রিটিদের নিয়ে গসিপ—এগুলোর মাধ্যমে ক্রমাগত আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট, হাইপার-লিবারেল, প্রায় কামুক দৃষ্টিভঙ্গি। বিনোদন মনে করে এগুলোকে নিত্যদিনের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে নিচ্ছি আমরা। বিনোদনের জগৎ থেকে শেখা 'নৈতিকতা'কে

[১০৯] ভিডিও এখন ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ উক্তি নিচের লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে,
Hillary Clinton had the chance to make gay rights history. She refused. *Washington Post*, August 29, 2016

নিয়ে আসছি বাস্তবে। এ প্রভাবকে অ্যামপ্লিফাই করছে সোশ্যাল মিডিয়া, একজনের একান্ত অসুখ পরিণত হচ্ছে মহামারিতে।

এ প্রচণ্ড ও সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের জবাব যদি হয় 'সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা', 'সমাজবাস্তবতা' আর 'আমাদের সমাজে এসব মানায় না'–তাহলে এ স্রোতে বাঁধ দেয়ার আশা এখনই ছেড়ে দেয়া উচিত। এ যুক্তিগুলো দিয়ে টেকা যাবে না। বরং আপনার যুক্তিই একদিন আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাধ্য করবে এ অসভ্যতাকে মেনে নিতে। মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়। সমাজ বদলায়, গ্রহণযোগ্যতার সংজ্ঞা বদলায়, বদলায় অধিকাংশের মত। ইসলামের বদলে সামাজিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও ঐতিহ্যকে মানদণ্ড হিসেবে নিলে পশ্চিম থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসা প্রচণ্ড ও সর্বব্যাপী নৈতিক অধঃপতনের স্রোতের মোকাবেলা করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

২.

দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট কিছু ধ্যানধারণা, আদর্শ সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বৈশ্বিক মিডিয়া। মিডিয়া খুব ধীরে ধীরে, নিয়ম করে কাজটা করে–তাই ব্যাপারটা সব সময় হয়তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট বয়ানকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা জনগোষ্ঠীকে 'অপর' কিংবা 'দানব' আকারে চিত্রিত করা, কোনো অস্বাভাবিক আচরণ বা বিকৃতিকে স্বাভাবিক করে তোলার কাজে মিডিয়ার অত্যন্ত পারদর্শী। দীর্ঘদিন ধরেই সোশ্যাল এঞ্জিনিয়ারিং এবং জনমত নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হলো মিডিয়া। এর একটি কারণ হলো সাধারণ মানুষের জন্য মিডিয়া কাজ করে তথ্যের উৎস হিসেবে। যার কারণে কিছু তথ্য চেপে রেখে বা বদলে দিয়ে মিডিয়া ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যেকোনো বিষয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তাকে। আরেকটি কারণ হল, মিডিয়া বিভিন্নভাবে মানুষের সামনে ট্রেন্ডসেটারের ভূমিকা পালন করে। পোশাক, বই, সিনেমা, গ্যাজেট থেকে শুরু করে আদর্শ পর্যন্ত–বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মিডিয়াই মানুষকে জানিয়ে দেয় কোনটা 'হিপ অ্যান্ড ট্রেন্ডি' আর কোনটা সেকেলে। এভাবে খুব সহজে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রচার করতে পারে মিডিয়া। পারে অন্ধকারকে আলো আর আলোকে অন্ধকার হিসেবে উপস্থাপন করতে।

গত এক শতাব্দীজুড়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জনমত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ পরিবর্তনের এ কাজগুলো করে আসছে ম্যাস মিডিয়া। আধুনিক প্রপাগ্যান্ডার জনক

এবং আনসাং হিরো (বা অ্যান্টিহিরো) এডওয়ার্ড বারনেইস তার বই 'প্রপাগ্যান্ডা'-তে মিডিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপগুলো তুলে ধরেছেন খুব সহজবোধ্য ও খোলামেলাভাবে। দশকের পর দশক ধরে সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই ধাপগুলো।

একটা বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

প্রায় বছর খানেক আগে জনপ্রিয় মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম TEDxTalk এর একটি পর্বে মিরজাম হেইন নামে একজন জার্মান মেডিক্যাল ছাত্রী বলে, পেডোফিলিয়া বা শিশুকাম একটি অপরিবর্তনীয় যৌনপ্রবৃত্তি (unchangeable sexual orientation)। একজন নারী ও পুরুষের পারস্পরিক যৌনকামনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি কিছু মানুষ শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে–এটাও স্বাভাবিক। এই তাড়না, এই আকর্ষণবোধের কারণে শিশুকামীদের দোষারোপ করা উচিত না।[১১০] ভিডিওটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় এবং তুমুল বিরোধিতার কারণে TEDxTalk বাধ্য হয় তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিওটি সরিয়ে নিতে।

মজার ব্যাপারটা হলো হেইন এটাও বলেছে যে, এ ধরনের যৌনতাড়না স্বাভাবিক হলেও এর বাস্তবায়ন অপরাধ ও অনৈতিক। অর্থাৎ শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই কামনা বাস্তবায়িত করা অস্বাভাবিক, এই আকর্ষণের ওপর কাজ করা অপরাধ।

এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে নৈতিকতার মানদণ্ডের ব্যাপারে আমাদের আলোচনা।

শিশুকাম যদি নারী-পুরুষের পারস্পরিক শারীরিক আকর্ষণের মতোই স্বাভাবিক এবং অপরিবর্তনীয় বিষয় হয়, তাহলে এই আকর্ষণের ওপর আমল করা কেন অপরাধ হবে?

কারণ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন কোনো শিশুর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয় তখন ব্যাপারটা দুজনের সম্মতিতে হয় না। এটা অপরাধ কারণ এখানে পারস্পরিক সম্মতি (Consent) থাকছে না। একই কারণে পশুকামও অপরাধ, কারণ এ ক্ষেত্রেও সম্মতি একপাক্ষিক। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌনকর্ম হচ্ছে না।

হেইনের উত্তর।

যদিও পশ্চিমের অনেকেই এখন শিশুকামের ব্যাপারে তার এ অবস্থানের বিরোধিতা

[১১০] Pedophilia is a natural sexual orientation, Mirjam Heine University of Würzburg

করছে, কিন্তু যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমের ধারণা অনুযায়ী হেইনের এ উত্তর সঠিক। চিন্তা করে দেখুন, বিবাহ-বহির্ভূত সেক্স (যিনা), সমকামিতা, উভকামিতা, সুইঙ্গার সেক্স, হুকআপ কালচার (বহুগামিতা), গ্রুপসেক্সের মতো যৌনবিকৃতিগুলোর পক্ষে উদারনৈতিক পশ্চিমের ডিফেন্স কী?

'আমরা তো কারও ক্ষতি করছি না!'

'যতক্ষণ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিয়ে কিছু করছি, ততক্ষণ কী সমস্যা?'

'ভালোবাসা কোনো বাধা, কোনো সীমানা মানে না।'

'দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা আছে এবং এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই।'

'আমার এ ব্যাপারটা (যেকোনো যৌনবিকৃতি) জন্মগত।'

মূলত বিভিন্ন আঙ্গিকে বেশ কয়েক দশক ধরে এ ধরনের উত্তরই শুনে আসছি আমরা। সুতরাং শিশুকামের ব্যাপারে মিরজাম হেইন যা বলেছে তা পুরোপুরিভাবে পশ্চিমের এ দৃষ্টিভঙ্গি, এ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন—এ মানদণ্ডে সমস্যা কোথায়? হ্যাঁ, এটা ইসলামের নৈতিকতার সাথে যায় না, কিন্তু পারস্পরিক সম্মতির শর্ত দিয়ে তো কমসেকম শিশুকামিতা ও পশুকামিতার মতো ব্যাপারগুলো আটকানো যাচ্ছে, এটাই বা কম কিসে?

সমস্যা হলো, এ শর্ত দিয়ে শিশুকামিতাকে আসলে আটকানো যায় না। কেন যায় না, ব্যাখ্যা করছি।

দেখুন বলা হচ্ছে—শিশুর সাথে সেক্স অপরাধ এবং অনৈতিক কাজ, কারণ এখানে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি (consent) নেই। প্রশ্ন হলো, পারস্পরিক সম্মতি নেই কেন?

কারণ, একটা নির্দিষ্ট বয়সের আগে, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগে শিশুর মধ্য যৌনতার ধারণা থাকে না। যে শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা, নিজের যৌনতা সম্পর্কে সচেতনতা নেই তার পক্ষে অবশ্যই কোনো যৌনকর্মে সম্মতি দেয়া সম্ভব না। শিশুর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বা সম্মতি জানানোর ক্ষমতা (agency) থাকে না। কাজেই শিশুর সাথে সেক্স আবশ্যিকভাবেই হচ্ছে সম্মতি ছাড়া, তাই এটি একটি অনৈতিক ও অপরাধ। যেমন একজন নারীর সাথে তার সম্মতি ছাড়া যৌনকর্ম করা অপরাধ।

রাইট?

রং।

এ পুরো যুক্তির ভিত্তি হলো Consent–সম্মতি। যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে শিশুর যৌনতার ব্যাপারে সম্মতি দেয়ার মতো পরিপক্বতা বা ম্যাচিউরিটি আছে, তাহলে কি এ যুক্তি আর টিকবে? মজার ব্যাপারটা হলো, শিশুরাও যে 'যৌনতা সম্পর্কে সচেতন' এটা এরই মধ্যে পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়া এবং মিডিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়; যদিও এখনো বিষয়টা ঠিক ওভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না।

সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের অবস্থান হলো শিশুরা জন্ম থেকেই যৌনতা সম্পর্কে সচেতন। যৌনতা সম্পর্কে আধুনিক সেক্সোলজির জনক ড. অ্যালফ্রেড কিনসি এবং আরেক মহারথী ড. জন মানির অবস্থানের দিকে তাকালেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ দুজনের অবস্থানের সারসংক্ষেপ হল :

১) জন্মের পর থেকেই শিশুরা যৌনতা সম্পর্কে সচেতন, যৌনতায় সক্রিয় এবং যৌনসুখ অর্জনে সক্ষম। জন্মের পর থেকেই একজন শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা ও বোধ থাকে।[১১১] এ কারণেই শিশুকাম বা অজাচার অস্বাভাবিক কিছু না।

২) প্রতিটি মানুষ সর্বকামী (pansexual/omnisexual) হিসেবে জীবন শুরু করে। তারপর সে কোনো এক বা একাধিক ধরনের যৌনাচারকে বেছে নেয়। এটি জন্মের সময় নির্ধারিত বা প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত না। প্রাকৃতিকভাবে যৌনতা নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, এ কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন।

৩) মূলত সব ধরনের যৌনতাই স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন যৌনতার ব্যাপারে আমাদের ধারণা বদলায়। আমাদের সামাজিক চিন্তার কারণে আমরা কিছু যৌনাচারকে স্বাভাবিক আর কিছু যৌনাচারকে অস্বাভাবিক মনে করি।[১১২]

কিনসি এবং মানির কিছু উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে।

Sexual Behavior In The Human Female বইতে কিনসি বলেছিল,

---

[১১১] Table 34. Examples of multiple orgasm in pre-adolescent males. Some instances of higher frequencies, Alfred Kinsey, *Sexual Behavior in the Human Male*, 1948

[১১২] রেফারেন্স ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মিথ্যের শেকল যত, মুক্তো বাতাসের খোঁজে, ইলমহাউস পাবলিকেশন,
পাঠক সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছো তুমি!! ফলো দা মানি - https://bit.ly/2NaKzGQ

'সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বেড়াজাল ছাড়া অন্য কোনো কারণে নিজের জননাঙ্গে অন্যের স্পর্শ কিংবা অন্যের জননেন্দ্রিয় দেখা, কিংবা আরও নির্দিষ্ট কোন যৌনসম্পর্ক শিশুকে কেন বিচলিত করবে তা বোঝা মুশকিল।'[১১৩]

অন্যদিকে *Development of paraphilia in childhood and adolescence* প্রবন্ধে মিরজাম হেইনের মতো হুবহু একই কথা বলেছিল জন মানি,

'শিশুকাম স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া না, আর ইচ্ছে করলেই একজন শিশুকামী একে ছেড়ে আসতে পারে না। শিশুকামীতা যৌনতার ব্যাপারে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা অনুরক্তি বা; বরং এটি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক গঠন। একজন মানুষের শিশুকামী হওয়া বাঁ-হাতি বা কালার ব্লাইন্ড হবার মতো (অর্থাৎ বিষয়টি তার সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছার উর্ধ্বে)।'[১১৪]

যদি কিনসি আর জন মানির দেয়া যৌনতার ধারণা গ্রহণ করা হয়–যদি মানব যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমা চিন্তার মূলনীতিগুলো মেনে নেয়া হয়–তাহলে আর এ যুক্তি দেয়া যায় না যে, শিশুকাম একটি অপরাধ কারণ শিশুদের পক্ষে যৌনকর্মে সম্মতি দেয়া সম্ভব না। যদি কেউ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন হয়, যৌনসুখ অর্জনে সক্ষম হয় এবং সক্রিয়ভাবে যৌনকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে সম্মতি কেন দিতে পারবে না?

ঠিক এ যুক্তিই সত্তরের দশক থেকে ব্যবহার করে আসছে শিশুকামের পক্ষে প্রচারণা চালানো অ্যামেরিকান ও ইউরোপিয়ান বিভিন্ন সংস্থা।[১১৫] কাজেই মিরজাম হেইন যা-ই বলুক না কেন, (অপ) বিজ্ঞানের অফিশিয়াল ভাষ্য অনুযায়ী শিশুরা সম্মতি (consent) দিতে সক্ষম। শিশুকামীদের 'স্বাভাবিক' যৌনতাড়না বাস্তবায়নে পশ্চিমা তত্ত্ব মতে কোনো বাধা নেই।

---

[১১৩] *Sexual Behavior in the Human Female*, p. 121

[১১৪] John Money -*Development of paraphilia in childhood and adolescence* (1993)

[১১৫] দেখুন অ্যামেরিকান সমকামী শিশুকামী সংস্থা NAMBLA (North American Man Boy Love Association) এর সদস্যদের বক্তব্য – Chickenhawk : Men Who Love Boys (1994)

৩.

এ তো গেল অ্যাকাডেমিয়ার কথা। সাধারণ মানুষের কী অবস্থা? অ্যাকাডেমিকদের তত্ত্বকথার কচকচির সাথে অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কি এ রকম? সাধারণ মানুষও কি মনে করছে, একজন শিশু যৌনতা সম্পর্কে সচেতন? নিজের যৌনতা সম্পর্কে সে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম?

হ্যাঁ, সাধারণ মানুষও আজ এমন মনে করতে শুরু করেছে। কিংবা বলা ভালো তাদের মনে করানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা, পশ্চিমা সরকার এবং বৈশ্বিক সংগঠনগুলো (ইউএন, WHO ইত্যাদি)। ব্যাপারটা সম্ভবত আপনারও চোখে পড়েছে, তবে সম্পর্কটা হয়তো আপনি ধরতে পারেননি।

গত কয়েক বছরের অল্প কিছু শিরোনাম মনে করিয়ে দিই–

> 'ব্রিটেনের প্রথম জেন্ডার ফ্লুয়িড পরিবার : বাবা নিজেকে নারীতে পরিণত করছে, মা নিজেকে মনে করে পুরুষ, আর ছেলে বড় হচ্ছে জেন্ডার নিউট্রাল হিসেবে।'[১১৬]
>
> নিউ ইয়র্কে আইনি ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ৩১টি লৈঙ্গিক পরিচয়কে (Gender Identity)।[১১৭]
>
> ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে, এখন থেকে তারা আর বাচ্চাদের পোশাক 'ছেলে' বা 'মেয়ে' ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের জন্য শুধু বিক্রি করবে 'Unisex'/ 'Gender Neutral' পোশাক।[১১৮]
>
> ২০১৭ এর মার্চে মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করে টাইম ম্যাগাযিন। 'Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality' শিরোনামের এ লেখায় সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর একটি জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের

---

[১১৬] Britain's FIRST gender fluid family: Father who's transitioning to be a woman and mother who identifies as male and female are raising their son, not to get 'hung up' on being a boy, *Mail Online*, August 13, 2017

[১১৭] Gender Id Card 2015, https://on.nyc.gov/2lIqAkf

[১১৮] Childrenswear Goes Genderless At John Lewis, *Vogue*, September 4, 2017

সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) অথবা সম্পূর্ণভাবে সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং 'মাঝামাঝি কিছু একটাকে' বেছে নেয়। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুণদের এক-তৃতীয়াংশ এখন আর নিজেদের 'পুরুষ' বা 'নারী' হিসেবে পরিচয় দেয় না।[১১৯]

বছর কয়েক আগে তাদের সাপ্তাহিক সাপ্লিমেন্ট 'Lifestyle' এ ট্র্যান্সজেন্ডার আন্দোলনের পেছনের ধারণাগুলোকে সমর্থন করে প্রচ্ছদ কাহিনি করেছে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার।[১২০]

নার্সারির বাচ্চাদের জেন্ডার ফ্লুয়িডিটির ব্যাপারে ক্লাস নিচ্ছে ড্র্যাগ কুইনরা।[১২১]

ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria ও Gender Change সংক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে আছে ৪ বছর বয়সী শিশুও। বাড়ছে শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন।[১২২]

একটা ছাড়া ওপরের সবগুলো খবর ২০১৭ এর। মাঝের সময়টুকুতে যুক্ত হয়েছে আরও অসংখ্য এমন গল্প। সারা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে সমকামী আন্দোলনের ধাঁচে গড়ে ওঠা ট্র্যান্সজেন্ডার আন্দোলন ও এর দর্শন।

সংক্ষেপে ট্র্যান্সজেন্ডার আন্দোলনের মূল কথা হলো–ধরাবাঁধা কোনো যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় মানুষের নেই। এ ব্যাপারটা একটা স্পেক্ট্রাম, একটা রংধনুর মতো (হ্যাঁ, এই জন্যই রংধুন সিম্বল ব্যবহার করা হয়)। কোনো কিছু সাদাকালো না। এখানে আছে অনেক, অনেক রং। যেকোনো মানুষ বা শিশু যদি একজন নারী, পুরুষ বা অন্য কোনো 'কিছু' হিসেবে পরিচিত হতে চায়, তবে তা-ই মেনে নিতে হবে। শারীরিকভাবে, জন্মসূত্রে সে যা-ই হোক না কেন!

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে সত্যিকারের ইন্টারসেক্স বা ট্রু হারমাফ্রোডাইটের ('হিজড়া') কথা বলা হচ্ছে না। জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% True intersex হয়ে

---

[১১৯] Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality, Katy Steinmetz, Mar 16, 2017

[১২০] Androgyny In A Fair World, Lifestyle, *The Daily Star*, August 8, 2017

[১২১] Drag queens sent to nursery schools to teach kids as young as two about 'gender diversity', *The Sun*, November 12, 2017

[১২২] 'Some are confused, others are trapped in the wrong body': Astonishing 50 kids a week referred to sex change clinics, *Mirror Online*, October 22, 2017

থাকে।[১২৩] অর্থাৎ এমন মানুষ সংখ্যায় খুবই কম। মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় যে বাইনারি এটার প্রমাণ পৃথিবীর বাকি ৯৯.৯%৮২ মানুষ। কিন্তু আধুনিক সময়ের অতি-আধুনিক মানুষের মধ্যে কারও কারও হঠাৎ করে মনে হলো মানুষের পরিচয়ের ব্যাপারে এই 'পুরোনো চিন্তা'-কে ভেঙে নতুন এক চিন্তার কাঠামো তৈরি করা দরকার। তারা বলা শুরু করল, লৈঙ্গিক পরিচয় প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত কিছু না। মানুষ তার সামাজিক প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যে ইত্যাদির কারণে প্রভাবিত হয়ে নিজেকে চিহ্নিত করে পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এটা নিজের বেছে নেয়ার ব্যাপার, পূর্বনির্ধারিত কিছু না। তাই এমন হতে পারে যে, একজন মানুষ শারীরিকভাবে পুরুষ কিন্তু তার ভেতরের 'সত্তাটি' নারীর। অথবা একজন মানুষ শারীরিকভাবে নারী কিন্তু তার ভেতরে পুরুষ সত্তার বসবাস। যখন এমনটা ঘটে তখন একে বলা হয় Gender Dysphoria এবং এমন মানুষকে বলা হয় Transgender। আবার এমনও হতে পারে যে, একজন মানুষ শারীরিকভাবে যা-ই হোক না কেন একেক সময় সে নিজেকে নারী চিহ্নিত করে, আর অন্য সময় পুরুষ হিসেবে। তার কোনো নির্দিষ্ট gender বা লৈঙ্গিক পরিচয় নেই, সে Gender Neutral বা Gender Fluid।

ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্ট এখন পশ্চিমে পরিণত হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনায়–মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী চার বছর বয়সী শিশুদেরও এখন নাকি 'মনে হচ্ছে' তারা ভুল দেহে জন্ম নিয়েছে। এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ফ্রিতে এমন সব ওষুধ দিচ্ছে যেগুলো তাদের স্বাভাবিক বয়ঃসন্ধিকে বিলম্বিত বা বন্ধ করবে।[১২৪]

কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার সাথে আপেক্ষিক নৈতিকতা আর শিশুকামের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক আছে।

দেখুন, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে একেবারে শিশুরাও ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে। শৈশব থেকেই নিজেদের মধ্যে তারা অনুভব করতে পারে ভিন্ন যৌন পরিচয়, ভিন্ন সত্তা। বয়সের কোনো লিমিট এখানে নেই। দু-বছর বয়স থেকেই স্কুলে রীতিমতো ক্লাস নিয়ে বাচ্চাদের এগুলো শেখানো শুরু হয়েছে। চার

[১২৩] How common is intersex? a response to Anne Fausto-Sterling, Sax L (2002)

[১২৪] Puberty blockers may improve the mental health of transgender adolescents, *PBS News Hour*, Aug 20, 2016,
Schools rushing 'on whisper' to label pupils as transgender, *The Sunday Times*, January 21, 2018

বছরের বাচ্চা বিশ্বাস করছে তার লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি করা দরকার। এই পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঠেলে দিচ্ছে শিশুদের যৌন-জীব (sexual being) হিসেবে মেনে নেয়ার দিকে। অর্থাৎ কিনসি এবং মানির এই উপসংহারের দিকে– জন্মের পর থেকেই শিশুরা যৌনতা সম্পর্কে সচেতন, যৌনতায় সক্রিয় এবং যৌনসুখ অর্জনে সক্ষম। জন্মের পর থেকেই একজন শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা ও বোধ বিদ্যমান থাকে

এর বাস্তব উদাহরণও দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দশ ও আট বছর বয়সী দুটো ছেলেকে নিয়ে বেশ শোরগোল হচ্ছে অ্যামেরিকান মিডিয়ায়। ছেলে দুটো দাবি করছে ২ এবং ৩ বছর বয়সে স্বাভাবিক শারীরিক পরিচয়ের বাইরে ওরা নিজেদের মধ্যে আবিষ্কার করেছে অন্য এক 'সত্তা'। সেই থেকে স্বেচ্ছায় ওরা 'ড্র্যাগ' করে আসছে।[১২৫] ড্র্যাগ (Drag) হলো পশ্চিমা সমকামীদের একটি সাবকালচার, যেখানে নারীদের পোশাক চাপিয়ে ও মেইকআপ করে সমকামী পুরুষরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের যৌন উত্তেজক স্টেইজ শো, নাচ, গান ইত্যাদিতে । কাজটা যখন সমকামী পুরুষরা করে তখন তাদের বলা হয় 'ড্র্যাগ কুইন'। 'ড্র্যাগ কিং' এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। সমকামী নারীরা পুরুষের মতো ড্রেসআপ ও মেইকআপ করে। এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো স্বভাবতই চরমমাত্রায় যৌনায়িত হয়, এবং বেশির ভাগ সময় এগুলো হয় সমকামীদের বিভিন্ন ক্লাব ও বারে। ছেলে দুটোর মধ্যে একজন এরই মধ্যে সমকামীদের বারে নেচে টিপসও জোগাড় করে ফেলেছে।[১২৬]

আসুন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিন্দুগুলো এবার মেলানো যাক। পুরো ব্যাপারটা একটু ধাপে ধাপে চিন্তা করুন–

ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার কারণে ৪ বছরের বাচ্চা লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন করতে চাচ্ছে। দুই বছরের বাচ্চা পর্যন্ত 'সন্দেহে ভুগছে' তার যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় নিয়ে। ১০ বছর বয়সী ছেলেরা বলছে ২/৩ বছর বয়েস থেকেই তারা নিজেদের মধ্যে ভিন্ন 'সত্তা' অনুভব করছে, এবং যৌন উত্তেজক নাচানাচি শুরু করছে 'আটকা পড়া সত্তাকে মুক্ত করার' জন্যে। এই পুরো ডিলিউশান ও উন্মাদনাকে সমর্থন করছে

---

[১২৫] 'ডেযমন্ড' - You will love 'Drag Kid' Desmond. Fiercely, https://www.youtube.com/watch?v=Qk0WA3VIFfA
'ল্যাকট্যাশিয়া' - Meet the 8-Year-Old Boy Who Transforms Into a Drag Queen Named Lactatia, https://www.youtube.com/watch?v=bdCXxUxI-WE
[১২৬] 11 Year old boy 'Desmond' dancing at a gay (3 Dollar Bill Bar) bar, Dec. 2, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=9EZ60tqJB4c

অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্র ও মিডিয়া। জীবনকে আমূল বদলে দেয়া বিভিন্ন মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে এই বাচ্চাদের 'অনুভূতির' ওপর ভিত্তি করে। সিদ্ধান্তগুলোর সাথে যৌনতার ব্যাপারটা জড়িত ওতপ্রোতভাবে। এ সবকিছুর মাধ্যমে বুঝে কিংবা না বুঝে আমরা মেনে নিচ্ছি যে শিশুরাও যৌন-জীব (sexual being), তারাও যৌনতা সম্পর্কে সচেতন। ৮ বছর বয়সী একটা ছেলে যখন বলে সে চরম যৌনায়িত সমকামী সাবকালচারের মাঝে নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পায়, অথবা সে পুরুষের দেহে আটকে পড়া একজন নারী–এবং আমরা সেটা মেনে নিই, তখন আমরা মূলত এটাই মেনে নিচ্ছি যে, নিজের যৌনতা ও শরীরের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তগুলো দেয়ার মতো পরিপক্বতা তার মধ্যে এসেছে। অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মাধ্যমে আমরা মেনে নিচ্ছি এ বয়সী একটা বাচ্চার সম্মতি দেয়ার–consent করার–সক্ষমতা আছে।

> 'যে মানুষ নিজের পুরো শরীরকে বদলে ফেলার ব্যাপারে, নিজের লিঙ্গ বদলে ফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারে, কার সাথে শোবে সেই ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না?'

একজন শিশুকামী যদি ওপরের প্রশ্নটা করে, কী জবাব দেবেন? যদি যৌনতা এবং যৌনবিকৃতির ব্যাপারে পশ্চিমা চিন্তার মূল কাঠামোকে মেনে নেয়া হয়, যদি একটা শিশু তার লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে এটাও মানতে হবে যে এই শিশু সম্মতি দিতে পারে যৌনকর্মের ব্যাপারেও। কাজেই যে যুক্তি দিয়ে মিরজাম হেইন এবং অন্যান্য আরও অনেকে শিশুকামী তাড়নার বাস্তবায়নকে অনৈতিক ও অপরাধ বলছেন, তা আসলে ধোপে টেকে না। ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা আমাদের শেখাচ্ছে শিশুরাও যৌনতার ব্যাপারে সচেতন, সক্রিয় ও সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম।

আর ঠিক এভাবেই, এ যুক্তিতেই যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন–যা আমরা আধুনিকতার নামে গদগদ হয়ে গ্রহণ করেছি–একসময় বৈধতা দেবে শিশুকামিতাকে।

ঠিক দু-দশক আগে যেভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমানে ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার রাইটস' এর নামে। এরই মধ্যে পুরোপুরি প্রস্তুত একে বৈধতা দেয়ার তাত্ত্বিক এবং রেটোরিকাল কাঠামো। এখন শুধু প্রয়োজন নিয়মিত কিছু আবেগঘন সাহিত্য, সিরিয়াল, সিনেমা আর দেশে দেশে হাই-প্রোফাইল কিছু শিশু ট্র্যান্সজেন্ডার সেলিব্রিটি।

'যৌনতা, ব্যক্তিপরিচয়–এসব আপেক্ষিক। ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের বিষয়। একজন মানুষ ভেতরে কেমন তা-ই মুখ্য। সামাজিক প্রথা আর পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা উচিত না। যখন কারও ক্ষতি হচ্ছে না তখন বিরোধিতা কেন?'

এমন সব যুক্তির মাধ্যমে চেষ্টা চলছে এই বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক ও নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপনের। একবার এই বিকৃতি গৃহীত হবার পর একই যুক্তি ব্যবহার করে বৈধতা দেয়া হবে শিশুকামের। আমার কথাটা স্মৃতিতে মজুদ করে রাখতে পারেন, বছর দশেক পর মিলিয়ে নেবেন।

মজার ব্যাপার হলো, ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্টের পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো দিয়ে খুব সহজে সমকামিতার পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো খণ্ডন করা যায়। সমকামিতার পক্ষে বহুল ব্যবহৃত একটি যুক্তি হলো মানুষ জন্মগতভাবেই সমকামী হয় ('born this way')। আবার অনেকে বলার চেষ্টা করে একটি বিশেষ জিন (the gay gene) এর কারণে কিছু মানুষ সমকামী হয়ে জন্মায়। অর্থাৎ তারা দাবি করে সমকামীদের যৌনতা নির্ধারিত বায়োলজি দ্বারা। আবার দেখুন ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে যৌনতা, লৈঙ্গিক পরিচয় এসব পরিবর্তনশীল। কোনো কিছুই পাথরে লেখা না। নারী হয়ে জন্মানো মানুষ একসময় পুরুষ হতে পারে, যে নারীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত, একসময় সে আকর্ষণ বোধ করতে পারে পুরুষের প্রতি। এগুলো খুবই স্বাভাবিক।

যদি আসলেই তা-ই হয়, তাহলে নিশ্চয় সমকামিতাও জন্মগত হতে পারে না। জন্মগত লিঙ্গ আর যৌনতাকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে আর জন্মগত সমকামিতা বলে কী থাকে? ঠিক একইভাবে 'সমকামী জিন' বলেও কোনোকিছু থাকতে পারে না। কারণ, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের পক্ষে দেয়া যুক্তি অনুযায়ী সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা, কিংবা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা–কোনো কিছুই জিনগত না, বায়োলজিকালি নির্ধারিত না। এগুলো সবই বদলাতে পারে। যার অর্থ একজন সমকামী, একসময় বের হয়ে আসতে পারে সমকামিতা থেকে। আর এটা যদি সাধারণভাবে ঘটতে পারে, তাহলে নিশ্চয় চিকিৎসার মাধ্যমেও কাউকে সমকামিতা থেকে বের করে আনা সম্ভব। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সমকামিতার পক্ষে চালানো নিজেদের প্রপাগ্যান্ডাকেই খণ্ডন করে বসে আছে মিলিট্যান্ট সেক্যুলারিযম। তাদের এক কথা আরেক কথার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। অসংলগ্ন ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের মধ্যে এ প্যাটার্নটা বারবার দেখা যায়।

এই অর্থহীন যৌন-মানসিক বিকৃতির জট ইসলামের আলোতে খোলা খুব সোজা। আমরা জানি, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ফিতরাহর (natural disposition) ওপর। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। সমকামিতা জন্মগত না, স্বাভাবিকও না; বরং একটি যৌন-মানসিক বিকৃতি। জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রতিটি মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) হয় এবং তখন থেকে সে অর্জন করে যৌনতায় সক্রিয় হবার সক্ষমতা। অঞ্চল, আবহাওয়া ও পরিবেশের কারণে এই বয়সের মধ্যে কিছু পার্থক্য হয়; কিন্তু কোনো শিশুই যৌন-জীব হিসেবে জন্ম নেয় না। একইভাবে আমরা জানি আল্লাহ ভুল করেন না। কাজেই ভুল করে, ছেলের দেহে মেয়ে বা মেয়ের দেহে ছেলে আটকা পড়েছে–এ ধরনের কোনো কিছু হওয়া সম্ভব না। হয় এটা মানসিক রোগ, বিকৃতি, বাহ্যিক কোনো ফ্যাক্টরের প্রভাব (শৈশবের যৌন-মানসিক নিপীড়ন, শক, ট্রমা ইত্যাদি) অথবা সিহর বা জ্বিন শায়াত্বিনের প্রভাব। আর যারা সত্যিকার অর্থে শারীরিকভাবে ইন্টারসেক্স (মোট জনসংখ্যার ০.০১৮%), তাদের হুকুম হাদিস থেকে স্পষ্ট এবং এটা তাদের জন্য একটি পরীক্ষা। কিন্তু যখনই আপনি পরম মানদণ্ডকে ছেড়ে আপেক্ষিকতার গলিতে ঢুকে পড়বেন, কোনো কূলকিনারা পাবেন না।

আপেক্ষিক নৈতিকতা আর সামাজিকতাকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে নেয়ার অনেক নেতিবাচক ফলাফলের মধ্যে একটা হলো পশ্চিমের আজকের এই যৌন অবক্ষয়। সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডার আর শিশুকামিতা নিয়ে উন্মাদনা। যৌনতা এবং যৌনবিকৃতি এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শক্তিশালী, কারণ এ বিষয়গুলো সহজাতভাবে মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে; কিন্তু একই ধরনের বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান পশ্চিমা চিন্তা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও। পশ্চিমা সভ্যতা তাদের উৎকর্ষের চরমে পৌঁছানোর পর এখন আছে অবক্ষয় আর অধঃপতনের পর্যায়ে। প্রত্যেক সভ্যতার এই পর্যায়ে দেখা দেয় নানান ধরনের যৌনবিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন। লেইট স্টেইজ ডেকাডেন্স। পশ্চিম এখন ঠিক এ অবস্থায় আছে। অল্প হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা বুঝতেও শুরু করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা মুসলিমরা এখনো অনিমেষ চোখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি পচতে শুরু করা অতিকায় এই কাঠামোর দিকে। সত্যিকারের দিকনির্দেশনা, সত্যিকারের পরশপাথর, পরম মানদণ্ড আল ফুরকানকে হাতের কাছে অবহেলা ভরে ফেলে রেখে আজও স্বপ্ন দেখছি তাদের অনুকরণে নিজেদের উন্নতির।

কী বিচিত্র ইচ্ছা-অন্ধত্ব! কী অদ্ভুত আত্মঘৃণা!

মানসিক দাসত্ব

ধরুন সাদা পাঞ্জাবি পরে আপনি কারও জানাযায় গেছেন। আপনার পোশাক নিয়ে শুনতে পেলেন দুজনের মন্তব্য।

প্রথমজন বলল, ও সাদা পাঞ্জাবি পরে এসেছে।

দ্বিতীয়জন বলল, ও কালো পাঞ্জাবি পরে এলে ভালো হতো।

এ দুই মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কী? অনেক ধরনের পার্থক্যই আছে, তবে আমরা মৌলিক একটা পার্থক্যের ওপর ফোকাস করব।

প্রথমজনের কথা একটা statement of fact, সে জাস্ট একটা তথ্য জানাচ্ছে। নিরেট ইনফরমেইশান। এর সাথে আর কোনো কিছু যোগ করা হয়নি। দ্বিতীয়জনের বক্তব্য হলো তার ব্যক্তিগত মত, কোনো ফ্যাক্ট না। জানাযাতে সাদার বদলে কালো পরা কি আসলেই ভালো? কালোই কি বেস্ট চয়েস, নাকি রংটা অফ-ওয়াইট, নীল বা অন্য কিছু হতে পারে?

এ ধরনের প্রশ্নের অনেক রকমের উত্তর হতে পারে। একেকজনের কাছে ভালো লাগতে পারে একেক রং। কিন্তু দ্বিতীয়জনের এ বক্তব্য কোনো নিরেট তথ্য না। অনেক মতের মধ্যে একটা মত কেবল। প্রথমজনের বক্তব্য একটা পযিটিভ স্টেইটমেন্ট। দ্বিতীয়জনের বক্তব্য নরম্যাটিভ। যে বক্তব্য শুধু কোনো বাস্তব সত্য বা তথ্যকে তুলে ধরে সেটা পযিটিভ (positive)। অন্যদিকে নরম্যাটিভ (normative) বক্তব্য হলো যা নির্দিষ্ট মত (যেমন ঔচিত্য) বা নৈতিকতা প্রকাশ করে।

এ পার্থক্যটা মাথায় রাখুন।

২.

লক্ষ করবেন ইসলামের সাদা, কালো এবং এ দুয়ের মাঝের অন্য সব রঙের চামড়ার সমালোচকরা ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে ফিরে আসে। এ মূল পয়েন্টগুলোর শেকড় থেকে বের হয়ে আসা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দিকে যায় ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা তাদের আপত্তিগুলো। এ শাখা-প্রশাখাগুলোর অনেকগুলোই আপনার চেনা। যেমন :

'ইসলামে নারীকে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয় না,

ইসলামে বাক্‌স্বাধীনতা নেই,

সমকামীদের প্রতি ইসলামের অবস্থান উগ্র,

ইসলাম মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয় না,

ইসলাম ধর্মের স্বাধীনতা দেয় না,

ইসলাম সাম্প্রদায়িক,

ইসলামের অনেক বিধিবিধান অমানবিক,

নারী-পুরুষের মেলামেশা ও যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের ধারণা সেকেলে,

ইসলাম সহিংসতাকে সমর্থন করে', ইত্যাদি।

কাফিরদের মধ্যে যারা ইসলামের সমালোচনা করে অথবা মুসলিম পরিবারের জন্ম নিয়ে যারা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী অথবা ইসলামবিদ্বেষী হয়, ইসলাম মানার ব্যাপারে তাদের অস্বস্তি, আপত্তি ও অভিযোগের বিশাল একটা অংশ দেখবেন ঘুরপাক খায় এগুলোর মধ্যে। এমনই কোনো চিন্তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অনেকের সংশয় কিংবা বিদ্রোহের।

অন্যদিকে এ অভিযোগগুলো করা হলে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে ব্যস্ত হয়ে যান ইসলামেও নারী অধিকার আছে, ইসলাম সবচেয়ে মানবিক ধর্ম, ইসলাম মানে শান্তি, ইসলাম সবচেয়ে সহনশীল ইত্যাদি প্রমাণে।

কিন্তু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার, যেটা আমরা কেউ দিই না বললেই চলে।

সেটা কী?

দেখুন এই যে সমালোচনাগুলো করা হচ্ছে, এগুলোর প্রতিটির পেছনে কাজ করছে ভালো-মন্দের একটি নির্দিষ্ট ধারণা। এ আপত্তিগুলো তোলা হচ্ছে নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে।

আচ্ছা বলুন তো, নারীকে পুরুষের সমান অধিকার কেন দিতে হবে? কেন সমকামিতাকে বিকৃতি মনে না করে বরং সমকামীদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে হবে? কেন একজন মুসলিম আর একজন কাফিরকে সমান মনে করতে হবে? নারীপুরুষের যৌনতার ব্যাপারে বর্তমান পৃথিবী যে অবস্থান গ্রহণ করেছে কেন সেটাকে ঠিক মনে করতে হবে?

কেন এটা খারাপ আর ওটা ভালো?

কিসের ভিত্তিতে? কোন মাপকাঠি অনুযায়ী?

বিজ্ঞান? ওপরের একটা প্রশ্নের সাথেও বিজ্ঞানের কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে নিরেট তথ্য কিংবা বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। ইনফ্যাক্ট বিজ্ঞান আপনাকে বলবে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যপ্রণালি ভিন্ন যা তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।[১২৭] ইতিহাস আপনাকে বলবে যুদ্ধ রাষ্ট্রের নামে হয়, দর্শনের নামে হয়, স্বার্থের জন্য হয়, গায়ের রঙের জন্যও হয়। যখনই দুদল মানুষের মধ্যেকার মতবিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা যায় না এবং এক বা উভয়পক্ষ মতবিরোধকে মেনে নিয়ে সহাবস্থান করতে চায় না, তখন ফয়সালা হয় সংহিসতার মাধ্যমে। এটা মানব ইতিহাসের এক ধ্রুব সত্য।

বহুবিবাহ, সমকামিতা, ইসলামের দণ্ডবিধি—প্রতিটা আপত্তির ক্ষেত্রেই পাল্টা প্রশ্ন করা যায়।

কেন বহুবিবাহ খারাপ আর 'সমকামী বিয়ে' ভালো?

কেন মুরতাদের জন্য মৃতুদণ্ড বর্বর কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য মৃত্যুদণ্ড জায়েজ?

কেন আর যে কেউ শক্তি ব্যবহার করলে সেটা বেআইনি কিন্তু রাষ্ট্র করলে সেটা বৈধ?

কেন অ্যামেরিকা আর জাতিসংঘের সমর্থন পাওয়া সশস্ত্র দল 'বিপ্লবী' আর অন্য সবাই 'জঙ্গি' কিংবা 'সন্ত্রাসী'?

---

[১২৭] আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে দেখতে পারেন, *Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women*, Anne Moir and David Jessel

এ রকম অনেক প্রশ্ন ওঠানো যায়। কেন এটা খারাপ আর ওটা ভালো? হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেটাকে ভালো দাবি করা হচ্ছে সেটা আসলেই ভালো। কিন্তু এ ভালো-মন্দটা ঠিক করা হচ্ছে কীভাবে? কিসের ভিত্তিতে? বন্ধ ঘড়িও ২৪ ঘণ্টায় দুবার ঠিক সময় দেয়, তাই বলে বন্ধ ঘড়ির ওপর কিন্তু ভরসা করা যায় না।

আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, এসব সমালোচনার পেছনে নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। ভালোমন্দের একটি নির্দিষ্ট ধারণা থেকে এই উপসংহারগুলো বের হচ্ছে। প্রশ্ন হলো সেই ফ্রেইমওয়ার্কটা কী? সেই মতাদর্শটা কী?

লিবারেলিযম, সেক্যুলার হিউম্যানিযম। এনলাইটেনমেন্টের গর্ভ থেকে বের হয়ে আসা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এ ফ্রেইমওয়ার্ক আমাদের যেসব উপসংহার দিচ্ছে সেগুলো নরম্যাটিভ, পযিটিভ না। আপনার কাছে মনে হতেই পারে যে জানাযার জন্য সবার গোলাপি রঙের ফতুয়া পরে আসা উচিত। কিন্তু আপনার মনে হওয়া আপনার মতকে সঠিক প্রমাণ করে না। দাবিকে সত্য বলতে হলে প্রমাণ লাগবে। সেক্যুলার হিউম্যানিযম বা লিবারেলিযমের উপসংহারগুলোকে ধ্রুব সত্য বলে আমার ওপর চাপিয়ে দেয়ার আগে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, এটা নিছক আপনার মত না; বরং এটাই সত্য।

২+২ = ৪ এটা একটা বাস্তব সত্য। এটা অস্বীকার করা সম্ভব না।

কিন্তু ২+২ = ২২ হওয়া উচিত ছিল, এটা নিছক দাবি।

৩.

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ভালোমন্দের এই নির্দিষ্ট কাঠামো কেন আমি মেনে নিতে বাধ্য? কয়েক শ বছর আগে ইউরোপের ঔপনিবেশিক লুটেরারা নিজেরা নিজেরা ভেবে যে মানদণ্ড বানিয়েছে সেটা আমি মানব কেন? নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষীরা প্রশ্ন করে, 'আমি স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেব কেন?' 'কুরআনে আছে বলে আমাকে মানতে হবে কেন?'

অথচ এই একই স্ট্যান্ডার্ড তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না।

তুমি যেটাকে ভালো বলছ সেটাকে আমার ভালো বলে মেনে নিতে হবে কেন? তোমার দেয়া মানবাধিকার, অগ্রগতি আর উন্নতির সংজ্ঞাকেই কেন গ্রহণ করতে হবে? আমার কেন মানতে হবে তোমাদের ঠিক করা ভালোমন্দের কনসেপ্টকে? পুরো মানবজাতির ইতিহাস থেকে মাত্র দু-তিন শ বছরের অল্প একটা সময়কে আলাদা করে নিয়ে, সেই সময়ে গড়ে ওঠা ইউরোপের অল্প কিছু মানুষের চিন্তাভাবনা ও দর্শনকে ধ্রুব সত্য বলে

মেনে নেয়ার দাবি তুমি কীভাবে করো? তুমি চাও আমার পুরো দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি 'সত্যের' ইউরোপিয়ান ধারণার ওপর সাজাব? অথচ তোমার দাবিগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণই তোমার কাছে নেই?

এটা হলো পশ্চিমের চাপিয়ে দেয়া ন্যারেটিভের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার একটি। নিজেদের মতকে তারা বৈজ্ঞানিক কিংবা প্রাকৃতিক সত্য বলে দাবি করতে চায়। পশ্চিম আমাকে বলে বস্তুবাদী প্রমাণ ছাড়া স্রষ্টার আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া মানুষের আনুগত্য করতে হবে। বিনা প্রশ্নে! দুঃখজনক বিষয়টা হলো পশ্চিমের এ দাবিগুলোকে নিজের অজান্তেই আমরা অনেকে সত্য বলে মেনে নিই। এগুলোকে সত্য ধরে নিয়ে এমনভাবে নিজেদের পরিচয় ও ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যাতে তা মানুষের বানানো এই কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমরা ইসলামকে যখন সমর্থন করি তখনো সেটা পশ্চিমের শেখানো ভাষায় করি। চেষ্টা করি সেক্যুলার হিউম্যানিযমের কাছে ইসলামকে উপাদেয় হিসেবে উপস্থাপনের।

আর এটা, আমার মতে, আমাদের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়।

হাউস নিগার

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমা আলোচনা সাধারণত দুই ধরনের মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট, অথবা পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অথবা পশ্চিমা চিন্তায় দীক্ষিত মুসলিম (পশ্চিমা অধিকাংশ আলিমও এই দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে পড়েন)। প্রথম শ্রেণির ফোকাস থাকে 'উন্নত' ও 'অগ্রগামী' পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তার মোকাবেলায় ইসলাম কতটা পশ্চাৎপদ ও সেকেলে—সেটা দেখানোতে। দ্বিতীয় শ্রেণির মনোযোগ হলো ইসলাম কতটা আধুনিক, কত মানবিক, পশ্চিমা সভ্যতার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ—তা প্রমাণে। প্রথম শ্রেণির উদ্দেশ্য সমালোচনা, দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্দেশ্য সাফাই গাওয়া। তবে দুদলই পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। পার্থক্য হলো, এক দল খাঁটি পশ্চিমা, অন্য দল বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা বন্ধক দেয়া জাতে উঠতে চাওয়া বাদামি চামড়ার 'পশ্চিমা হতে চাওয়া' নেটিভ। এক দল ওরিয়েন্টালিস্ট, আরেক দল মর্ডানিস্ট।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের প্রচারিত ও প্রকাশিত মর্ডানিস্টদের লেখাগুলো পড়ার সময় লজ্জার সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি এড়িয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। এরা ছিল ইসলামের 'আঙ্কল টম', 'হাউস নিগ্রো'[১২৮]।

---

[১২৮] দাসপ্রথা চলাকালীন অ্যামেরিকায় মোটাদাগে দুই ধরনের দাস ছিল। হাউস নিগ্রো—যারা ঘরে কাজ করত, মনিবের সাথে ঘরের ভেতর থাকত, মনিবের উচ্ছিষ্ট খেতো আর নিজেকে পরিচিত করত মনিবের পরিচয়ে। অনুগত দাস—যে তার দাসত্ব মেনে নিয়েছে এবং কষ্টকর মুক্তির বদলে বেছে নিয়েছে আরামদায়ক দাসত্বকে। যখন অন্য কোনো দাস মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন মনিবের চেয়েও বেশি উত্তেজিত হয়ে তেড়ে আসে এই হাউস নিগ্রো। হ্যারিয়েট বিচার স্টৌ এর বিখ্যাত 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইয়ের মূল চরিত্র আঙ্কল টম একজন হাউস নিগ্রোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিতীয় প্রকারের দাসরা ছিল ফিল্ড নিগ্রো। তারা মাঠে কাজ করত উদয়াস্ত। প্রতিদিন তাদের ওপর চলত নির্মম নির্যাতন। ফিল্ড নিগ্রো ঘৃণা করত তার মনিবকে এবং তার দাসত্বকে। সে মরিয়া ছিল মুক্তির জন্য।

তাদের ধারণা ছিল ইসলামের সমর্থনে কথা বলার অর্থ হলো, ইসলামের কোনো কিছুই ইউরোপিয়ান দর্শন এবং নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক না—এ কথা প্রমাণ করা। বলাই বাহুল্য এ ধরনের প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি হলো পশ্চিমা সভ্যতার সাপেক্ষে ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করা। যার অর্থ হলো শুরুতেই পশ্চিমা সভ্যতাকে মানদণ্ড এবং শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে।

পশ্চিমা মানদণ্ডে ইসলামকে পাশ করাতে উদ্‌গ্রীব ইসলামের এই 'রক্ষকেরা' ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দিতেন ইসলামের প্রশংসায় 'মহান পশ্চিমা দার্শনিকদের' কোনো উদ্ধৃতির খোঁজে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত, খুঁজে খুঁজে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া কোনো সাংবাদিকের লেখা থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা মুসলিমদের ব্যাপারে সামান্য কিছু প্রশংসা বা ইতিবাচক কথা তারা বের করে এনেছেন। হৃদয়ের পূজামণ্ডপে ভক্তিভরে, অন্ধভাবে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো যে পশ্চিমা সভ্যতাকে তারা বসিয়েছিলেন, তার ব্যাপারে ইসলামের যে কিছু বলার থাকতে পারে, এ সভ্যতা, এর নৈতিকতা ও এর আদর্শিক ভিত্তির ব্যাপারে ইসলামের দিক থেকে যে তীব্র সমালোচনা থাকতে পারে—মর্ডানিস্টদের চিন্তাতে এ কথা কখনোই আসত না।

বর্তমানে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তীব্র হীনম্মন্যতার জায়গায় কিছুটা হলেও জাগ্রত হয়েছে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ। কিন্তু এখনো মৌলিকভাবে পশ্চিম—ইউরোপিয়ান সভ্যতাকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে নেয়ার ব্যাপারটা রয়ে গেছে। মর্ডানিস্টরা এখনো আমাদের মাঝেই আছে, তবে প্রভাব-প্রতাপ ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে 'মডারেট'রা। সমসাময়িক এই মডারেট মুসলিম লেখক, বক্তা কিংবা ইসলামপ্রচারকদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে গর্ব ও মুসলিম হিসেবে আত্মমর্যাদবোধ দেখতে পাওয়া যায়। এ গর্ব ও মর্যাদাবোধ তাদের কথায় প্রকাশ পায় এবং পশ্চিমা অবক্ষয়ের ব্যাপারেও তাদের উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা যায়। কিন্তু এত সব উন্নতি সত্ত্বেও পশ্চিমা চিন্তার পরাধীনতা থেকে তারা এখনো মুক্ত হতে পারেননি। শুধু বদলেছে চিন্তাগত পরাধীনতার ধরন।

মডারেট ইসলামিস্ট ও সংস্কারপন্থীদের মুখে প্রায়ই 'আন-নাহদা', 'পুনর্জাগরণ' কিংবা 'ইসলামী রেনেসাঁ' জাতীয় কথাগুলো আপনি শুনবেন। খোলাখুলিভাবেই

আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন, Malcolm X - The House Negro and the Field Negro - https://www.youtube.com/watch?v=7kf7fujM4ag

তারা ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর আদলে ইসলামী রেনেসাঁর কথা বলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন ইউরোপিয়ান রেনেসাঁকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এমনকি নির্মোহ ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে রেনেসাঁ আসলে কী?

খ্রিষ্টবাদ শক্তিশালী হবার মাধ্যমে যে পৌত্তলিকতা[১২৯] ইউরোপের ওপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, রেনেসাঁ হলো সেই প্রকৃতিপূজারি, গ্রেকো-রোমান পৌত্তলিকতার পুনর্জন্ম। বর্তমানে আমরা যে পশ্চিমা অবক্ষয় ও অধঃপতন দেখি (মডারেট ও সংস্কারপন্থী ইসলামিস্টরা যার সমালোচনা করেন) পৌত্তলিক রেনেসাঁ এবং এর আদর্শই তার উৎসমূল। ডানপন্থী, রক্ষণশীল পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের (যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামবিদ্বেষীও হয়ে থাকে) বিরোধিতা করতে গিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মডারেট মুসলিমরা এড়িয়ে যান তা হলো, দু-দুটো ধর্মকে (ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্ম) ধ্বংস করা এ শক্তি ও মতাদর্শ ইসলামের জন্যও হুমকি। বিশ্বব্যাপী সেক্যুলারিযম ও লিবারেলিযমের যে তাণ্ডব গত প্রায় এক শতাব্দীজুড়ে আমরা দেখেছি, রেনেসাঁ ও ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্ট থেকেই তা উদ্ভূত। বর্তমানের মুসলিমদের বিশাল একটি অংশ হয় এ হুমকিকে এড়িয়ে যান, অথবা মনে করেন ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও আদর্শিক দৃঢ়তার কারণে এই হুমকি গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই।

ইসলাম অবক্ষয়, বিকৃতি কিংবা দূষণের ঊর্ধ্বে—এ কথা আমরাও স্বীকার করি, বিশ্বাস করি। কিন্তু সমস্যা হলো, ইসলামের ক্ষেত্রে যে কথা খাটে সে কথা মুসলিমদের ক্ষেত্রে খাটে না। কর্তৃত্বশালী সভ্যতা হবার পরও, রাষ্ট্র ও সমাজে ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও শক্তিশালী ভিত থাকা সত্ত্বেও যেখানে ইউরোপের খ্রিষ্টবাদ সেক্যুলারিযম ও এনলাইটেনমেন্টের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে কীভাবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সামরিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শিক আক্রমণের সম্মুখীন, দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ফলাফল আশা করা যেতে পারে?

মডারেট ও সংস্কারপন্থী ইসলামিস্টদের মুখে আজ আমরা বারবার শুনি—আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ভালোটা নেব, মন্দগুলো বাদ দেবো। একজন মুসলিমের কাছ থেকে, বিশেষ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হবার দাবি রাখা ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে, এমন কথা শোনাটা বেশ অদ্ভুত। ইসলাম পরিপূর্ণ। একটি সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (worldview)।

---

[১২৯] Paganism বা পৌত্তলিকতা একটি সর্বব্যাপী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, নিছক ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে না।

ইসলাম একটি গেশটাল্ট (Gestalt), এমন এক পরস্পর সংযুক্ত সম্পূর্ণতা, যা থেকে কোনো একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ বা বর্জনের সুযোগ নেই। বাস্তবতা হলো, প্রতিটি শক্তিশালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে কোনো না কোনো মাত্রায়। এমনকি দূর থেকে দেখে যা আমাদের কাছে ক্রমপরিবর্তনশীল, আকার, রং আর অবয়ব পাল্টাতে থাকা বায়োস্কোপের ছবির মতো মনে হয়, সেই পশ্চিমা সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি আর দৈনন্দিন প্রয়োগের মধ্যেও আছে সরাসরি সম্পর্ক। আছে কার্যকারণ সম্পর্কের সূক্ষ্ম বুনন। সভ্যতার যেকোনো অংশ তার পুরোটার সাথে সংযুক্ত। এক সুতো টানলে দেখতে পাবেন অসংখ্য অদৃশ্য আঁশ আর সংযুক্তির জালের মাধ্যমে বাকি অংশের সাথে তা যুক্ত। 'ভালো' মনে করে যে অংশটুকু আপনি আলাদা করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, তা আপনার ঘরে টুকরো টুকরো করে, খণ্ডে খণ্ডে, ধাপে ধাপে নিয়ে আসছে তার সম্পূর্ণ কাঠামো। আলোর সাথেই আসে ছায়ার আঁধার, আর প্রতিটি 'ভালো'র সাথে আসে তার সাথে সংযুক্ত অথবা তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্ম নেয়া প্রতিটি 'মন্দ'। আগুনের আলো নিলে তার জ্বালাও নিতে হয়।

কিন্তু মডারেট ও সংস্কারপন্থীরা এ বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চান। মিষ্টি মিষ্টি কথার সাউন্ডবাইটে তারা আমাদের বোঝাতে চান–পশ্চিমের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি করে গ্রহণ না করাই, আরও সক্রিয়ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ না করাই যেন আমাদের দুর্দশার কারণ। পরাধীনতা–সম্ভবত অনিচ্ছায় ও অজান্তেই–তাদের চিন্তার জগৎকে আচ্ছন্ন করেছে। হৃদয়ে শক্ত শেকড় গেড়ে বসা হীনম্মন্যতার অনুভূতিকে আজ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় শব্দ, শব্দাবলি ও বাক্যের কারুকাজের আড়ালে।

কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয় না। পশ্চিমা সভ্যতার প্রথা, প্রবণতা ও প্রভাবের প্রতি মানসিক পরাধীনতার ছাপ প্রকটভাবে ফুটে ওঠে তাদের কথায়। নানা আরবী শব্দ আর পরিভাষার আড়ালে ইসলামীকরণ হয় পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও চিন্তার। ওয়াহীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসলামী চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন এ 'ইসলাম' পরিণত হয় কিছু আবেগ, অনুভূতি আর বাস্তবতাহীন বুলির পোশাকি উপস্থাপনে।

নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময় থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাসীন সভ্যতা-সংস্কৃতির সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। প্রবল প্রতিকূলতার মাঝেও আপসহীনভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছিলেন তাঁরা। বিদ্যমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাঠামোর বাইরে গড়ে তুলেছিলেন একটি স্বতন্ত্র পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি, এবং আদর্শিক আঘাত হেনেছিলেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু আজ ইসলামের অনেক প্রচারক এবং অনেক ইসলামপন্থী ইসলামের বিজয় দেখছেন পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণে। ইসলামের আদর্শিক বিশুদ্ধতার বদলে তারা উম্মাহর বিজয় খুঁজে পাচ্ছেন সেক্যুলারিযম, গণতন্ত্র এবং লিবারেলিযমের মতো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক জীবন-দর্শনের ইসলামীকরণের মাঝে। সেক্যুলার আইডেন্টিটি পলিটিক্স এবং লিবারেল বয়ানের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করছেন মুসলিম পরিচয় এবং মুসলিম হিসেবে অধিকারকে। শুধু নিজেকে পশ্চিমের চোখে দেখে তারা ক্ষান্ত হচ্ছেন না; বরং উদারনৈতিক পশ্চিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন ইসলামকেও।

পশ্চিমের ভাষায় তর্ক করতে গিয়ে ভাষার মারপ্যাঁচে আটকা পড়ে ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছেন ইসলামী শরীয়াহর অনেক বিষয়ে। খিলাফাহ, শরীয়াহ শাসন, হুদুদ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জিহাদ থেকে শুরু করে দাড়ি-টুপি কিংবা নিক্বাব-হিজাবের মতো একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয়কেও তারা পশ্চিমা তর্কের ভাষায় সমর্থন করাকেই সমীচীন মনে করছেন। ফলে পাওয়া যাচ্ছে ইসলাম আর কুফরের অদ্ভুত এক মিশেল। যেখানে শরীয়াহ হলো কাফিরের সাথে গলাগলি করা আর কুফরকে মেনে নেয়া, নামায হলো খুব ভালো এক্সারসাইয, রমাদ্বানের সিয়াম পালন হলো বছরে একবার নিজের ডায়েট ঠিক করে নেয়া আর পরিপাকতন্ত্র ঝালিয়ে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ! এ ইসলামে হিজাব হলো 'চয়েস', ইসলামের নারী অধিকার হলো ইতিহাসের প্রথম 'ফেমিনিযম', জিহাদ হলো সকালে সময়মতো উঠে অফিসে যাওয়া, আল ওয়ালা ওয়াল বারা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রকে নিয়মিত ট্যাক্স দেয়া আর সে রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের গদগদ দেশপ্রেম প্রকাশ করা। আর সবার ওপরে, এই ইসলামের মানে আত্মসমর্পণ না; এই ইসলামের মানে শান্তি।

গত শতাব্দীর মর্ডানিস্টদের মানসিক দাসত্ব ও হীনম্মন্যতা তাদের বাধ্য করেছিল পশ্চিমের চোখে ইসলামকে 'সভ্য' প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইসলামের ওই সব বিধিবিধানকে অস্বীকার করতে, যেগুলো পশ্চিমা সভ্যতার সাথে খাপ খায় না। আর এ শতাব্দীর মডারেট ইসলামিস্টরা পশ্চিম ও ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষকে অস্বীকার করে কুফর ও কুফর সভ্যতার ইসলামীকরণ করতে গিয়ে ইসলামী শরীয়াহকে ব্যাখ্যা করছেন পশ্চিমের শেখানো ভাষায়, পশ্চিমের উপযোগী করে, আর তার করতে গিয়ে বদলে ফেলছেন ইসলামকেই।

এ কারণেই দেখবেন ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রচার করা থিসিস–ইসলামী সভ্যতা যখন থেকে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক জন্ম দেয়া বন্ধ করেছে তখন থেকেই ইসলামী সভ্যতার অধঃপতন, অবক্ষয় আর পশ্চাৎপদতার শুরু–মর্ডানিস্ট বলুন, মডারেট বলুন কিংবা

ট্র্যাডিশানালিস্ট, সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে নেয়। এই অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়েছে কাল্পনিক 'ইসলামী রেনেসাঁর' ব্যাপারে এক উদ্‌গ্রীব, বেপরোয়া মুগ্ধতা। তারা বিস্মৃত হয়েছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অধঃপতন ও অবক্ষয়ের চেয়েও বিচ্যুতি বেশি ভয়ংকর। কারণ, অবক্ষয় হলো ক্লান্তি ও শিথিলতার উপসর্গ। অন্যদিকে বিচ্যুতি হলো ভুল গন্তব্যের দিকে অসুস্থ গতিশীলতা।

পাগল কিংবা ভূতগ্রস্ত দৈত্যের চেয়ে ঘুমন্ত দৈত্য উত্তম।[১৩০]

---

[১৩০] মূল : চার্লস লি গাই ইটন (হাসান লি গাই ইটন/হাসান আব্দুল হাকিম) রচিত, *Islam and The Destiny of Man* (1985) বইয়ের একটি অংশ অবলম্বনে

সাম্রাজ্যের সমাপ্তি

অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসছে। অ্যামেরিকার অর্থনীতিকে নিঃশেষ করছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আর বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সামরিক সম্প্রসারণ। বাড়তে থাকা ঋণ, ঘাটতি, ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইযেশান এবং বৈশ্বিক নানা বাণিজ্যচুক্তির ভারে ভেঙে পড়ছে অ্যামেরিকার অর্থনীতি। অ্যামেরিকার গণতন্ত্রকে জিম্মি ও ধ্বংস করে ফেলেছে ট্যাক্স মওকুফ, ডি-রেগুলেইশান এবং ভয়ংকর মাত্রার জোচ্চুরির পর সব ধরনের জবাবদিহি থেকে অব্যাহতির আবদার করা, আর সরকারি বেইল-আউটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার লুট করা বড় বড় কর্পোরেশানগুলো। ইউরোপ, ল্যাটিন অ্যামেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য যে ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া দরকার, জাতি হিসেবে অনেক আগেই সেটা হারিয়েছে অ্যামেরিকা। এ সবকিছুর সাথে যোগ করুন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘনিয়ে আসা বিপর্যয়–পেয়ে যাবেন অবশ্যম্ভাবী এক ডিসটোপিয়ার (Dystopia) রেসিপি। এ পতনের তদারকি করছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বসে থাকা, মূর্খ, ভণ্ড, চোর, সুবিধাবাদী আর যুদ্ধবাজ জেনারেলদের এক বিচিত্র দল। আর স্বচ্ছতার খাতিরে, এখনই বলে দিই, রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেট, দুদলের কথাই আমি বলছি।

আরও কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাবে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য। দিন দিন প্রভাব কমতে থাকবে। একপর্যায়ে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো সিদ্ধান্ত নেবে রিযার্ভ কারেন্সি হিসেবে ডলারের ব্যবহার বন্ধ করার। আর ঠিক তখনই এমন এক মারাত্মক, অবশ করে দেয়া অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হবে অ্যামেরিকা, যা তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্য করবে নিজ সমরযন্ত্রের আকার কমিয়ে আনতে। আকস্মিক ও ব্যাপক গণবিদ্রোহ ছাড়া ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকা এই সাম্রাজ্যের পতন, এ ধীর কিন্তু নিশ্চিতগতির মৃত্যু ঠেকানো

অসম্ভব। আর এমন কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। যার অর্থ হলো, সর্বোচ্চ এক থেকে দু-দশকের মধ্যে আমাদের চেনা অ্যামেরিকার আর অস্তিত্ব থাকবে না।

অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ (Department of Defense) 'At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীর '(বিভিন্ন) রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আগের মতো অজেয়, অনাক্রমণীয় অবস্থান আর নেই' এবং 'অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনী এখন আর আগের মতো নিজ শক্তির কেন্দ্রের বাইরে, সুসংহত এবং টেকসই আঞ্চলিক সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ না'।

'In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power' এর লেখক ঐতিহাসিক অ্যালফ্রেড ডাবিউ. ম্যাকয়ের ধারণা অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের পতন আসবে ২০৩০ এর মধ্যে।

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যগুলো আত্মহননের একগুঁয়ে পথ বেছে নেয়। ঔদ্ধত্য তাদের অন্ধ করে রাখে, তারা স্বীকার করতে পারে না নিজেদের কমতে থাকা ক্ষমতার বাস্তবতা। বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে তারা এমন এক কল্পরাজ্যে আশ্রয় নেয় যেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না কঠিন ও অপ্রিয় সত্যগুলোর। গণতন্ত্র, জোটবদ্ধতা এবং রাজনীতিকে তারা প্রতিস্থাপন করে একপাক্ষিক হুমকি আর যুদ্ধের হাতুড়ি দিয়ে।

সামষ্টিক এ আত্মপ্রতারণার কারণেই অ্যামেরিকা ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক স্ট্র্যাটিজিক ভুল করেছিল–ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ। এ ভুলই বাজিয়ে দেয় অতিকায় অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের বিদায়ঘণ্টা। বুশ প্রশাসনের সময়কার এ যুদ্ধের ব্যাকুল স্থপতিদের এবং মিডিয়া ও অ্যাকাডেমিয়ায় তাদের মূর্খ স্তাবক তোতাপাখিদের এ দেশদুটোর ব্যাপারে বাস্তব ধারণা ছিল খুব কম। এ ধরনের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল শিশুসুলভ, এবং এ আক্রমণের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার কোনো রকমের প্রস্তুতি তাদের ছিল না। তারা দাবি করেছিল, সম্ভবত বিশ্বাসও করেছিল, সাদ্দাম হুসেইনের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে, যদিও এ দাবির পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না। তারা বলেছিল, বাগদাদে গণতন্ত্র স্থাপিত হবে, তারপর তা ছড়িয়ে পড়বে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে। অ্যামেরিকান জনগণকে তারা আশ্বস্ত করেছিল–ইরাকি ও আফগানরা অ্যামেরিকান সেনাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বরণ করে নেবে হাসিমুখে, কৃতজ্ঞচিত্তে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইরাকের তেলের টাকা দিয়েই ইরাক পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে।

জোরগলায় দাবি করেছিল, দ্রুত ও আগ্রাসী সামরিক আঘাত–শক অ্যান্ড অ' (shock & awe)–মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকান কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

যেবিগ্নিউ ব্রেযনিস্কির ভাষায়, 'ইরাকের বিপক্ষে স্বেচ্ছায় শুরু করা এই একপাক্ষিক যুদ্ধ অ্যামেরিকান বৈদেশিক নীতির অন্যায্যতার ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত দ্রুত, অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল।'

সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্যায়ে ঘটা এসব সামরিক কেলেঙ্কারিকে ঐতিহাসিকরা বলেন 'মাইক্রো-মিলিটারিযম' (micro-militarism)। এথেন্সবাসী মাইক্রো-মিলিটারিযমে লিপ্ত হয়েছিল পেলোপোনেইশান (৪৩১-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্ব) যুদ্ধের সময় সিসিলি আক্রমণের মাধ্যমে। এর ফলে তারা হারিয়েছিল ২০০ জাহাজ ও হাজার হাজার সেনা। এ ঘটনা ছিল স্ফুলিঙ্গের মতো, যা পুরো সাম্রাজ্যজুড়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের দাবানল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ প্রণালির জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বের জের ধরে মিসর আক্রমণ করে একই ধরনের ভুল করেছিল ব্রিটেন। আক্রমণের অল্প কিছুদিন পরই অপমানিত ব্রিটেন পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঘটনার ফলে আরবজুড়ে পাকাপোক্ত হয়েছিল জামাল আব্দুন-নাসেররের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের অবস্থান; যে ক'টি অবশিষ্ট উপনিবেশের ওপর তখনো ব্রিটেনের কর্তৃত্ব টিকে ছিল এ ঘটনার পর তারা হারায় সেগুলোর নিয়ন্ত্রণও। এথেন্স বা ব্রিটেন, কেউই এ ভুলগুলোর পর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

ম্যাকয়ের মতে,

> *'সামরিক শক্তি প্রয়োগ, দখলদারিত্ব ও দূরবর্তী উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদীয়মান সাম্রাজ্যগুলো বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ও যৌক্তিক চিন্তার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে ম্লান হয়ে আসা পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যগুলোর ঝোঁক থাকে শক্তিপ্রদর্শনের হঠকারী পদক্ষেপ আর কাল্পনিক কোনো সামরিক মহাকৌশলের মাধ্যমে এক ধাক্কায় হারানো সম্মান ও শক্তি ফিরে পাবার আকাশকুসুম স্বপ্নের দিকে। অধিকাংশ সময় অযৌক্তিক এসব মাইক্রো-মিলিটারি অভিযান আর যুদ্ধের খরচ জোগাতে গিয়ে ক্রমেই নিঃশেষিত হতে থাকে সাম্রাজ্যের সম্পদ। অথবা তারা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়, যা আরও ত্বরান্বিত করে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া পতনের প্রক্রিয়াকে।'*

অন্যান্য জাতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তিই যথেষ্ট না। সাম্রাজ্যগুলোর আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়–এক ধরনের মিস্টিক (Mystique)। এমন কিছু যা আড়াল

করে রাখবে সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট, শোষণ ও নিপীড়নকে। এমন কোনো মুখোশ যা উপনিবেশের বোকা নেটিভ অভিজাতদের প্রলুব্ধ করবে সাম্রাজ্যবাদের জন্য কাজ করতে, অথবা কমসেকম তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবে। আর যেসব জনগণ ও সেনাদের পয়সা ও রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে—এই মিস্টিক তাদের সামনে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে উপস্থাপন করবে সভ্যতা; এমনকি মাহাত্ম্যের প্রলেপ দিয়ে।

কেন্দ্রের আদলে উপনিবেশগুলোতে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের আপাতপ্রতিষ্ঠা, পোলো, ক্রিকেট আর ঘোড়দৌড়ের মতো বিভিন্ন ব্রিটিশ খেলার আমদানি, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের রাজপ্রতিনিধি আর মহাসাড়ম্বরে রাজবংশীয়দের প্রদর্শনী—এ সবকিছু ছিল ওই মিস্টিক, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'অজেয় নেভি ও সামরিক বাহিনীর' পরিপূরক হিসেবে কাজ করত। ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ইংল্যান্ড নিজের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর সে বাধ্য হয় বিশ্বমঞ্চ থেকে নিয়মিত পশ্চাদপসরণে।

গণতন্ত্র, মুক্তি আর সাম্য নিয়ে অ্যামেরিকার গালভরা বুলির পাশাপাশি বাস্কেটবল, বেইসবল ও হলিউড, অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীকে পূজনীয়, অজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ঐশ্বরিক এক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন—এ সবকিছুই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা আতঙ্কিত করে রেখেছিল বিশ্বকে। কিন্তু পর্দার আড়ালে, অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটেছিল, মার্কিন সমর্থিত অভ্যুত্থান, সাজানো নির্বাচন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, প্রপাগ্যান্ডা ক্যাম্পেইন, ঘুষ, ব্ল্যাকমেইল, হুমকি ও নির্যাতনের মতো সিআইএ-এর নানা নোংরা কৌশলের মাধ্যমে।

কিন্তু এসব কূটকৌশল এখন আর কাজ করছে না।

অ্যামেরিকা তার মিস্টিক হারিয়েছে। এ অপূরণীয় ক্ষতি তাকে 'প্রায় অক্ষমে' পরিণত করেছে। ফলে কঠিন হয়ে গেছে সাম্রাজ্যের দেখাশোনার জন্য দালাল খুঁজে পাওয়া, যেমনটা আমরা ইরাক ও আফগানিস্তানে দেখেছি, দেখছি। আবু গ্বুরাইবে আরব বন্দীদের ওপর চালানো শারীরিক ও যৌন-নির্যাতনের ছবিগুলো মুসলিমবিশ্বে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং আল-কায়েদা ও আইএস-এর জন্য জোগান দিয়েছে অসংখ্য নতুন সদস্য। ওসামা বিন লাদেন ও মার্কিন নাগরিক আনওয়ার আল-আওলাকিসহ বিভিন্ন জিহাদি নেতাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুপ্তহত্যা অ্যামেরিকার প্রচারিত আইনের শাসনের (Habeas Corpus) পুরো ধারণাকেই উপহাসে পরিণত করেছে। হাস্যাস্পদ করে তুলেছে অ্যামেরিকার আইনের শাসনের বুলিকে।

লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ, অ্যামেরিকার ব্যর্থ সামরিক আগ্রাসনের পরিণতি থেকে পালাতে বেপরোয়া লক্ষ লক্ষ আরব রিফিউজি এবং ড্রোন হামলার প্রায় নিরবচ্ছিন্ন হুমকি—

প্রকাশ করে দিয়েছে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে অ্যামেরিকার আসল চেহারা। ব্যাপক নৃশংসতা, নির্বিচার সহিংসতা, মিথ্যা এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর মতো হিসেবের গরমিলের প্রতি যে আসক্তি ভিয়েতনামে অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

দেশের বাইরে চালানো এ নৃশংসতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দেশের ভেতরের সহিংসতা। সামরিকায়িত এক পুলিশ বাহিনী নিয়মিত গুলি করে হত্যা করছে নিরস্ত্র, গরিব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের। বৈশ্বিক জনসংখ্যার মাত্র ৫% হবার পরও অ্যামেরিকার কারাগারগুলোতে আজ আবদ্ধ পুরো পৃথিবীর মোট বন্দীদের ২৫%। অ্যামেরিকার অনেক শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। গণপরিবহন-ব্যবস্থায় বিরাজ করছে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। অবনতি হচ্ছে মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাইভেটাইয করা হচ্ছে। অপিঅয়েড[১৩১] আসক্তি, আত্মহত্যা, বন্দুকধারীদের চালানো গণহত্যা, ডিপ্রেশান এবং বীভৎস স্থূলতা আজ প্লেগের মতো জেঁকে বসেছে প্রগাঢ় হতাশার অন্ধকূপে আটকে যাওয়া এক জনগোষ্ঠীর ওপর।

অ্যামেরিকার শাসনব্যবস্থার ওপর ওয়াল স্ট্রিটের নীরব কর্পোরেট অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশি অংশকে ভোগানো দারিদ্র্য, 'অ্যামেরিকান ড্রিমের' ব্যাপারে খোদ অ্যামেরিকানদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। জন্ম দিয়েছে গভীরে প্রোথিত ক্ষোভ। এ প্রতিক্রিয়া একদিকে নির্বাচনে বিজয়ী করেছে ট্রাম্পকে, অন্যদিকে ভেঙে দিয়েছে 'অ্যামেরিকার একটি কার্যকরী গণতন্ত্র' হবার মিথ্যে ধারণা। অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের টুইট এবং বক্তব্যগুলো ঘৃণা, বর্ণবাদ, গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ, দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ভরা। এই প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের অধিবেশনে সরাসরি হুমকি দিয়েছে একটি রাষ্ট্রকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার এবং একটি জাতির ওপর গণহত্যা চালানোর।

অ্যামেরিকা এখন বিশ্বজুড়ে উপহাস ও ঘৃণার পাত্র।

অন্ধকার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছে একের পর এক ডিস্টোপিয়ান সিনেমা। হলিউড আজ আর অ্যামেরিকার মাহাত্ম্যের কথা বলে না, অ্যামেরিকার বিশেষত্বের কথা বলে না, আওড়ায় না মানবজাতির উন্নতির মুখস্থ, মিথ্যে বুলি; বরং ছবি আঁকে এক অন্ধকার, হতাশাময় ভবিষ্যতের।

অ্যালফ্রেড ম্যাকয়ের ভাষায়,

---

[১৩১] আফিমজাত মাদক কিংবা ওষুধ

'শ্রেষ্ঠ বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে অ্যামেরিকার মৃত্যু আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক দ্রুত হতে পারে। যদিও সাম্রাজ্যগুলোর অসীম শক্তিধর বা অজেয় হবার একটা ধারণা প্রচলিত থাকে, কিন্তু আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যগুলো হয় বিস্ময়কর রকমের ভঙ্গুর। একটা সাধারণ জাতিরাষ্ট্রের সমান সহজাত শক্তিও তাদের থাকে না। সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটতে পারে বিভিন্ন বিচিত্র কারণে। অতীতের সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসের দিকে একনজর তাকানোই এ সত্য মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সাধারণত প্রধান অথবা প্রাথমিক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে রাজস্ব ও অর্থনৈতিক চাপ।

প্রায় দু-শতাব্দী ধরে অধিকাংশ স্থিতিশীল রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং তা বজায় রাখা। বৈদেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ছিল অপশনাল। এর পেছনে বাজেটের ৫% এর বেশি ব্যয় করা হতো না। কিন্তু একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে প্রায় প্রাকৃতিকভাবে যে অর্থায়নের উদ্ভব ঘটে, সাম্রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটে না। তাই যেকোনো মূল্যে লুটপাট অথবা মুনাফার জন্য বুভুক্ষু শিকারির মতো আচরণ করে সাম্রাজ্যগুলো। অ্যাটল্যানন্টিক দাস ব্যবসা, কঙ্গোতে বেলজিয়ামের রাবার লালসা, ব্রিটেনের ভারতীয় আফিম বাণিজ্য, তৃতীয় রাইখের হাতে ইউরোপের ধর্ষণ অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা পূর্ব ইউরোপের শোষণ–সাম্রাজ্যবাদ এমন আচরণের জন্য কুখ্যাত।'

কিন্তু যখন রাজস্বপ্রবাহ শুকিয়ে আসে, কিংবা থেমে যায়, ম্যাকয়ের মতে–'অতিকায় সাম্রাজ্যগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়ে'। সাম্রাজ্যগুলোর ক্ষমতার বলয় এতটাই দুর্বল যে, আসল বিপদ এলে তাদের পতন ঘটে অভাবনীয় দ্রুততার সাথে।

পর্তুগালের সময় লেগেছিল মাত্র এক বছর, সোভিয়েত ইউনিয়নের লেগেছিল দু-বছর, ফ্রান্সের আট বছর, অটোমানদের এগারো বছর, 'গ্রেট ব্রিটেনের' সতেরো বছর এবং খুব সম্ভবত অ্যামেরিকার জন্য সময়টা হলো ২০০৩ এর ইরাক আক্রমণ থেকে শুরু করে ২৭ বছর।

ইতিহাস থেকে মোটমাট ৬৯টি সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানতে পাওয়া যায়। কোনোটিই পতনের সময় যোগ্য নেতৃত্ব পায়নি। বরং পতনের কালে ক্ষমতা গেছে রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা অথবা নিরোর মতো বিকৃত পশুদের কাছে। আমরা হয়তো এখন অ্যামেরিকায় বিকৃত, অসুস্থ, গলাবাজ নেতাদের কাছে শাসনকর্তৃত্ব যাবার এ প্রক্রিয়ারই বাস্তবায়ন দেখছি।

ম্যাকয়ের মতে,

'অধিকাংশ অ্যামেরিকান ২০২০ এর দশককে মনে রাখবে–সেই একই বেতন দিয়ে হতাশাজনক, মনোবল ভেঙে দেয়া মূল্যস্ফীতির বাজারের মুখোমুখি হওয়া, আর ম্লান হতে থাকা আন্তর্জাতিক প্রভাবের জন্যে।

বৈশ্বিক রিযার্ভ কারেন্সি হিসেবে ডলারকে যখন বাদ দেয়া হবে, তখন আর ডলার ছাপিয়ে ঋণ আর বাজেট ঘাটতি মেটাতে পারবে না অ্যামেরিকা। খুব দ্রুত, খুব তীব্রভাবে অবমূল্যায়ন ঘটবে অ্যামেরিকান ট্রেজারি বন্ডের। বেড়ে যাবে আমদানির খরচ। বিস্ফোরণ ঘটবে বেকারত্বের। অগুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যু নিয়ে সংঘর্ষ দেখা দেবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে। ফলে উত্থান ঘটবে বিপজ্জনক কট্টর জাতীয়তাবাদের (hyper nationalism)–যা জন্ম দিতে পারে অ্যামেরিকান ফ্যাসিযমের।'[১৩২]

পতনের যুগেও সন্দেহবাতিক, বিচ্ছিন্ন, অপমানিত, নিন্দিত অভিজাত শ্রেণি প্রতিটি বাঁকে খুঁজে পাবে শত্রু। পাইকারি নজরদারি, নাগরিক স্বাধীনতার ধ্বংস, নির্যাতনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতি, সামরিকায়িত পুলিশ, অতিকায় কারাগার, হাজার হাজার সামরিক ড্রোন আর স্যাটেলাইট–বৈশ্বিক কর্তৃত্বের জন্য গড়ে তোলা এসব যন্ত্রপাতি এবার ব্যবহার করা হবে নিজ দেশে। সাম্রাজ্য ধসে পড়বে। অ্যামেরিকা নিজেই নিজেকে গ্রাস করবে। কর্পোরেট রাষ্ট্রের শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে না নিলে আমাদের জীবদ্দশাতেই তা ঘটবে।[১৩৩]

---

[১৩২] শ্বেতসন্ত্রাস, দ্রষ্টব্য।

[১৩৩] মূল : *The End of Empire*, ক্রিস হেজেস। ঈষৎ সংক্ষেপিত।
ক্রিস হেজেস একজন কলামিস্ট। পুলিতযার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর। অ্যাক্টিভিস্ট এবং একাধিক বেস্ট-সেলিং বইয়ের লেখক। এখনো পর্যন্ত তার লেখা ১১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

অবক্ষয়কাল

অতীত

ইতিহাসের দিকে তাকালে সভ্যতা ও যৌনতার সম্পর্কের একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। বারবার বিভিন্ন সভ্যতায় এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

প্যাটার্নটা কী?

সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলোজিস্ট জন ড্যানিয়েল আনউইন ৫,০০০ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র এবং ৬টি সভ্যতার ওপর এক পর্যালোচনা করেন। আনউইন এ গবেষণা শুরু করেন সভ্যতাকে অবদমিত কামনা-বাসনার ফসল হিসেবে দাবি করা ফ্রয়েডিয় থিওরি যাচাই করার জন্যে। কিন্তু ফলাফল দেখে হকচকিয়ে যান আনউইন নিজেই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত *Sex & Culture* বইতে দীর্ঘ এ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন সভ্যতা ও সেগুলোর পতনে আনউইন দেখতে পান একটা স্পষ্ট প্যাটার্ন–

কোনো সভ্যতার বিকাশ সেই সভ্যতার যৌনসংযমের সাথে সম্পর্কিত। যৌনতার ব্যাপারে কোনো সমাজ যত বেশি সংযমী হবে তত বৃদ্ধি পাবে বিকাশ ও অগ্রগতির হার। সহজ ভাষায় বললে, সভ্যতার বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা স্বাভাবিক যৌনাচার আবশ্যিক। প্রাথমিক বিকাশের পর্যায়ে যৌনাচারের ক্ষেত্রে প্রতিটি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং এর ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বস্ততা।

বিস্মিত আনউইন আবিষ্কার করলেন, সুমেরিয়, ব্যাবলনীয়, গ্রিক, রোমান, অ্যাংলো-স্যাক্সনসহ প্রতিটি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে এমন সময়ে যখন যৌনসংযম ও নৈতিকতাকে এসব সমাজে কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। কিন্তু উন্নতির

সাথে সাথে প্রতিটি সভ্যতায় শুরু হয় অবক্ষয়। সফলতা পাবার পর সভ্যতাগুলো হারানো শুরু করে নিজেদের নৈতিকতা। সাফল্যের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে তাদের মূল্যবোধ, প্রথা ও আচরণ। ক্রমেই উদার হতে শুরু করে যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি। বহুগামিতা, সমকামিতা, উভকামিতার মতো ব্যাপারগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে এগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় সমাজ। সামষ্টিক কল্যাণের ওপর ব্যক্তি স্থান দেয় তার নিজস্ব স্বার্থপর আনন্দকে।

যৌনাচার ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, সমাজে এর কোনো নৈতিক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না–আজকের আধুনিক সভ্যতার আধুনিক মানুষগুলোর মতো এ মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করেছিল আগের সভ্যতাগুলোও। অবধারিতভাবেই একসময় সবার ভুল ধারণা ভাঙে, কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায় অনেক। একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামানো যায় না অবক্ষয়ের চেইন রিঅ্যাকশান। অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের সাথে সাথে কমতে থাকে সামাজিক শক্তি। কমতে থাকে সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের সক্ষমতা। ক্রমশ কমতে থাকে সমাজের মানুষের সংহতি, দৃঢ়তা ও আগ্রাসী মনোভাব। আর একবার এই অবস্থায় পৌঁছবার পর সভ্যতার পতন ঘটে দুটি উপায়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে–অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ।

আনউইন উপসংহার টানেন, বিয়ে-পূর্ববর্তী ও বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতা এবং অবাধ ও বিকৃত যৌনাচার যে সমাজে যত বেশি সে সমাজের সামাজিক শক্তি তত কম। যৌনতার ওপর যে সমাজ যত বেশি বাধানিষেধ আরোপ করে, তার সামাজিক শক্তি তত বাড়ে। এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সমাজ হলো যেখানে যৌনতা এক বিয়েকেন্দ্রিক পরিবারের (Heterosexual Monogamy) মধ্যে সীমাবদ্ধ। আনউইনের মতে ৫,০০০ বছরের ইতিহাসজুড়ে, প্রতিটি সভ্যতা ও সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য।

> *'যেকোনো সমাজকে সামাজিক শক্তি অথবা যৌন স্বাধীনতার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আর এর পক্ষে প্রমাণ হলো কোনো সমাজ এক প্রজন্মের বেশি এ দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে পারে না।'*[১৩৪]

আনউইনের এই উপসংহারকে বিভিন্নভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তবে ফিতরাহর ওপর থাকা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের জন্য সত্যটা স্পষ্ট। এই উপসংহার বিস্ময়কর–বিস্ময়ের কারণ হলো এত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই চক্রের পুনরাবৃত্তি চলছে। কিন্তু এ উপসংহার অপ্রত্যাশিত না। আসুন দেখা যাক, আনউইনের গবেষণা থেকে আসলে আমরা কী কী জানতে পারছি।

---

[১৩৪] আনউইন, ১৯৩৪, সেক্স অ্যান্ড কালচার

সমাজে ফাহিশা (অশ্লীলতা ও বিকৃতি) ও যিনা বাড়লে ভাঙন ধরে পরিবার এবং মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোতে। এর প্রভাব পড়ে সামাজিক সংহতি এবং সমাজের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির ওপর। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করে সমাজ। প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সমাজ ও সভ্যতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে অপরিবর্তনীয় কিছু নিয়মাবলি। পার্থক্য হলো প্রকৃতির ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই নিয়মগুলোর অস্তিত্ব আমরা ধরতে পারি। সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটা সহজ হয় না। কিন্তু যিনি জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্মের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তিনিই বেঁধে দিয়েছেন মানবসমাজ ও সভ্যতার নিয়মগুলোও। আর তাই এই নিয়ম ভঙ্গ করার পরিণতি আছে। নৈতিকতা, যৌনতার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা, তার অবাধ্য হওয়া শুধু ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে না; বরং প্রভাব ফেলে পরিবার, সমাজ ও প্রজন্মের ওপর। এর মূল্য চোকাতে হয় সবাইকে। আল্লাহ অনুমোদন দেননি এমন যেকোনো যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া ও মেনে নেয়া নিস্তেজ করে সমাজের উদ্যম, অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে। শুরু হয় এক চেইন রিয়্যাকশন। ক্রমশ বেড়ে চলা বিকৃতির প্রতি শূন্য হতে শুরু করে মানুষ অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া। এক সময় বিকৃতি পরিণত হয় প্রচলন ও প্রথায়।

বর্তমান

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু বোকা মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। চিনতে পারে না অবক্ষয়ের কালে সভ্যতার পচন ও আসন্ন পতনকে।

আজ বিশ্বজুড়ে যে যৌন উন্মাদনা, বিভিন্ন ধরনের যৌনবিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ, আদর্শিক ও আইনি বৈধতা দেয়ার প্রবণতা আমরা দেখছি তা ইঙ্গিত দেয় সেই একই পরিণতির পুনরাবৃত্তির। অন্য সভ্যতাগুলোর মতোই আমাদের এ যৌন উন্মাদনা হলো সভ্যতার অবক্ষয় ও আসন্ন পতনের চিহ্ন। বিশেষ করে পুরুষত্বের ধারণাকে আক্রমণ করা এবং অ্যান্ড্রোজিনির (হাল আমলের ট্র্যান্সজেন্ডার আন্দোলন) এর দিকে যাবার প্রবণতা চরম পর্যায়ের অবক্ষয়ের চিহ্ন।

বর্তমান সময়ের পশ্চিমের ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা নিয়ে খুব সুন্দর বলেছেন ক্যামিল পা'লিয়া। মহিলার প্রথম বই ছিল পশ্চিমা সভ্যতার শিল্পের ইতিহাসে অবক্ষয়– বিশেষভাবে যৌন অবক্ষয় নিয়ে।[১৩৫] পা'লিয়ার মতে প্রত্যেক বড় বড় সভ্যতার মধ্যে এ চক্র দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে মহিমান্বিত করা হয় পুরুষত্বকে।

---

[১৩৫] Sexual Personae, Camille Paglia (1990)

কিন্তু অবক্ষয়ের পর্যায়ে সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে পুরুষত্বের বদলে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। রোমান সভ্যতার শুরুর দিকের ভাস্কর্যগুলো যুদ্ধংদেহী, অ্যালফা-মেইল (Alpha Male)। শেষের দিকে জয়জয়কার আঁকাবাঁকাভাবে দাঁড়ানো মেয়েলি ডেইভিডদের। বিভিন্ন সভ্যতার ক্ষেত্রে এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি হয়। অবক্ষয়ের পর্যায়ে এসে সভ্যতাগুলোর মধ্যে পুরুষত্ব, পরিবার, যৌনসংযমের বদলে মহিমান্বিত করা হয় যৌনবিকৃতিকে। হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটে সমকামিতা, উভকামিতা, অজাচার, পশুকামিতা, স্যাইডোম্যাসোকিযম, বন্ডেজ, জেন্ডার গেইমসসহ বিভিন্ন যৌনবিকৃতির। বিকৃত আচরণগুলো অর্জন করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।

অবশ্য ওই সভ্যতার মানুষ এগুলোকে অবক্ষয় ও পতনের চিহ্ন হিসেবে দেখে না; তাদের কাছে এগুলোকে মনে হয় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। অ্যারিস্টোক্র্যাটিক, অভিজাত মুক্তচিন্তা। যৌনতার ব্যাপারে এমন মুক্তবাজারি দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা সংজ্ঞায়িত করে প্রগতি আর উন্নতির নামে। এটাকেই তারা মনে করে সভ্যতার মাপকাঠি। কিন্তু ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে দেখা যায়, এই সভ্যতা আসলে তার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়া সভ্যতা এবং এ সভ্যতার নাগরিকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে নিজ শরীর ও সত্তার ব্যাপারে। এ সভ্যতা নিজের পুরুষত্বকে প্রশ্ন করছে, প্রশ্ন করছে নিজের পরিচয়কে। যা কিছুর মাধ্যমে সভ্যতা একসময় মাহাত্ম্য অর্জন করেছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তার ছিটেফোঁটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু অবক্ষয়কালের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে এর সাথে সব সম্পর্ক।

পশ্চিমের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে কথাগুলো খাপে খাপে মিলে যায়, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটছে। এ অবক্ষয়ের শুরুটা হয়েছে সেক্সুয়াল রেভুলুশানের মাধ্যমে যখন একটি প্রজন্ম নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিক দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আগের প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এবং সব ধরনের বাঁধন খুলে ফেলে যৌনতাকে দিয়েছে মানুষের ওপর অনিয়ন্ত্রিত রাজত্ব। পশ্চিমে এ ব্যাপারটা ঘটেছে ষাট ও সত্তরের দশকে। আর আমাদের মতো 'মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাওয়াদের' ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে এখন। যার সাক্ষ্য দেয় আমাদের সমাজে এখন চলা যিনা, গর্ভপাত, পরকীয়া, সমকামিতা, পর্নোগ্রাফি এবং ধর্ষনের নীরব মহামারি।

এ সভ্যতা, যা আমরা মুসলিমরা বেছে নিইনি, যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে–আমরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যাকে ভালোবাসতে এবং এ ভালোবাসাকে উন্নতি ও প্রগতি মনে করতে শিখেছি–তা আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায়। ৫,০০০ বছরের ইতিহাস তা-ই বলে। পতনোন্মুখ এক সভ্যতার শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি আমরা। পেছনে

তাকিয়ে দেখুন। দেখুন ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, রোম আর বাইনযেন্টাইনের ইতিহাস। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই একই চক্রের, একই প্যাটার্নের। কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত, এত অসুস্থভাবে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপরিচয়ের সংকটে এতটাই নিমগ্ন যে, পচনের গন্ধ আমরা টের পাই না। পতনের শব্দ শুনতে পাই না। বর্তমানমুগ্ধতা আর ক্ষমতার উপাসনা করার প্রবণতা অন্ধ করে রেখেছে আমাদের। আমরা এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি যে ক্যানভাস, কাগজ আর রঙের খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মূল ছবিটা দেখতে পারছি না। আমাদের ঘোরলাগা চোখে রঙের বিস্ফোরণ ধরা পড়ে, কিন্তু ধরা দেয় না বাস্তবতার অবয়ব।

এ সভ্যতার সাথে মানিয়ে নেয়ার আমাদের সব 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম' চেষ্টা, যেগুলোকে আমরা 'প্রগতি' আর 'বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ' বলি–পশ্চিমের অনুকরণ, পশ্চিমের ছাঁচে ইসলামকে নতুনভাবে ফ্রেইম করা, সবকিছুকে ধরে ধরে ইসলামীকরণ করার আমাদের মহাকৌশলী পরিকল্পনা, 'ইসলামী' গণতন্ত্র আর ব্যাংকিংয়ের মতো ধারণাগুলোর বৈধতা দেয়ার কূটতর্কের কারুকাজ, পদে পদে পশ্চিমের সাথে মানিয়ে নিতে নিতে নিজেকে বদলে ফেলা–এসবই হলো এমন এক দালানকোঠার দেয়াল রং করার মতো, যা এরই মধ্যে আগুনে পুড়ে ধসে পড়তে শুরু করেছে।

ভবিষ্যৎ

চূড়ান্ত পরিণতি কী?

কী অপেক্ষা করছে এ সভ্যতার জন্য?

আমরা অবশ্যই ভবিষ্যৎ জানি না, কিন্তু ৫,০০০ বছরের ঐতিহাসিক প্যাটার্ন থেকে একটা ধারণা করা যায়।

১) অরাজকতাপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা, অথবা

২) অধিকতর সামাজিক শক্তির অধিকারী আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ

যৌনাচারের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখন দেখছি অবধারিতভাবেই তা এমন এক বিভ্রান্ত প্রজন্মের জন্ম দেয় যারা না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পারে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে। অবক্ষয়, অবনতি, অরাজকতা, অযোগ্যতা আর ভীতসন্ত্রস্ত নিষ্ক্রিয়তার এক চক্রে আটকা পড়ে সভ্যতা। আত্মপরিচয়ের সংকটে ঘুরপাক খাওয়া আত্মরতিতে নিমগ্ন ভোগবাদী প্রজন্মের ঘোরলাগা চোখের সামনে খুলে আসে সমাজের বাঁধন। ধসে পড়তে শুরু করে সভ্যতা।

অথবা এমন কোনো জাতির আবির্ভাব ঘটে যারা ত্বরান্বিত করে একসময়কার শক্তিশালী ও গর্বিত কিন্তু বর্তমানে অধঃপতিত জাতির পতনকে, পরিপূর্ণ করে ধ্বংসপ্রক্রিয়াকে। বারবেরিয়ান, ভিসিগথ, হান, মঙ্গোল, ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব বেদুইন।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অবক্ষয়কালে কারা হবে এই আগ্রাসী বাহ্যিক শত্রু?

আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের বহু আগেই সভ্যতার পালাবদল আর জাতিগুলোর উত্থানপতনের চক্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইসলামী ইতিহাসের মহিরুহ ইবনু খালদুন। আগ্রাসী ও বিজয়ী জাতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা আল-মুক্বাদিমাতে।

ইবনু খালদুনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা হলো সামাজিক সংহতি। এটি হলো সেই বন্ধন যা একটি সমাজের মানুষের মধ্যে তৈরি করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহায়তার মনোভাব। এ বন্ধন মানুষকে জোগায় প্রতিকূলতার মোকাবেলা আর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি। সাধারণত এ বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী হয় গোত্রীয় সমাজগুলোতে। কারণ, এ সমাজগুলোর ভিত্তি হয় রক্ত-সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার বন্ধন। তবে এরচেয়েও শক্তিশালী বন্ধন হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় খুব অল্পসংখ্যক মুসলিমরা পরাজিত করতে পেরেছিলেন গোত্রীয় আরব মুশরিকদের। সামাজিক সংহতির এ ধারণার আলোকেই ইতিহাসের চক্রকে ইবনু খালদুন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

শক্তিশালী সামাজিক সংহতি-সম্পন্ন জাতি আক্রমণ করে বিলাসব্যসনে মগ্ন, আধুনিক, শহুরে সভ্যতাকে। অধিকাংশ সময় এ আক্রমণকারীরা হয় রুক্ষ, যাযাবর, দরিদ্র। তাদের থাকে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বন্ধন, অধিকতর প্রাণশক্তি, মনোবল এবং তুলনামূলকভাবে অল্প বৈষয়িক সম্পদ। অন্যদিকে প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক হলেও জীবনের প্রতি নির্লিপ্ত উদাসীনতা আর আধ্যাত্মিক আলস্যে ভোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী। নিজেদের রক্ষা করার মতো সামাজিক সংহতি আর যুদ্ধংদেহী মনোভাব থাকে না তাদের। সুবিধাজনক শহুরে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে এসবের প্রয়োজনও হয় না। তারা ব্যস্ত থাকে সস্তা সুখের নানা আয়োজনে, ভোগ আর অবক্ষয়ে।

অবধারিতভাবেই আক্রমণকারীরা বিজয়ী হয়, স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য। তারপর একসময় তারাও গা ভাসিয়ে দেয় সহজ জীবনের সহজিয়া আনন্দের স্রোতে। ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে তাদের সংহতি আর নৈতিক শক্তি, ভাঙন ধরে সমাজে। দিগন্তে উদয় হয় নতুন কোনো জাতি, নতুন কোনো আক্রমণকারী। চলতে থাকে পালাবদলের চক্র।

ইবনু খালদুন এর ভাষায়,

'...বিলাসব্যসন চরিত্রের মধ্যে নানা প্রকার দোষ, শৈথিল্য ও বদভ্যাসের জন্ম দেয়... সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সেই সচ্চরিত্র অন্তর্হিত হয়, যা একসময় তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য গুণ ও নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তা ত্যাগ করে তারা যখন অসৎ চরিত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই ক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আল্লাহর সৃষ্টিতে এ নিয়মই বিদ্যমান। ফলে সাম্রাজ্যে ধ্বংসের প্রারম্ভ সূচিত হয়ে তার অবস্থা বিশৃঙ্খল হয় ওঠে এবং তার মধ্যে ক্ষয়ের সেই সুপ্রাচীন ব্যাধি দেখা দেয়, যাতে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।'[১০৬]

নগরবাসীরা সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসব্যসন, পার্থিব উন্নতি লাভের আশা ও তাকে ভোগ করার স্পৃহা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এর ফলে তাদের জীবাত্মা অসৎ চরিত্র ও অন্যায় প্রসঙ্গের মধ্যে কলুষিত হয়ে ওঠে। এভাবে তারা যতই তাতে নিমজ্জিত হয়, ততই সৎপথ ও ন্যায়পন্থা থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি এর ফলে তাদের মধ্যকার সংযমের আচার-আচরণও তাদের অবস্থাগুলোতে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে।[১০৭]

(বর্বর গোত্রগুলো) প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অন্যদের নিকট যা কিছু আছে, তা ছিনিয়ে নিতে অধিকতর পারঙ্গম। যখনই তারা প্রাচুর্যের সাথে পরিচিত হয় এবং সচ্ছলতার মধ্যে জীবনের ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হয়, তখনই তাদের প্রান্তরবাস ও বন্যপ্রকৃতি হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে তাদের শৌর্যবীর্যও হ্রাস পায়।[১০৮]

ইবনু খালদুনের এ বিশ্লেষণ থেকে বিজয়ী জাতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। তারা হবে অধিকতর সামাজিক সংহতি, নৈতিক ও প্রাণশক্তির অধিকারী। অতি সংবেদনশীল আধুনিক রুচির বিচারে সম্ভবত একটু বেশি রুক্ষ ও কর্কশ। আমাদের কাছে তাদেরকে মনে হতে পারে পশ্চাৎপদ, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাদামাটা এমনকি উগ্র। মূল্যবোধ ও যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা কঠোর সংযমী, কট্টর। সভ্যতার বিলাসব্যসন, অবক্ষয় ও অধঃপতনের বিষ থেকে মুক্ত। যুদ্ধংদেহী,

---

[১০৬] 'রাজশক্তির স্বভাব যখন গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয়',আল মুকাদ্দিমা, ইবনু খালদুন।

[১০৭] 'প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী', প্রাগুক্ত

[১০৮] 'বর্বর জাতিগুলো প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান', প্রাগুক্ত

বেপরোয়া, লড়াকু, কষ্টসহিষ্ণু।

এখানে যে বিষয়টা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, অধঃপতিত সভ্যতাকে যারা জয় করে তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধিকতর সংহতি ও সামাজিক শক্তির কারণে বিজয়ী হয়। নিছক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, অর্থনীতি কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হবার কারণে না। তাদের বিজয়ের কারণ হলো ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া। এ কারণেই অ্যামেরিকার পতনের পর বিশ্বমঞ্চে প্রধান শক্তি ও নতুন সাম্রাজ্য হিসেবে চীন কিংবা রাশিয়ার আবির্ভাবের ব্যাপারে অনেকের প্রচার করা ও পছন্দের বিশ্লেষণ ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের সাথে মেলে না। অ্যামেরিকার পতন হলে চীন এবং রাশিয়ার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব নিঃসন্দেহে বাড়বে। একটা সময় পর্যন্ত, একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়। কিন্তু শতবর্ষের নতুন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা তারা গড়ে তুলবে পারবে বলে মনে হয় না। সভ্যতার পতন ও রূপান্তরের পর্যায়ে বড়জোর সাময়িক একটা ভূমিকা থাকতে পারে তাদের। কারণ, যে দুর্বলতাগুলো আধুনিক পশ্চিমে বিদ্যমান সেগুলো বিদ্যমান চীন এবং রাশিয়াতেও। এ যৌনবিকৃতি, এ উন্মাদনা, সামাজিক সংহতি ও শক্তির এ দারিদ্র্য থেকে তারা মুক্ত না। আজকের চীন এবং রাশিয়াকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা বলা যায় না। চীন ও রাশিয়া আধুনিক পশ্চিমের মতো ইউরোপীয় শেকড় থেকে বের হয়ে আসেনি, তাদের আছে হাজার বছরের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এটুকু পার্থক্য আছে। কিন্তু এ পার্থক্য কেবল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত। আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বস্তুবাদী, ভোগবাদী, আত্ম-উপাসনায় মগ্ন আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অধিবাসীদের সাথে চীন কিংবা রাশিয়ার খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই যুক্তি বলে এভাবে চললে তাদের পরিণতিও অভিন্ন হবার কথা।

একইভাবে এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী পশ্চিমের চিন্তা ও পদ্ধতিগত অনুকরণ করে চলা মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন আন্দোলনগুলোর কাছ থেকেও বিজয়ের আশা করা যায় না। কারণ, এ আন্দোলনগুলো সভ্যতার ব্যাধি থেকে মুক্ত না, হতেও চায় না। বরং এ ধরনের চিন্তার লক্ষ্য হলো আরও বেশি করে চলমান বিশ্বব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো, সিস্টেমের অংশ হওয়া। তারা সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম না। এবং ধীরে হলেও তারাও একসময় অবধারিতভাবে আক্রান্ত হবে সভ্যতার সুপ্রাচীন ব্যাধিতে। যার অনেক বাস্তব প্রমাণ এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আবারও বলছি, আমরা ভবিষ্যৎ জানি না; গ্বাইবের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই। ইবনু খালদুনসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের তুলে ধরা বিশ্লেষণ সভ্যতার পালাবদলের ব্যাপারে আমাদের একটা জেনারেল থিওরি দেয়। কিন্তু প্রতিটি জাতির উত্থানপতন আর

ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকের পেছনে সক্রিয় থাকে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর। তাই মূল তত্ত্ব থেকে এদিক-সেদিক হতে পারে, হওয়াটাই স্বভাবিক। কিন্তু সার্বিকভাবে এ প্যাটার্ন টিকে থাকার কথা। সেই সাক্ষ্যই দেয় ৫,০০০ বছরের ইতিহাস। পাশাপাশি ৩০ বছরের ব্যবধানে আধুনিক চোখে রুক্ষ, উগ্র, যাযাবর, পশ্চাৎপদ কিছু মানুষের হাতে পরপর তিনটি যুদ্ধে আমাদের সময়ের দু-দুটো সুপারপাওয়ারের বিস্ময়কর পরাজয়ও সভ্যতার এ অমোঘ পালাবদলের প্রাথমিক পর্বের ইঙ্গিত দেয় কি না, সে প্রশ্নও করা যায়।

আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত আসার আগে এ প্রশ্নগুলোর নিশ্চিত কোনো উত্তর দেয়া সম্ভব না। বাস্তবতার আলোকে নিজস্ব বিবেচনাবোধ অনুযায়ী সম্ভাব্য উত্তরগুলো থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে আমাদের। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, পতনের কালে বেঁচে আছি আমরা। আমরা বেঁচে আছি মহাকাব্যিক পটপরিবর্তনের সময়ে, যখন সবকিছু ভেঙে পড়ে আর তারপর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতার নতুন সৌধ। কালের অমোঘ স্রোতে হারিয়ে জেতে না চাইলে ইতিহাসের ভাঙাগড়ার এ পর্বে, এ অবক্ষয়কালে একটা পক্ষ আমাদের বেছে নিতেই হবে।

শ্বেত সন্ত্রাস

১.

১৯শে এপ্রিল, ১৯৯৫। অ্যামেরিকা।

ঝলমলে স্নিগ্ধ সকাল।

পরিষ্কার আকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে স্থির হয়ে থাকা সাদা মেঘ।

নগরের যান্ত্রিক কোলাহল তখনো জেঁকে বসেনি শান্ত সকালটার ওপর।

আটটা পঞ্চাশের দিকে শহরে ঢুকল একটা সাদা ফোর্ড এফ-৭০০ ট্রাক। মেইন রোড ধরে অলস গতিতে এগোল শহরের মাঝ বরাবর দাঁড়ানো মারে বিল্ডিংয়ের দিকে। ৯ তলা উঁচু সরকারি ভবনটাতে তখন শুরু হয়ে গেছে আরেকটা কর্মব্যস্ত দিনের তোড়জোড়। ৮.৫৭ এর দিকে একটা পাঁচ মিনিটের ফিউয জ্বালালো ট্রাকের চালক। ঠিক তিন মিনিট পর, টার্গেট থেকে এক ব্লক দূরে থাকা অবস্থায় জ্বালালো আরেকটা ফিউয, এবারেরটা দু-মিনিটের। বিল্ডিংয়ের ভেতর ডে-কেয়ার সেন্টারের নিচের ড্রপ অফ যোনে ট্রাকটা পার্ক করে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নামল। শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ট্রাকের দরজা লক করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে। অল্প সময়ে টার্গেটের আর নিজের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য গেট থেকে বেরিয়ে এগোল কোনাকুনি।

৪,৮০০ পাউন্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোমিথেন আর ডিসেল মিক্সচার নিয়ে যখন ট্রাকটা বিস্ফোরিত হলো ঘড়িতে তখন নটা বেজে দু-মিনিট। ট্রাকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে তৈরি হলো ৩০ ফুট চওড়া ৮ ফুট গভীর খাদ। চুরমার হয়ে স্রেফ উধাও হয়ে গেল মারে বিল্ডিংয়ের এক-তৃতীয়াংশ। ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে

গেল আশেপাশের ২৫৮টা বিল্ডিংয়ের সব কাচ। শুধু ভাঙা কাচের উড়ন্ত ঝড়েই মারা পড়ল ৮ জন মানুষ। বিস্ফোরণের ৪ ব্লক রেডিয়াসের মধ্যে নানান মাত্রায় ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলো আরও ৩২৪টা বিল্ডিং। পুড়ল আশেপাশের ৮৬টা গাড়ি। পরে জানা যাবে, বিস্ফোরণের কারণে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬৫২ মিলিয়ন ডলার। ৫,০০০ পাউন্ড টিনএনটির শক্তি নিয়ে বিস্ফোরিত হওয়া ট্রাকবোমার শব্দ ও শক্তি অনুভূত হলো ৫৫ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত। বিস্ফোরণস্থল থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরের সিসমোগ্রাফে ধরা পড়ল রিখটার স্কেলে ৩.০ মাত্রার কম্পন। দিন শেষে জানা গেল ডে-কেয়ার সেন্টারের ১৯ শিশুসহ নিহত হয়েছে মোট ১৬৮ জন, আহত ৬৮০।

৯৫ এর ওকলাহোমা সিটি বম্বিং।

৬ বছর পর সেপ্টেমবরের এক সকালে হাইজ্যাক করা চারটি যাত্রীবাহী বিমান নিয়ে অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক আর সামরিক কেন্দ্রে ১৯ যুবকের ইতিহাসের মোড় ঘোরানো হামলার আগে এ ঘটনা ছিল অ্যামেরিকার মাটিতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলা।

এফবিআই এর ভাষ্য অনুযায়ী ওকলাহোমা সিটির বোমা হামলার পেছনে ছিল উপসাগরীয় যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য বেশ অনেকগুলো সামরিক পদক পাওয়া ২৭ বছর বয়সী সাবেক আর্মি সার্জেন্ট টিমোথি ম্যাকভেই এবং তার দুই সহযোগী। হামলার দিন ওর পরনের টি শার্টে লেখা ছিল দুটো বিখ্যাত উক্তি। প্রথমটা ল্যাটিন, ভার্জিনিয়া রাজ্যের অফিশিয়াল মোটো,

> *'Sic semper tyrannis (Thus always to tyrants)'*
>
> *'স্বৈরাচারীদের প্রাপ্য সর্বদা এমনই হয়।'*

বলা হয়ে থাকে জুলিয়াস সিযারকে হত্যা করার সময় ব্রুটাস এ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল। অ্যাব্রাহ্যাম লিঙ্কনকে গুলি করার পরপর জন উইলক্স বুথও নাকি চিৎকার করে বলেছিল একই কথা।

পরের কথাটা খাঁটি অ্যামেরিকান। অ্যামেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের বিখ্যাত উক্তি,

> 'The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants'
>
> *'স্বাধীনতার বৃক্ষকে মাঝে মাঝে পুনরুজ্জীবিত করতে হয় দেশপ্রেমিক আর স্বৈরাচারীদের রক্ত দিয়ে।'*

ম্যাকভেইয়ের হামলার টার্গেট ছিল মার্কিন সরকার, উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আর্মি ছেড়ে আসা ম্যাকভেইয়ের চোখে মার্কিন সরকারব্যবস্থা ক্রমশ পরিণত হচ্ছিল এক নব্য স্বৈরতন্ত্রে। এমন ধারণার হবার মতো যথেষ্ট কারণও ছিল। ১৯৯৩ এ টেক্সাসের ওয়েইকোর এক কম্পাউন্ডে হামলা চালায় অ্যামেরিকান সরকার ও সেনাবাহিনী। কম্পাউন্ডটি ছিল মাউন্ট কারমেল নামের এক র‍্যাঞ্চের অংশ। প্রটেস্ট্যান্ট ধারার এক ধর্মীয় সংগঠন ঘাঁটি গেড়েছিল এখানে। নিজেদের ওরা পরিচয় দিত ব্র্যাঞ্চ ডাভিডিয়ানস নামে। নেতা হিসেবে মানতো ৩৩ বছর বয়সী ডেইভিড কোরেশকে। অনুসারীদের চোখে ডেইভিড ছিল ঈশ্বরপ্রেরিত নতুন মেসায়াহ (মসীহ)। ব্র্যাঞ্চ ডাভিডিয়ানদের বিশ্বাস ছিল কিয়ামত অত্যাসন্ন, আসন্ন মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওরা।

ডেইভিড কোরেশের বিরুদ্ধে যৌননির্যাতন এবং অবৈধ অস্ত্র মজুদ করার অভিযোগ তলিয়ে দেখতে ওয়ারেন্ট নিয়ে ওয়েইকোতে হাজির হয় মার্কিন সরকারি সংস্থা এটিএফ (ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোবাকো অ্যান্ড ফায়ারআর্মস)। কোরেশের পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়া হলেও সরকারি বাহিনী সিদ্ধান্ত নেয় সশস্ত্র অভিযান চালানোর। ট্যাংক, হেলিকপ্টার এবং সম্পূর্ণ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালানো হয় মাউন্ট কারমেলে। ব্র্যাঞ্চ ডাভিডিয়ানরা প্রতিরোধ করে। ৫১ দিনের অবরোধ ও লড়াইয়ের পর সরকারি বাহিনীর আক্রমণে মারা যায় ২৪ জন শিশুসহ মোট ৭৬ জন। দিনটি ছিল ১৯৯৩ এর ১৯ এপ্রিল। ওকলাহোমা সিটির বোমা হামলার ঠিক দু' বছর আগের ঘটনা।

ব্র্যাঞ্চ ডাভিডিয়ানদের বিশ্বাসের সাথে একমত না হলেও ওয়েইকোর ঘটনাকে ম্যাকভেই দেখে সরকারের চরম মাত্রার সীমালঙ্ঘন, মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও আগ্রাসন হিসেবে। শুধু ম্যাকভেই না, সারা অ্যামেরিকাজুড়ে আরও অনেকের চোখেই এ ঘটনা ছিল মার্কিন সংবিধানের মূল চেতনাকে ছুড়ে ফেলা এবং স্বাধীনচেতা নাগরিকদের ওপর আশঙ্কাজনক গতিতে আধিপত্য বিস্তার করা এক নব্য স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসনের নমুনা। এমন এক স্বৈরতন্ত্র যা গ্লোবালিস্টদের স্বার্থ রক্ষা করে আর নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। ম্যাকভেই-এর ভাষ্যমতে ওকলাহোমার বোমা হামলার পেছনে মূল কারণ ছিল তিনটি,

> ওয়েইকো এবং তার এক বছর আগে আইডাহোর রুবি রিজে ঘটে যাওয়া একই রকম আগ্রাসনের প্রতিশোধ।

স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের মোকাবেলায় অ্যামেরিকানদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা।

বিশ্বজুড়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক আগ্রাসনের বাস্তবতা অ্যামেরিকার সামনে তুলে ধরা।

সীমালঙ্ঘনকারী স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সহিংসতার ব্যবহারকে সমর্থন করে ম্যাকভেই বলে, অনিয়ন্ত্রিত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এধরণের হামলা 'বৈধ'[১৩৯]। টার্গেট হিসেবে সরকারি ভবনকে বেছে নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকভেই জানায়, 'আগ্রাসী শত্রু যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘাঁটি থেকে বারবার আক্রমণ করে তখন সঠিক সামরিক কৌশল হলো শত্রুকে তার ঘাঁটিতে আক্রমণ করা।'[১৪০] মারে বিল্ডিংয়ে অফিস ছিল এটিএফ, এফবিআই এবং ডিইএ-এর; পাশাপাশি ছিল অ্যামেরিকান সিক্রেট সার্ভিস এবং ইউএস মার্শাল সার্ভিস এজেন্সির অফিসও।[১৪১]

আত্মপক্ষ সমর্থনে ম্যাকভেই বলল,

'নৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে মারে বিল্ডিংয়ের ওপর বোমা হামলা সার্বিয়া, ইরাক কিংবা অন্য কোনো দেশের সরকারি ভবনের ওপর অ্যামেরিকার চালানো বোমা হামলার সমতুল্য। আমার নিজের দেশের সরকারের নীতিগুলো মূল্যায়নের পর আমার কাছে এই হামলাকে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওকলাহোমা সিটিতে যা হয়েছে তা অন্যান্য দেশের মানুষের ওপর অ্যামেরিকার বোমাবৃষ্টির চেয়ে আলাদা কিছু না।

ডে কেয়ার সেন্টারের ১৯ শিশুর মৃত্যু, ট্রাক বোমার ব্যবহার আর বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার নৈতিকতা ব্যাখ্যা করে ম্যাকভেই বলে,

'ওকলাহোমা সিটিতে রাস্তা আর সরকারি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অফিসের মাঝখানে একটা ডে-কেয়ার সেন্টারের অবস্থানের কারণ ছিল সুবিধা। কিন্তু যখন ইরাকের কথা আসে, যখন ইরাকের কোনো সরকারি ভবনে ডে-কেয়ার সেন্টার থাকে তখন সেটা হয়ে যায় 'মানববর্ম'। ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। এসব বাস্তবতার আলোকে নৈতিকতা এবং 'mens rea' (অপরাধের ইচ্ছা) এর ব্যাপারে

---

[১৩৯] *Mcveigh Hints At Some Regrets, The Buffalo News*, June 10, 2001

[১৪০] *Terrorist Attacks on American Soil: From the Civil War Era to the Present*, J. Michael Martinez, p 306

[১৪১] *American Terrorist. Scientific American*. Michel, Lou; Dan Herbeck (2001). 284. p. 167.

আমি জানতে চাই, সত্যিকারের বর্বর কারা?

ইরাকে বোমা ফেলার জন্য যেসব বিমান ব্যবহৃত হয়েছিল তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'দা স্পিরিট অফ ওকলাহোমা', কী বিচিত্র! যখন মার্কিন বিমান অথবা ক্রুয মিসাইল ভিনদেশি মানুষের ওপর ধ্বংস বয়ে নিয়ে যায় তখন এই জাতি সেই আক্রমণকারীকে প্রশংসা আর বাহবায় ভাসায়। খুনিদের চালানো ধ্বংসযজ্ঞের দায়মুক্তির কত সুন্দর উপায়!

কিন্তু দুঃখজনকভাবে খুনের নৈতিকতা এতটা সোজা, এতটা বাহ্যিকতা নির্ভর না। সত্য কথা হলো, বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রাক, বিমান কিংবা মিসাইলের ব্যবহারের কারণে কাজটার মৌলিক প্রকৃতি বদলায় না। দিন শেষে এগুলো সবই বিধ্বংসী অস্ত্র এবং এসব অস্ত্র ঠিক কীভাবে পৌঁছানো হচ্ছে তার কোনো মূল্য ওই সব মানুষের কাছে নেই, যাদের ওপর এসব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

তোমরা স্বীকার করতে চাও বা না চাও, অন্য কোনো দেশে মার্কিন বোমা হামলার নৈতিক অনুমোদন দেয়ার মাধ্যমে তোমরাই ওকলাহোমা সিটিতে একই রকম হামলার অনুমোদন দিয়ে দিয়েছ।"[১৪২]

ক্যাথলিক পরিবারের জন্ম নিলেও ম্যাকভেই-এর ভাষ্যমতে সে নিজ ধর্মের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিল। ২০০১ এর জুনে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার এক দিন আগে লেখা এক চিঠিতে ম্যাকভেই নিজের পরিচয় দেয় একজন অ্যাগনস্টিক বা সংশয়বাদী হিসেবে। তবে ম্যাকভেই-এর হামলা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ধর্মীয় কোনো বিশ্বাস না থাকলেও কাজ করছিল অন্য এক মতাদর্শ। মার্কিন সেনাবাহিনী ছেড়ে আসার পর ম্যাকভেই যোগ দেয় নতুন এক বাহিনীতে যার নাম আরইয়ান রিপাবলিকান আর্মি (আর্য প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী)।[১৪৩] ওকলাহোমা সিটির বোমা হামলার ব্যাপারে মার্কিন আদালত এবং এফবিআই এর অফিশিয়াল উপসংহারের ব্যাপারে সন্দিহান অনেকে আজও বিশ্বাস করে শুধু ম্যাকভেই না, এ হামলার সাথে জড়িত ছিল আরও অনেকে, বিশেষ করে আরইয়ান আর্মির সদস্যরা।[১৪৪] সেই সন্দেহকে জোরালো করে সত্তরের দশকে প্রকাশিত 'দা টার্নার ডাইরিস' নামের একটি উপন্যাস। একদিন সকাল ৯.১৫ মিনিটে এফবিআই এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ট্রাক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অ্যামেরিকাজুড়ে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া একদল শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের

[১৪২] McVeigh, Timothy J. (June 1998). "*An Essay on Hypocrisy*"
[১৪৩] Profile: Peter Kevin Langan, History Commons
[১৪৪] Evidence: White Racists Aided Mcveigh, https://bit.ly/2PtCZot

ঘিরে আবর্তিত হয় 'দা টার্নার ডাইরিস' এর কাহিনি। কল্পিত এ ট্রাকবোমা হামলার পর শুরু হওয়া বিপ্লবে পতন হয় মার্কিন সরকারের, শুরু হয় বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের সাথে লড়াইয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দুনিয়ার সব অশ্বেতাঙ্গ।

এপ্রিলের সেই সকালে বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় টিমোথি ম্যাকভেই-এর সাথে রাখা খামে ছিল 'দা টার্নার ডাইরিস' এর কিছু পৃষ্ঠা।

২.

২২ শে জুলাই, ২০১১। নরওয়ে।

দুপুর সোয়া তিনটার সময় একটা সাদা ভোক্সওয়াগ্যান ক্র্যাফটার এসে দাঁড়াল অসলোর মন্ত্রীপাড়ার প্রধান ফটকের কাছাকাছি। অনিশ্চিতভাবে প্রায় দু-মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষমেশ নো এন্ট্রি সাইনটাকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে ভ্যানটা গিয়ে থামল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে পার্কিং লটে। পার্ক করা ভ্যান থেকে বের হয়ে আসার পর দেখা গেল পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরে আছে ড্রাইভার। মুখ ঢাকা কালো ফেইস-শিল্ডে, হাতে একটা সেমি-অটোম্যাটিক গ্লক ৩৪। গাড়ি থেকে বের হয়ে ৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করল ড্রাইভার, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল পার্কি লট থেকে। ভোক্সওয়াগ্যানের ভেতর রাখা বোমাটা বিস্ফোরিত হলো ঠিক ৩.২৫ মিনিটে। কিছুক্ষণের জন্য সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চারপাশ। আশেপাশের রাস্তাগুলো ঢেকে গেল ভাঙা কাচের গুঁড়ো আর বিল্ডিংগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ধ্বংসাবশেষে। মারা গেল ৮ জন মানুষ।

ঠিক দেড় ঘণ্টা পর উতায়কায়া নামের ফেরিঘাটে এসে পৌঁছল একটা ফিয়াট ডবলো ভ্যান। ভ্যান থেকে বের হল পুলিশের পোশাক পরা দুপুরের সেই লোকটা। ফেরিতে করে উতায়া দ্বীপে পৌঁছাতে সময় নিল আরও ২৩ মিনিট। দ্বীপটা অসলো থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। প্রতিবছরের মতো তখনো উতায়াতে চলছিল বামপন্থী লেবার পার্টির ছাত্র সংগঠনের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প। ক্যাম্পে অবস্থান করা ছয় শ'র মতো তরুণ-তরুণীদের মনে তখন চলছে অসলোর বোমা হামলা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা। ৫.২২ মিনিটে ওদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল আগন্তুক। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা ধরে সেমি অটোম্যাটিক রুগ্যার মিনি হাতে নির্বিকারভাবে ঘুরে ঘুরে গুলি চালাল ও। তাণ্ডব শেষে দেখা গেল দ্বীপজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ৬৯টা লাশ।

শেষমেশ পুলিশ আসার পর যখন ও আত্মসমর্পণ করল তখনও ওর কাছে রয়ে গেছে বেশকিছু অ্যামিউনিশান।

২২শে জুলাই ৭৭ জন মানুষকে খুন করা লোকটার নাম অ্যান্ডার্স বেরিং ব্রেইভিক। বয়স ৩২। জিজ্ঞাসাবাদে ব্রেইভিক জানায় প্রায় ৯ বছর ধরে এ হামলার পরিকল্পনা করছে সে। এর মধ্যে প্রথম ছয় বছর খরচ হয় হামলার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জমানোয়, পরের ৩ বছর ধরে চলে বাদবাকি প্রস্তুতি। রাইফেল এবং পিস্তল কেনে নরওয়ে থেকেই, বৈধভাবে। তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল বোমার উপকরণ জোগাড় করা। এ জন্য প্রথমে ২০০৯ সালে নিজের নামে একটা ফার্ম খোলে ব্রেইভিক। কাগজে-কলমে এ ফার্মে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি আর ফলমূলের চাষ হবার কথা। তারপর ২০১১-তে বোমা বানানোর উপকরণের জন্য ফার্মের নামে কেনে ছয় টন কৃত্রিম সার। এবারও বৈধভাবে। পোল্যান্ডের এক অনলাইন দোকান থেকে কেনে বোমার প্রাইমারগুলো। সব মালমশলা জোগাড় হয়ে যাবার পর মনোযোগ দেয় প্রশিক্ষণে। শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চলে 'অপারেশনের' জন্য টার্গেট প্র্যাকটিস এবং মানসিক প্রস্তুতি। এ জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে নিয়মিত প্লে-স্টেশনে 'কল অফ ডিউটি : মর্ডান ওয়ারফেয়ার টু' খেলতো ব্রেইভিক।

হামলার ঘণ্টা তিনেক আগে ১,০০৩টি ইমেইল অ্যাড্রেসে '২০৮৩ : ইউরোপীয় স্বাধীনতার ঘোষণা'[১৪৫] নামের প্রায় ১,৫০০ পৃষ্ঠার এক ম্যানিফেস্টো পাঠায় ব্রেইভিক। এ ম্যানিফেস্টো ভাষ্য অনুযায়ী এ হামলার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিবাসনের মাধ্যমে চলা ইউরোপের এবং বিশেষভাবে নরওয়ের 'ইসলামীকরণ' বন্ধ করা। মুসলিম অভিবাসীদের 'আগ্রাসন' এবং নারীবাদ ও বহুসংস্কৃতিবাদের (মাল্টিকালচারালিযম) বিষাক্ত প্রভাব থেকে ইউরোপকে বাঁচানো। হামলার টার্গেট হিসেবে সরকারি ভবন ও বামপন্থী দলের যুব সংগঠন বেছে নেয়ার কারণ হলো অভিবাসন নীতির জন্য সরকার দায়ী আর পুরো পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ফেমিনিযম ও মাল্টিকালচারালিযমের মতো দর্শনগুলোর প্রচার ও প্রসারের জন্য দায়ী কালচারাল মার্ক্সিযম এবং বামপন্থীরা। ফেমিনিযমের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে আশঙ্কাজনক হারে কমছে সাদা ইউরোপীয়দের জন্মহার। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউরোপের বামঘেঁষা রাজনীতিবিদদের অভিবাসন নীতির কারণে ক্রমশ বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা। কমতে থাকা জন্মহার আর বাড়তে থাকা মুসলিম–দুটো স্রোতের মিশেলে হুমকির মুখে পড়ে গেছে শ্বেতাঙ্গদের অস্তিত্ব। সাদা ইউরোপকে দখল করে নিচ্ছে বাদামি চামড়ার আরব

---

[১৪৫] 2083: An European Declaration Of Independence, Anders Behring Breivik

আর এশিয়ানরা। চলছে এক নীরব আগ্রাসন। ইউরোপ হারিয়ে ফেলছে নিজের আত্মপরিচয় এবং প্রতিরোধের ন্যূনতম স্পৃহা। কালচারাল মার্ক্সিস্টদের পাল্লায় পড়ে ইউরোপ বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। অতি দ্রুত শ্বেতাঙ্গরা পরিণত হতে যাচ্ছে ইউরোপের সংখ্যালঘুতে।

ব্রেইভিকের চোখে ইসলাম হলো পশ্চিমা সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি, আর ফেমিনিযম এবং মাল্টিকালচারালিযম হলো পশ্চিমকে ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাওয়া ক্যান্সার। এমন অবস্থায় ইউরোপকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হলো মুসলিমদের বিদায় করা এবং ফেমিনিযম, মাল্টিকালচারালিয ও এর প্রচারকদের ধ্বংস করা। ব্রেইভিক নিজেকে দেখে বিপর্যয়ের কালে স্রোতের বিপরীতে চলা আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবী হিসেবে। ক্রুসেইডার এবং নাইটস টেম্পলারদের পথে চলা এক নব্য নাইট, ইসলামী আগ্রাসন আর সাংস্কৃতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে যে ইউরোপকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। যাকে মানুষ আজ ঘৃণা করবে আর ভালোবাসবে আগামীতে। নিষ্ঠুর হলেও এ পতন থামানোর জন্য, এ বক্তব্য ইউরোপের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং সাদা মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য এ হামলার দরকার ছিল। ম্যানিফেস্টোতে এবং বিচার চলাকালীন সময় আদালতে, একাধিকবার ব্রেইভিক আশাব্যক্ত করে যে এ হামলা ও ম্যানিফেস্টো পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তার সমমনাদের উদ্বুদ্ধ করবে তারই মতো 'সক্রিয়' ভূমিকা গ্রহণ করতে।

ব্রেইভিকের আশা বিফলে যায়নি।

৩.

১৫ই মার্চ, ২০১৯। ক্রাইস্টচার্চ, নিউযিল্যান্ড।

দুপুরটা দেড়টার মিনিট পাঁচেক পর আন-নূর মসজিদের পাশের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা সুবারু আউটব্যাক। গাড়িটার প্যাসেঞ্জার সিটে রাখা তিনটে বন্দুক। চতুর্থ বন্দুকটা রাখা ড্রাইভারের সিট আর দরজার মাঝখানে। স্ট্রোভ লাইট লাগানো একটা এআর-১৫ সেমি অটোম্যাটিক রাইফেল। কারও দিকে ওটা তাক করলে ক্রমাগত জ্বলতে-নিভতে থাকা স্ট্রোভ লাইটের তীব্র আলোয় দিশেহারা হয়ে যাবে টার্গেট–বিশেষ করে অন্ধকার, সরু গলি, কিংবা হলওয়েতে। বন্দুকগুলোর গায়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে যত্নের সাথে লেখা হয়েছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মধ্যযুগের বিভিন্ন ইউরোপীয় নেতা আর আধুনিক শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের নাম। চালকের আসনে বসা আপাদমস্তক ট্যাকটিকাল গিয়ারে ঢাকা লোকটার পুরো শরীরে খালি জায়গা বলতে কেবল ক্লিন শেইভড মুখটুকুই। গায়ে

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট আর মিলিটারি জ্যাকেট, হাতে ফিঙ্গারলেস গ্লাভস, হাঁটুতে নি-প্যাড, পায়ে প্রটেক্টিভ ট্যাকটিকাল বুট। মাথায় চাপানো হেলমেটের সাথে সতর্কতার সাথে লাগানো হয়েছে একটা গো-প্রো হেলমেট ক্যামেরা।

ড্রাইভওয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে এনে, ইঞ্জিন চালু রেখেই এআর-১৫ হাতে নেমে এল বন্দুকধারী। পেছনের ট্রাংকে শোয়ানো দুটো অস্ত্রের মধ্য থেকে বেছে নিল সেমি অটোম্যাটিক শটগানটাকে। এআর-১৫ কাঁধে ঝুলিয়ে ধীরেসুস্থে মসজিদের মূল দরজার দিকে এগুলো শটগান হাতে। গাড়ির স্পিকারে তখন উচ্চৈঃস্বরে গান বাজছে। মসজিদের ভেতরে থাকা প্রায় দু শ মুসল্লি প্রস্তুতি নিচ্ছে জুমুআহর সালাতের। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ৫ সেকেন্ডের মধ্যে ৯ রাউন্ড গুলি ছুড়ল বন্দুকধারী। তারপর শটগান ফেলে হাতে তুলে নিল এআর-১৫। ঘড়িতে তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

পরের দু-মিনিট মসজিদের ভেতর শান্ত, নির্বিকার ভঙ্গিতে নির্বিচারে গুলি চালাল বন্দুকধারী। ঠান্ডা মাথায় গুলি করে মারল মসজিদের করিডোর আর কোনায় আটকা পড়া মুসলিমদের। দু-মিনিট পর গাড়ির কাছে ফিরে এসে আরেকটা সেমি অটোম্যাটিক রাইফেল নিয়ে আবারও ঢুকল মসজিদে। ততক্ষণে মসজিদ মোটামুটি খালি হয়ে গেছে। মৃতদেহগুলোর মাঝে যারা আহত হয়ে পড়ে ছিল এবার তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করল। পুরো ব্যাপারটায় খরচ হলো মাত্র ৭০ সেকেন্ড। তারপর বেরিয়ে এল মসজিদ থেকে। দরজার সামনে থাকা অবস্থায় দূর থেকে গুলি করল দেয়ালের ফাঁক দিয়ে পালানোর চেষ্টারত একজন মহিলাকে। আহত হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকা অবস্থায় তার মাথায় আরও দু-বার গুলি করল খুব কাছ থেকে। তারপর ট্রাংক বন্ধ করে চেপে বসল গাড়িতে। ড্রাইভওয়ে থেকে বের হবার সময় মাড়িয়ে দিলো মহিলার মৃতদেহ। সুবারু আউটব্যাক ফুল স্পিডে ছুটল ৫ কিলোমিটার দূরের লিনউড ইসলামিক সেন্টারের দিকে। ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি ধাপ হিসেব করে চালানো পুরো হামলাটা হেলমেটে লাগানো গো-প্রো ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার হলো ফেইসবুকে।

১.৫৫ তে লিনউড ইসলামিক সেন্টারের সামনে পৌঁছল বন্দুকধারী। প্রথমদিকে ঢোকার দরজার খুঁজে না পেয়ে গুলি করতে শুরু করল মসজিদের বাইরে থেকেই। গুলিবিদ্ধ হলো মসজিদের বাইরে থাকা বেশ কয়েকজন। বন্দুকধারী শেষ পর্যন্ত যখন মসজিদের ভেতর ঢুকে গুলি করতে শুরু করল ততক্ষণে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছেন অধিকাংশ মুসল্লি। কিছুক্ষণ পর গুলি শেষ হলে অস্ত্র বদলানোর জন্য গাড়ির কাছে পৌঁছালে ওর ফেলে দেয়া শটগানই ওর দিকে ছুড়ে দিলেন একজন মুসলিম। সম্ভবত প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে এল

৩। ২.২০ এর দিকে তৃতীয় টার্গেটের দিকে যাবার সময় ওকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

গ্রেফতার হবার আগে দুই মসজিদের ভেতর মোট ৫০ জন মুসলিমকে হত্যা করা এ হামলাকারীর নাম ব্রেন্টন হ্যারিসন ট্যারান্ট। অস্ট্রেলিয়ান, বয়স ২৮।

ব্রেইভিকের মতোই হামলার অল্প কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ৩০টি ইমেইল অ্যাড্রেসে নিজের লেখা ৭৩ পৃষ্ঠার ম্যানিফেস্টো পাঠায় ট্যারান্ট। সেই সাথে ম্যানিফেস্টোর ডাউনলোড লিংক এবং হামলার লাইভস্ট্রিমের লিংক পোস্ট করে টুইটার এবং ৮-চ্যানে[১৪৬]। ম্যানিফেস্টোতে নিজের অনুপ্রেরণা হিসেবে বিশেষভাবে ব্রেইভিকের নাম উল্লেখ করে ট্যারান্ট। ব্রেইভিকের ১,৫০০ পৃষ্ঠার ম্যানিফেস্টো ছিল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে হামলার মতোই ট্যারান্টের ম্যানিফেস্টোও ছিল গোছানো, হিসেবি। 'দা গ্রেইট রিপ্লেইসমেন্ট' নামের এ ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য অনুযায়ী হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে চলা অভিবাসনের স্রোত বন্ধ করা। পশ্চিমা সরকার এবং কর্পোরেশানগুলোর পলিসির মাধ্যমে উৎসাহিত এ বৈধ অভিবাসনকে ট্যারান্ট দেখে 'আগ্রাসন' হিসেবে। একদিকে দিন দিন সাদাদের জন্মহার কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে অভিবাসীদের সংখ্যা। আবার দেখা যাচ্ছে অভিবাসীদের জন্মহার সাদাদের চেয়ে অনেক বেশি। ব্রেইভিকের মতো ট্যারান্টেরও উপসংহার হলো, এ সমীকরণের অবধারিত ফলাফল শ্বেতাঙ্গ জাতি এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি। সে মনে করে পশ্চিমের এ পতনের পেছনে অভিবাসন ছাড়া অন্য আরও অনেক কারণ আছে। পশ্চিমের অবক্ষয় ও আদর্শিক দৈন্য নিয়েও সে হতাশ ও ক্ষুব্ধ। কিন্তু এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হুমকি হলো অভিবাসন। তাই যেকোনো মূল্যে একে থামাতে হবে। ট্যারান্ট নিজেকে দেখে ইউরোপিয়ানদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য অপরিহার্য এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ হিসেবে। তার এ হামলার উদ্দেশ্য হলো অভিবাসীদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া, পশ্চিমে তারা নিরাপদ না। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউযিল্যান্ড এগুলো সাদাদের জন্য, সাদাদের জায়গা। অভিবাসীরা এখানে আর আমন্ত্রিত না।

এ হামলার জন্য মসজিদ বেছে নেয়ার কারণ নিয়েও নিজ ম্যানিফেস্টোতে খোলাখুলি আলোচনা করে ট্যারান্ট। পশ্চিমে আসা অভিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগুরুদের অন্যতম মুসলিমরা। মুসলিমদের আছে শক্তিশালী ঐতিহ্য, মজবুত সামাজিক বন্ধন এবং উচ্চ জন্মহার। এসব কারণে 'আগ্রাসী' হিসেবে মুসলিম অভিবাসীরা বেশি বিপজ্জনক।

---

[১৪৬] ৮-চ্যান পোস্টের আর্কাইভ সংস্করণ – https://archive.fo/yxi4m#selection-8647.3-8647.15

এ ছাড়া ইসলামের আছে ইউরোপের সাথে হাজার বছরের সংঘাতের ইতিহাস। সব অভিবাসীর মধ্য থেকে শ্বেতাঙ্গদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো মুসলিমরা। তাই তাদের হামলা করলে পাওয়া যাবে সবচেয়ে বেশি সমর্থন।

ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য অনুযায়ী, হামলার অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে আছে পশ্চিমের সাথে মুসলিমদের সংঘাতকে আরও তীব্র করা এবং পশ্চিমা সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও অস্থিশীলতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে উদারনৈতিক বামপন্থী এবং ডানপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। কারণ, পচে যাওয়া পশ্চিমা সভ্যতার শুদ্ধির জন্য ধ্বংস আর সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো পথ এখন আর খোলা নেই। পাশাপাশি অস্ত্র আইনকে কেন্দ্র করে অ্যামেরিকান লিবারেল আর জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মেরুকরণ বাড়ানোও উদ্দেশ্য। ট্যারান্টের বিশ্বাস, মার্কিন সরকার নাগরিকদের অস্ত্র রাখার অধিকার ছিনিয়ে নিলে সেটা অ্যামেরিকাকে নিয়ে যাবে গৃহযুদ্ধের দিকে। এমন একটি সংঘাত অ্যামেরিকার জনগণকে বিভক্ত করে ফেলবে বর্ণ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। সাদারা তখন বাধ্য হবে নিজেদের শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একত্র হতে। শ্বেতাঙ্গ জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এমন স্পষ্ট বিভাজন এবং যুদ্ধ আবশ্যিক। যুদ্ধ ছাড়া এখন আর কোনোভাবে ঘুমন্ত শ্বেতাঙ্গ জাতিকে জাগানো এবং শ্বেতাঙ্গদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা পশ্চিমা বিশ্বের সরকারগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব না।

নিজের কাজকে ট্যারান্ট দেখে স্বজাতির উদাসীনতার ঘুম ভাঙানোর জন্য চালানো এক অনুপ্রেরণামূলক হামলা হিসেবে। তার আশা, আগামী বছরগুলোতে তার এ হামলা গভীরভাবে প্রভাবিত করবে পশ্চিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকে এবং উদ্বুদ্ধ করবে তার মতো আরও অনেক হামলাকারীকে।

৪.

টিমোথি ম্যাকভেই, অ্যান্ডার্স ব্রেইভিক, ব্রেন্টন ট্যারান্ট। তিন মহাদেশের, তিন প্রজন্মের, তিন সন্ত্রাসী। তিনজনের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। টিমোথি ম্যাকভেই ছিল নব্বইয়ের দশকের অ্যামেরিকান প্যাট্রিয়ট মুভমেন্ট, মিলিশিয়া মুভমেন্ট, আরইয়ান রিপাবলিকের মতো নব্য নাৎসি সংগঠন আর ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফসল। এ আদর্শগুলোর পেছনে আছে শতাব্দী পুরোনো ইতিহাস। দীর্ঘদিন ধরে নিস্তেজ হয়ে আসা এ ধারণাগুলো ওয়েইকো আর রুবি রীজের ঘটনার পর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই মিশ্রণ থেকে বের হয়ে আসে ম্যাকভেই। অ্যান্ডার্স ব্রেইভিকের ওপর ছিল ৯/১১ এর পরপর ইউরোপের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী চেতনা ও পশ্চিমা মিডিয়ার ব্যাপক

ইসলামবিরোধী প্রপ্যাগ্যান্ডার প্রভাব। ব্রেন্টন ট্যারান্টের চিন্তার কাঠামোকে বদলে দেয় ২০০৮ এর বৈশ্বিক মন্দার পর তীব্র হওয়া মার্কিন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝ থেকে অলট-রাইট নামে নব্য নাৎসি আন্দোলনের উত্থান, পশ্চিমের অভিবাসন নীতি আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির মাধ্যমে তৈরি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। ম্যাকভেই-এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল সরকার। ব্রেইভিকের নিশানায় ছিল সরকার আর লিবারেলরা। ট্যারান্ট মসজিদে ঢুকে খুন করে ৫০ জন মুসলিমকে।

তবে এতসব পার্থক্য সত্ত্বেও তিনজনের মধ্যে আছে মৌলিক মতাদর্শিক কিছু মিল। তিনজনের চিন্তাই দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের ওপর। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের দর্শন অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক, জেনেটিক, প্রতিটি দিক দিয়ে জন্মগতভাবে সাদারা শ্রেষ্ঠ। আর এ কারণে সাদাদের নৈতিক অধিকার আছে বাকি পৃথিবী ওপর কর্তৃত্ব করার। বর্ণবাদ, ইহুদীবিদ্বেষ, দেশের নাগরিকদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও হস্তক্ষেপের বিরোধিতাসহ আরও অনেক ধারণা এর সাথে যুক্ত থাকলেও মোটা দাগে এই হলো এই মতাদর্শের প্রস্তাবনা। ম্যাকভেই, ব্রেইভিক এবং ট্যারান্ট, তিনজনই এ মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনজনই মনে করে পশ্চিমা সভ্যতা এবং শ্বেতাঙ্গ জাতি উপনীত হয়েছে ধ্বংস এবং পতনের কিনারায়। পশ্চিমা সরকার এবং গ্লোবালিস্টরা ওদের তিনজনের চোখেই শত্রু, এবং তিনজনই মনে করে অস্ত্র ছাড়া কোনো পরিবর্তন সম্ভব না।

সাদা চামড়ার মানুষরা গণহত্যা চালালে সাধারণত মিডিয়া তাতে তেমন একটা শোরগোল করে না। তাই আমাদের চোখে এ মতাদর্শিক মিলগুলোর গুরুত্ব ধরা নাও পড়তে পারে। কিন্তু এই ধরনের মতাদর্শের মানুষ এবং সংগঠনের সংখ্যা প্রায় এক যুগ ধরে বাড়ছে পুরো পশ্চিমজুড়ে। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ, শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ কিংবা নব্য নাৎসিবাদ–যে নামেই ডাকুন না কেন, ক্রমশ বড় হচ্ছে শ্বেতসন্ত্রাসের কালো ছায়া। ২০১১ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিবছর কোনো না কোনো হাই প্রোফাইল সন্ত্রাসীর হামলায় উঠে এসেছে এ আদর্শের নাম।

২০১১ এর জুলাইতে হয় ব্রেইভিকের হামলা। ২০১২ এর অগাস্টে মসজিদ মনে করে পিস্তল হাতে উইসকনসনের এক শিখ মন্দিরে ঢুকে ৬ জনকে গুলি করে মেরে ফেলে ওয়েইড মাইকেল পেইজ নামের মার্কিন বাহিনী থেকে ছাটাই হওয়া এক সাবেক সেনা এবং নব্য নাৎসি।[১৪৭] শিখদের দাড়ি এবং পাগড়ির কারণে পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেকেই তাদের মুসলিম মনে করে। ২০১৪ তে অ্যামেরিকার ক্যানসাসের দুটো

[১৪৭] Did Islamophobia Fuel the Oak Creek Massacre?, August 10, 2012

ইহুদী কমিউনিটি সেন্টারে হামলা চালিয়ে ৩ জন হত্যা করে নব্য নাৎসি ফ্রেইযার গ্লেন মিলার।[১৪৮] ২০১৫ তে সাউথ ক্যারোলিনার এক ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণাঙ্গ গির্জায় ঢুকে ৯ জনকে হত্যা করে ডিলান রুফ নামে এক শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী। অ্যামেরিকাজুড়ে শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চাওয়া ডিলান রুফও হামলার আগে নিজের ম্যানিফেস্টো আপলোড করে ইন্টারনেটে।[১৪৯]

২০১৬ তে ইংল্যান্ডে ছুরিকাঘাতে খুন হয় লেবার পার্টির এমপি জো কক্স। খুনি ছিল ৫২ বছর বয়সী নব্য নাৎসি থমাস অ্যালেক্স্যান্ডার মায়ার। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অভিবাসন নীতির প্রতি কক্সের সমর্থনের কারণে তাকে হত্যা করে সে। মায়ারও বিশ্বাস করত শ্বেতাঙ্গ ইউরোপ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং কক্সের মতো উদারনৈতিক-বামপন্থীরা হলো সাদা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এ হামলার পেছনের মায়ারের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল অ্যান্ডার্স ব্রেইভিক।[১৫০] ২০১৬ এর রমাদ্বানে তারাবীহর কিছুক্ষণ পর লন্ডনের ফিন্সবারি পার্ক মসজিদের কাছে পথচারীদের ওপর চলন্ত ভ্যান তুলে দেয় ড্যারেন অসবর্ন। এ হামলায় আহত হয় দশজন এবং মারা যান একজন মুসলিম। ইসলামবিদ্বেষী ড্যারেন অসবর্নের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব মুসলিম হত্যা করা।[১৫১]

২০১৭ এর জানুয়ারিতে কানাডার কুইবেকের এক ইসলামিক সেন্টারে ঈশার নামাযের আগে গুলি করে হত্যা করা হয় ১৯ জন মুসল্লিকে, আহত হয় আরও ১৯ জন। হত্যাকারী অ্যালেক্স্যান্ডি বিসোনেট ছিল শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং কানাডার অভিবাসন নীতির ঘোর বিরোধী। ২০১৮ তে অ্যামেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার এক সিনাগগে ঢুকে ১১ জনকে হত্যা করে রবার্ট বাওয়ারস নামের এক নব্য নাৎসি।[১৫২] ২০১৯ এ নিউযিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে হামলার এক মাস আগে অ্যামেরিকায় গ্রেফতার হয় কোস্ট গার্ডের লেফটেন্যান্ট ক্রিস্টোফার পল হ্যানসেন। অ্যান্ডার্স ব্রেইভিকের উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ডেমোক্রেট দলীয় বিভিন্ন নেতা আর বামঘেঁষা মিডিয়া

---

[১৪৮] Kansas Jewish Center Shooting Suspect Identified as Former KKK Leader, *ABC News*, April 13, 2014

[১৪৯] Dylann Roof's Manifesto, December 13, 2016

[১৫০] The slow-burning hatred that led Thomas Mair to murder Jo Cox, *The Guardian*, Novermber 23, 2016

[১৫১] Finsbury Park attack: Why Darren Osborne was not charged with terror offences, *Independent*, February 2, 2018

[১৫২] Pittsburgh shooter was fringe figure in online world of white supremacist rage, *The Guardian*, October 30, 2018

ব্যক্তিদের আক্রমণ করার জন্য দু-বছর ধরে অস্ত্র আর গোলাবারুদ জমা করছিল শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী হ্যানসেন।[১৫৩]

গত দশ বছরে অ্যামেরিকায় ঘটা সব চরমপন্থী হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ৭৩.৩% সংঘটিত হয়েছে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের হাতে।[১৫৪] ২০১৮ তে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের হাতে অ্যামেরিকায় খুন হয়েছে ৫০ জন।[১৫৫] ২০০৭ থেকে অ্যামেরিকাজুড়ে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র প্যারামিলিটারির সংখ্যা। শুধু ২০১৭ থেকে ২০১৮ এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০%।[১৫৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাথমিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অ্যামেরিকার অলট-রাইট (Alt-Right/Alternative Right) আন্দোলন–যা আদর্শের দিক থেকে খোলাখুলিভাব শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী, যদিও ইন্টারনেট ট্রোলিং এবং মিম এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ধ্যানধারণাগুলো ঠাট্টা আর রসিকতার আড়ালে হালকা চালে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। ইউরোপ ও অ্যামেরিকা থেকে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া বাকি সবাইকে বের করে দিয়ে শ্বেতরাষ্ট্র (white ethnostate) প্রতিষ্ঠার কথা বলে অলট-রাইট। ব্রেন্টন ট্যারান্টের মতো তারাও বিশ্বাস করে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতা এবং গণহত্যসহ যেকোনো ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে বৈধ।

এক সময় অলট-রাইটকে সরাসরি সমর্থন দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার মাস্টারমাইন্ড স্টিভ ব্যানন। ব্রেইটবার্ট নিউয নেটওয়ার্কের প্রধান থাকা অবস্থায় ব্যানন মন্তব্য করে, '(ব্রেইটবার্ট) হলো অলট-রাইটের প্ল্যাটফর্ম'[১৫৭]। ২০১৬ এর অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আলোচনায় উঠে আসে অলট-রাইট। ধীরে ধীরে মূলধারার মিডিয়াগুলোতে পরিচিতি ও প্রচার পেতে শুরু করে অলট-রাইট ও তাদের আদর্শ। ২০১৬ তে নাৎসি স্যালুট এবং স্লোগান দিয়ে ট্রাম্পের বিজয় উদ্‌যাপন

---

[১৫৩] Arrested Coast Guard Officer Allegedly Planned Attack 'On A Scale Rarely Seen', *NPR News*, February 20, 2019

[১৫৪] Right-Wing Extremism Linked to Every 2018 Extremist Murder in the U.S., ADL Finds, https://bit.ly/2CIIIkp

[১৫৫] U.S. sees steady rise in violence by white supremacists, *CBS News*, March 15, 2019

[১৫৬] The Year in Hate: Rage Against Change, *Southern Poverty Law Center*, February 20, 2019

[১৫৭] How Donald Trump's New Campaign Chief Created an Online Haven for White Nationalists, Mother Jones, August 22, 2016

করে অলট-রাইট নেতা রিচার্ড স্পেন্সার এবং তার সমর্থকরা।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এই নব্য নাৎসিরা। ২০১৭ সালে ভার্জিনিয়ার শার্লটসভিলে আয়োজন করা হয় 'Unite The Right' নামে এক র‍্যালির। উদ্দেশ্য ছিল অ্যামেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন নব্য নাৎসি এবং শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের একত্র করে এক নতুন উত্থানের ইঙ্গিত দেয়া। স্বস্তিকাসহ বিভিন্ন নাৎসি প্রতীক এবং স্লোগান নিয়ে দুদিন ধরে চলে এ র‍্যালি। দুদিন ধরেই উগ্র ডানপন্থী নব্য নাৎসিদের সাথে থেমে থেমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া আর হাতাহাতি চলে উগ্র বামপন্থী অ্যান্টিফা এবং অন্যান্য দলের। র‍্যালির দ্বিতীয় দিন বিরোধীপক্ষের ভিড়ে চলন্ত গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় নব্য নাৎসি জেইমস অ্যালেক্স ফিল্ডস, এতে ১৯ জন আহত এবং একজন নিহত হয়। এ ঘটনার পর প্রেস ব্রিফিংয়ে সরাসরি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের নিন্দা করার বদলে ট্রাম্প বলে, 'বিভিন্ন পক্ষের দিক থেকে ঘৃণা, গোঁড়ামি আর সহিংসতা দেখা গেছে', এবং 'দু-পক্ষেই অনেক ভালো মানুষ আছে'।[১৫৮] এ ঘটনার পর সৃষ্ট মিডিয়া ব্যাকল্যাশের কারণে কৌশল বদলে অ্যামেরিকান অলট-রাইট এখন চেষ্টা করছে নিজেদের কার্যক্রম ও বিস্তারকে গোপন করার। অন্য কোনো র‍্যালি বা কর্মসূচির বদলে গত দেড় বছর ধরে তারা আবার মনোযোগী হয়েছে অনলাইন প্রচারণা এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রসারে।

২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত চার বছরে অলট-রাইটের মাধ্যমে প্রভাবিত সন্ত্রাসীদের আক্রমণে অ্যামেরিকায় মারা গেছে এক শ'রও বেশি মানুষ।[১৫৯] ডিলান রুফ, অ্যালেক্স্যান্ড্রে বিযোনেট, রবার্ট বাওয়ারস, পল হ্যানসেন এবং ব্রেন্টন ট্যারান্ট–প্রত্যেকেই ছিল কোনো না কোনোভাবে অলট-রাইটের ফসল।

অ্যামেরিকার অলট-রাইটের ধাঁচে ইউরোপজুড়ে একই ধরনের মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে আইডেন্টিটারিয়ান আন্দোলন। গত আট বছরে বিভিন্ন নামে উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদী এ সংগঠনের শাখা ছড়িয়ে গেছে পুরো ইউরোপজুড়ে। এ আন্দোলনের অস্ট্রিয়ান শাখায় ১,৫০০ ইউরো চাঁদাও দিয়েছিল ব্রেন্টন ট্যারান্ট।[১৬০] ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের আদর্শ প্রচার করছে

---

[১৫৮] Trump Gives White Supremacists an Unequivocal Boost, *The New York Times*, August 15, 2017

[১৫৯] The Alt-Right is Killing People, Southern Poverty Law Center, February 05, 2018

[১৬০] Christchurch terror suspect gave money to Austrian far right: Chancellor Kurz, *Politico*, March 27, 2019

আইডেন্টিটারিয়ানরা। পুরো ইউরোপজুড়ে বাড়ছে তাদের সমর্থন, বিশেষ করে ৩০ এর নিচে থাকা তরুণদের মধ্যে। অলট-রাইট এবং আইডেন্টিটারিয়ানরা সহিংসতা থেকে আপাতত বিরত থাকার কথা বললেও, এ সিদ্ধান্ত কৌশলগত, নৈতিক না। পর্যাপ্ত সাংগঠনিক কাঠামো, জনসমর্থন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকার কারণে এই মুহূর্তে সাংগঠনিকভাবে সশস্ত্র আন্দোলনে যাওয়াকে কৌশলগত ভুল মনে করে তারা। তার বদলে সমর্থক ও অনুসারীদের উৎসাহিত করে ট্যার‍্যান্ট, বাওয়ারস কিংবা ব্রেইভিকের মতো একাকী হামলায়।

অ্যামেরিকা, ইউরোপ কিংবা অস্ট্রেলিয়া, যে মহাদেশেই থাকুক না কেন, পশ্চিমা এই শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের দেখে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি হিসেবে। ইসলাম হলো ইউরোপের ঐতিহাসিক শত্রু, তাই ব্রেন্টন ট্যারান্টের মতো তাদের ব্ল্যাকলিস্টেও সবার ওপরে থাকে মুসলিমদের নাম। ইসলামবিদ্বেষী এ মনোভাব ক্রমশ বাড়ছে পশ্চিমা বিশ্বে এবং এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বাস্তব পরিসংখ্যানে। ২০১৬ তে অ্যামেরিকায় মুসলিমবিদ্বেষী আক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে আগের সব রেকর্ড। ২০০১ এর চেয়েও বেশি ইসলামবিদ্বেষী অপরাধ ঘটেছে এ বছর।[১৬১] ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ইউরোপ, অ্যামেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে মোট ৩৫০টি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীরা। এ সময়টাতে ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিমরা। বিশেষ করে ২০১৫ থেকে বেড়েছে মুসলিম এবং অভিবাসী-বিরোধী আক্রমণের সংখ্যা। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা দেখছি ইউরোপ কিংবা অ্যামেরিকায় ঘটে যাওয়া কোনো না কোনো মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনার খবর কিংবা ভিডিও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখনো হয়তো হতাহতের ঘটনা ঘটছে না, কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার মাত্রা ও তীব্রতাবৃদ্ধির একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শুধু এক-দুটো দেশে ব্যাপারটা ঘটছে না, হচ্ছে পুরো ইউরোপেই।

ডেনমার্কে ২০১৬ তে ইসলামবিদ্বেষী আক্রমণ হয় ৫৬ বার। ডেনমার্কের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫% হওয়া সত্ত্বেও মোট বর্ণবাদী আক্রমণের ২০% এর লক্ষ্যবস্তু হয় মুসলিমরা।[১৬২] সুইডেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোট ৪৩৯টি বর্ণবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটে ২০১৬তে।[১৬৩] একই বছর মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীনতার কেন্দ্র ফ্রান্সে বন্ধ করে দেয়া হয় ১৯টি মসজিদ। গৃহবন্দী করে রাখা হয় ৭৪৯ জন মুসলিমকে এবং মুসলিমদের ঘরবাড়িতে পুলিশ রেইড দেয় ৪,৫০০ বারেরও বেশি। বিভিন্ন মসজিদে আক্রমণ করা

[১৬১] Assaults against Muslims in U.S. surpass 2001 level, Pew Research Center
[১৬২] Ibid
[১৬৩] Swedish Crime Survey-NTU

হয় মোট ১০০ বার।[১৬৪] অন্যদিকে ২০১৭ তে শুধু লন্ডনেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা ছিল ১,৬৭৮টি।[১৬৫] অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিম নারীরা। মার্চ থেকে জুলাই, মাত্র চার মাসে বিভিন্ন মসজিদের ওপর আক্রমণ করা হয় মোট ১১০ বার।[১৬৬] পোল্যান্ডে ২০১৭ তে সবচেয়ে বেশি বর্ণবাদী হামলার শিকার গোষ্ঠী ছিল মুসলিমরা।[১৬৭] জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ ধরনের মোট ৬৬৪টি ঘটনা ঘটে।[১৬৮] একই বছর স্পেইনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয় ৫৪৬ বার।[১৬৯]

গালি দেয়া থেকে শুরু করে হত্যাচেষ্টা—২০১৭ সালের সরকারি হিসেবমতে সব মিলিয়ে জার্মানিতে ইসলামবিদ্বেষী আক্রমণ হয় ৯০৮টি, মসজিদে হামলা হয় মোট ১০১ বার। দুটো ঘটনা থেকে উদাহরণ দিলে জার্মানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ইসলাম ও শরণার্থীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের প্রভাবের মাত্রা বোঝা যাবে।

২০১৭ এর এপ্রিলের ১৫ তারিখ রাস্তা পার হবার সময় একটা গাড়ি এসে ধাক্কা দেয় ২২ বছর বয়সী মিসরীয় ছাত্রী শাদিন মুহাম্মাদকে। মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরানোর সময় সাহায্য করার বদলে শাদিনকে গালি এবং টিটকারি দিতে থাকে আশেপাশের মানুষরা। তিন দিন পর মারা যায় শাদিন।[১৭০] এ ঘটনার দু-মাস আগে ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখ ভিয়েনা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হয় জার্মান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ফ্র্যাঙ্কো। সিরিয়ান শরণার্থী সেজে শরণার্থীবান্ধব রাজনীতিবিদদের ওপর হামলার প্ল্যান করছিল সে। তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায় ফ্র্যাঙ্কোসহ জার্মান সেনাবাহিনী, স্পেশাল ফোর্স এবং গোয়েন্দা বাহিনীর কমপক্ষে ২০০ জন সদস্য নাৎসি মতাদর্শে বিশ্বাসী। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি জার্মানির বিভিন্ন ইসলামী সেন্টারে আক্রমণেরও পরিকল্পনা ছিল তাদের।[১৭১] ২০১৮ তে জার্মান ম্যাগাযিন ডের স্পিগেলের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় পুলিশ এবং সশস্ত্রবাহিনীর ভেতর প্রভাব

[১৬৪] Observatory of Islamophobia
[১৬৫] Scotland Yard
[১৬৬] Tell MAMA UK
[১৬৭] National Prosecutor's Office, Poland
[১৬৮] Ministry of Interior, Poland
[১৬৯] Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia
[১৭০] European Islamophobia Report 2017
[১৭১] A German right-wing extremist soldier's double life, DW, April 26, 2018
At least 200 soldiers in German Army neo-Nazi terror network, November 15, 2018

বাড়ছে রাইসবারগার ('রাইখের নাগরিক') নামের নাৎসি সংগঠনের। এ সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ১৬,৫০০[১৭২] এবং তারা চেষ্টা করছে এক নব্য নাৎসি সেনাবাহিনী গড়ে তোলার।[১৭৩]

মহাসমুদ্রের ওই পাড়ে নিজেকে অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য দাবি করা নরম্যান স্পিয়ার নামের এক নব্য নাৎসি গড়ে তুলেছে 'দা বেইস' নামের এক সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের প্রয়োজনীয় শারীরিক, সামরিক ও বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে করে তারা বিভিন্ন টার্গেটে সফলভাবে হামলা করতে পারে। দা বেইস শুধু আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দেবে, টার্গেট খুঁজে নিতে হবে ওদের নিজেদেরকেই। প্রাইভেট চ্যাটের মাধ্যমে এ প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের দেয়া হচ্ছে হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ, বিস্ফোরক তৈরি, সামরিক প্রশিক্ষণসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ের ম্যানুয়াল। প্রশিক্ষণ অনলাইনে চললেও নিয়মিত বিরতিতে সদস্যদের মধ্যে সীমিত পরিসরে চলছে দেখা-সাক্ষাৎ, আলোচনা এবং পরিকল্পনা। স্পিয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত নব্য নাৎসি ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের মনোযোগ ইন্টারনেট থেকে বাস্তব দুনিয়ার সহিংসতার দিকে ঘোরানোর। দা বেইসের কর্মপদ্ধতি নিয়ে স্পিয়ারের বক্তব্য হলো,

> *'এখন আমাদের যথাসম্ভব গোপনীয়তার সাথে কাজ করতে হবে। কিন্তু অবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা আরও সংগঠিত হয়ে কাজ করতে পারব, আর হয়তো একসময় গিয়ে একেবারে প্রকাশ্যে আমাদের কার্যক্রম চলবে... এই মুহূর্তে আমাদের এমন সব কাজ (হামলা) করা দরকার, যেগুলো সরাসরি কোনো সংগঠন বা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত করা যাবে না। কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহ ত্বরান্বিত হবে এবং প্রচার হবে আমাদের আদর্শের।'[১৭৪]*

দা বেইস চেষ্টা করে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের মধ্যে লৌন উলফ (একাকী যোদ্ধা) এবং 'টেরোরিস্ট সেল' (অল্প কয়েকজন সদস্যের সন্ত্রাসী সেল) ভিত্তিক হামলা চালানোর মনোভাব গড়ে তোলার। যাতে করে কোনো নির্দিষ্ট সংগঠনের সাথে যুক্ত না হয়েই যে কেউ ইন্টারনেট থেকে আদর্শিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে যেকোনো হামলা

---

[১৭২] Dozens of neo-Nazis serving in German police, army: *Der Spiegel*, Reuters, April 20, 2018

[১৭৩] Report: Far-right Reichsbürger movement is growing, building army, DW, January 12, 2018

[১৭৪] Neo-Nazis Are Organizing Secretive Paramilitary Training Across America, Vice, November 21, 2018

চালাতে পারে। ষাটের দশকের শুরুর দিকে অ্যামেরিকান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার একজন অফিসারের তৈরি করা নেতাবিহীন প্রতিরোধ (Leaderless Resistance) এর এই ধারণা শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আশির দশকে। স্পিয়ার বিশ্বাস করে পশ্চিমা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আরও কিছুদিন এভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের।[১৭৫], [১৭৬] স্পিয়ারের উপসংহার মিলে যায় অলট-রাইট এবং আইডেন্টিটারিয়ানদের বিশ্লেষণের সাথে।

'দা বেইস' এর মতো একই রকম নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে ইউক্রেনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা অ্যামেরিকা ও ইস্রায়েল সমর্থিত[১৭৭] নব্য নাৎসি প্যারামিলিটারি বাহিনী 'আযভ ব্যাটালিয়ন' (Azov Battalion)। আযভের সদস্যরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে নতুন সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। বৈশ্বিক শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের কথা জানতে পেরে নিজ থেকে আগ্রহী হয়েও অনেকে পাড়ি জমায় ইউক্রেনে। ইউক্রেনে বর্তমানে যুদ্ধাবস্থা থাকার কারণে একই সাথে নিজ আদর্শের প্রচার, বিদেশি রিক্রুট গ্রহণ এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার অন্যান্য দেশে ফেরত পাঠাবার দুর্লভ সুযোগ পাচ্ছে আযভ। এ দিক দিয়ে ইউক্রেনের বর্তমান অবস্থার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় আশি ও নব্বইয়ের দশকের আফগানিস্তানের। এ সুযোগ ব্যবহার করে আযভ চেষ্টা করছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমিকে বৈশ্বিক শ্বেতসন্ত্রাসের ঘাঁটিতে পরিণত করার। এরই মধ্যে আযভ ব্যাটেলিয়নের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে অ্যামেরিকা, নরওয়ে, ইটালি, জার্মানি, ব্রিটেন, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী আর নব্য নাৎসিরা। ক্রাইস্টচার্চে ৫০ জন মুসলিমকে হত্যা করা ব্রেন্টন ট্যারান্টের সাথেও পাওয়া গেছে আযভ ব্যাটালিয়নের সম্পর্কের সম্ভাব্য প্রমাণ।[১৭৮]

পুরো পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে একদিকে বাড়ছে ইসলাম ও শরণার্থীদের প্রতি বিদ্বেষ, বাড়ছে উগ্রবাদী শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী আদর্শের প্রভাব, অন্যদিকে দ্রুতগতিতে সামরিকায়ন হচ্ছে এসব আদর্শের সবচেয়ে কট্টর অনুসারীদের। অলট-রাইট এবং আইডেন্টিটারিয়ানদের প্রচারণার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া নতুন সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের মতে

---

[১৭৫] Ibid

[১৭৬] Norman Spear- Leaderless Guerrillas, https://www.youtube.com/watch?v=daQP4gdElk8

[১৭৭] Israel is arming neo-Nazis in Ukraine, July 4, 2018

[১৭৮] Intelbrief: The Transnational Network That Nobody Is Talking About, The Soufan Center, March 22, 2019

এটা হলো কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বড় ধরনের হামলার দিকে যাবার ঠিক আগের পর্যায়। আপাতত তারা ব্রেইভিক কিংবা ট্যারান্টের মতো 'লৌন উলফ' বা একাকী হামলার দিকে মনোযোগ দিলেও, খুব দ্রুত তারা চেষ্টা করবে আরও বড় মাপের হামলার দিকে যাবার।

২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৮ বছরে অ্যান্ডার্স ব্রেইভিককে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে কমপক্ষে আরও ৪ সন্ত্রাসী, যাদের মধ্যে সর্বশেষ হলো ব্রেন্টন ট্যারান্ট। এ ৮ বছরে বহুগুণে বেড়েছে পশ্চিমা সমাজের অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ আদর্শিক দ্বন্দ্ব। সেই সাথে সমীকরণে যুক্ত হয়েছে অলট-রাইট, আইডেন্টিটারিয়ান আন্দোলন, দা বেইস এবং আযভ ব্যাটেলিয়নের মতো বিক্রিয়ক। বেড়েছে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি এবং ইসলামবিদ্বেষ। শুরু হয়েছে ট্রাম্প যুগ।

ইসলামবিরোধী ঘৃণার চাষাবাদের এ যুগে ঠিক কতজনকে উদ্বুদ্ধ করবে ব্রেন্টন ট্যারান্ট?

৫.

ক্রাইস্টচার্চ হামলার পর পশ্চিমা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া বিশেষভাবে ফোকাস করে দুটো বার্তার ওপর।

এক, ব্রেন্টন ট্যারান্টের মতো লোকেরা পশ্চিমের প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং

দুই, অভিবাসীরা এবং মুসলিমরা পশ্চিমা সমাজেরই অংশ।

জেসিন্ডা আরডার্নের নেতৃত্বাধীন সরকার মুসলিমদের প্রতি সমর্থন, সহমর্মিতা এবং সমবেদনা প্রদর্শনীর চূড়ান্ত করে। হত্যাকাণ্ডের পরের শুক্রবার জাতীয় টিভি ও রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় জুমুআর আযান। পালন করা হয় দুই মিনিট নীরবতা। জেসিন্ডা আরডার্নসহ আরও অনেককে দেখা যায় মাথায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায়। ভাইরাল হয় আন-নূর মসজিদের সামনে মাথায় অস্ত্র হাতে পাহারারত ওড়না দেয়া নারী পুলিশ অফিসারের ছবি। বিভিন্ন সময়ে মুসল্লিদের নিরাপত্তা দিতে হাজির হয় বাইকার গ্যাংসহ আরও অনেকে। মিডিয়ার কল্যাণে এসব দৃশ্য পৌঁছে যায় বিশ্বের নানা প্রান্তে। নিঃসন্দেহে মিডিয়া প্রচারণার দিক থেকে এ প্রতিক্রিয়া ছিল প্রায় নিখুঁত। কিন্তু এটা কি ইসলাম ও অভিবাসীদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের প্রকৃত মনোভাবের প্রতিফলন?

জেসিন্ডার মাথার ওড়না এবং তার সতর্কতার সাথে সাজানো ঐক্যের বার্তা ফলাও করে প্রচারিত হলেও বিপরীতধর্মী অনেকগুলো বিষয় পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়াতে গুরুত্ব পায়নি। যেমন : ক্রাইস্টচার্চ হামলার পরের সপ্তাহে ব্রিটেনে মুসলিমবিরোধী

বর্ণবাদী অপরাধ বেড়ে যায় প্রায় ৫৮৩%।[১৭৯] মিডিয়ার তুলে ধরা ছবির সাথে এ তথ্য এবং পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া মুসলিমবিরোধী অপরাধের অন্যান্য পরিসংখ্যান মেলে না। এ আপত্তির জবাবে একটা ধরাবাঁধা উত্তর সাধারণত দেয়া হয়–ব্রেন্টন ট্যারান্টের মতো লোকেরা পশ্চিমা সমাজের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ। তারা একটা অত্যন্ত ছোট সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, পশ্চিমের মূলধারার প্রতিনিধিত্ব তারা করে না। কথাটা শুনতে ভালো, নিঃসন্দেহে। কিন্তু একইসাথে বাস্তবতা-বিবর্জিতও। অভিবাসী এবং বিশেষ করে মুসলিমদের ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজের মনোভাব আসলে কী, তার বিস্তর ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক প্রমাণ আমাদের সামনেই আছে। এসব উপেক্ষা করে শুধু জেসিন্ডা আরডার্ন কিংবা সুন্দরী নারী অফিসারের মাথার ওড়নার দিকে মনোযোগ দেয়া কারও কারও জন্য মানসিক প্রশান্তির কারণ হলেও, কোনো দিক থেকেই বাস্তবসম্মত এবং বিচক্ষণ আচরণ না।

গত দশ বছর ধরে উগ্র ডানপন্থী দলগুলো ধীরে ধীরে ইউরোপিয়ান রাজনীতির কেন্দ্রে স্থান করে নিয়েছে। একসময় রাজনৈতিক ময়দানের একেবারে কিনারায় থাকা দলগুলো এখন পরিণত হয়েছে রাজনীতির মূল স্রোতের অংশে। অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া এবং ফিনল্যান্ডে উগ্র ডানপন্থীরা সক্ষম হয়েছে সরকার গঠনে। অন্যান্য জায়গাগুলোতে এখনো বিরোধী দলে থাকলেও তাদের ইসলামবিদ্বেষী বয়ান ও দাবিগুলোর জনপ্রিয়তা প্রভাবিত করছে দেশগুলোর রাজনৈতিক আলোচনাকে। সাবেক মধ্যপন্থী দলগুলোর অনেকে রাজনৈতিক প্রচারণায় এখন ব্যবহার করে একই ধরনের বয়ান। সুইডেন থেকে গ্রিস, পোল্যান্ড থেকে নেদারল্যান্ডস–সারা ইউরোপজুড়ে উত্থান ঘটছে উগ্র ডানপন্থী, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং পপুলিস্ট রাজনীতির। অভিবাসন বিরোধিতা ও ইসলামবিদ্বেষ এ রাজনীতির প্রধান স্তম্ভগুলোর অন্যতম।

২০১৮ এর নির্বাচনের আগে ইটালির লম্বার্ডি রাজ্যের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আত্তিলিও ফনটানা বলেছিল, অভিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ইটালিতে শ্বেতাঙ্গদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখোমুখি।[১৮০] অথচ ইটালিতে মোট জনসংখ্যার

---

[১৭৯] Anti-Muslim hate crimes soar in UK after Christchurch shootings, *The Guardian*, March 22, 2019

[১৮০] Milano, "Fontana: 'Razza bianca da difendere'. Poi precisa: 'È stato un lapsus'. Salvini: siamo sotto attacco", retrieved March 25, 2018 from http://milano.corriere.it/notizie/politica/18_gennaio_15/attilio-fontana-immigratirazza-bianca-difendere-candidato-centrodestra-regione-lombardia-bcf74404-f9e8-11e7-b7a0-515b75eef21a.shtml.

৯২% এর বেশি হলো শ্বেতাঙ্গ।[১৮১] ৮% অশ্বেতাঙ্গরা কীভাবে ৯২% জন্য হুমকির কারণ হয় তা ব্যাখ্যা না করলেও ফনটানা এখন লমবার্ডির প্রেসিডেন্ট, ফনটানার দল নর্দার্ন লীগ এখন ইটালির তৃতীয় জনপ্রিয় দল এবং সরকারি জোটের অংশ। অন্যদিকে নরওয়েতে এখন সরকারি জোটের অংশ ২০১৭ তে নির্বাচনী প্রচারণায় সরাসরি ইসলামবিদ্বেষকে ব্যবহার করা প্রগ্রেস পার্টি। চেক প্রজাতন্ত্রের ২০১৮ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয় ইসলামকে পশ্চিমা সভ্যতার 'শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করা মিলোস যেইমান।[১৮২] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিমানকে সমর্থন করে ২০১৭ এর আইনসভা নির্বাচনে বিজয়ী নবগঠিত এএনও এর নেতা আন্দ্রে ব্যাবিশ। ইসলামকে আইনিভাবে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণা চালানো 'ফ্রিডম অ্যান্ড ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি' পার্টির নেতা, মসজিদের বাইরে শূকর চরানোর প্রস্তাব দেয়া টমিও ওকামুরা এখন চেক প্রজাতন্ত্রের সংসদের নিম্নসভার ডেপুটি স্পিকার।[১৮৩]

রোম্যানিয়ার বুখারেস্টে মসজিদ বানানোর জন্য একটি জমি বরাদ্দ করা হলে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রায়ান বাসেস্কো একে আখ্যায়িত করে 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি' হিসেবে, এবং বলে 'সব জায়গায় মসজিদ বানানো হলো ইউরোপের ইসলামীকরণের অংশ'।[১৮৪] পোল্যান্ডের মিডিয়ায় নিয়মিত মুসলিমদের উপস্থাপন করা হয় সহিংস, সন্ত্রাসী, জিহাদি, ধর্ষক, অসভ্য, বিশ্বাসঘাতক এবং ইউরোপ ও খ্রিষ্টান মূল্যবোধের প্রতি হুমকি হিসেবে।[১৮৫] হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার সামনে বলেছে 'ইসলামীকরণ হাঙ্গেরিতে সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ'[১৮৬] এবং 'মুসলিম অভিবাসীরা শরণার্থী না; বরং আগ্রাসনকারী'।[১৮৭] অরবান এবং তার সমর্থকদের চোখে মুসলিম অভিবাসীদের উপস্থিতিই ইসলামীকরণের প্রমাণ।

---

[১৮১] Italy election: 'White race' remark sparks row, January 17, 2018

[১৮২] A Crime to Call Islam an Enemy?, https://bit.ly/2KR1ZY0

[১৮৩] Could Czech Republic Ban Islam? Far-Right, Anti-Islam Party Does Well In Elections

[১৮৪] "Basescu Doesn't Want a Mosque in Bucharest and Sends Iohannnis to Become a Mufti at Sibiu. 'Romania Must Remain Christian'" (Băsescu nu vrea moschee la București şi-l trimite pe Iohannis să se facă muftiu la Sibiu. România trebuie să rămână creştină"), *Gandul*, Feb. 26, 2016

[১৮৫] European Islamophobia Report 2017

[১৮৬] Hungarian Prime Minister Viktor Orban bans 'Islamisation', April 28, 2016

[১৮৭] Viktor Orbán: Hungary doesn't want 'Muslim invaders', *Politico*, August 1, 2018

নেদারল্যান্ডসের ২০১৭ এর নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যে কুখ্যাত গের্ট ভিল্ডার্সের সাথে পাল্লা দিয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত মার্ক রুটে। ফ্রান্সে গত এক দশকে তীব্রভাবে বেড়েছে ইসলামবিদ্বেষ। ২০১৭ এর নির্বাচনে ডানপন্থীদের পাশাপাশি মধ্যপন্থী বলে পরিচিত দলগুলোও নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করেছে ইসলামবিদ্বেষ। এ ঘৃণাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে গত এক দশকে ধরে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা মারি লা-পেন এর ফ্রন্ট ন্যাশনাল। ফ্রান্সের নব্য নাৎসি আইডেন্টিটারিয়ান আন্দোলনের সাথেও আছে ফ্রন্ট ন্যাশনালের গভীর সম্পর্ক।[১৮৮] ফ্রান্সসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নটরডাম ক্যাথিড্রালের আগুনের জন্যও দায়ী করা হচ্ছে মুসলিমদের। গোটা ইন্টারনেটজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন ফটোশপ করা ছবি আর নানা রকমের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।[১৮৯]

উগ্র ডানপন্থা, ইসলামবিদ্বেষ, অভিবাসন বিরোধিতা এবং পপুলিযমের দিকে পশ্চিমের হেলে পড়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত বিজয়ের পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অ্যামেরিকার 'টি-পার্টি' আন্দোলনের। আদর্শিকভাবে এ আন্দোলনের বেশ কিছু মিল আছে ইউরোপিয়ান উগ্র ডানপন্থীদের সাথে। ট্রাম্পের নির্বাচনীর প্রচারণার মূল মাস্টারমাইন্ড স্টিভ ব্যানন এখন চেষ্টা করছে বিভিন্ন ইউরোপিয়ান জাতীয়তাবাদী ও উগ্র ডানপন্থী দলগুলোকে একত্র করার।[১৯০] ট্রাম্পের ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে এরই মধ্যে অনেক লেখালেখি হয়েছে, তাই এ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে বিষয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, পুরো পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে অনেকের কাছেই ট্রাম্প পরিণত হয়েছে 'শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের পুনরুত্থানের প্রতীকে'। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের সাথে যুক্ত অনেক ধারণাকে মূলধারায় নিয়ে এসেছে ট্রাম্প। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের সামনে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে সাদাদের ওপর চলা কাল্পনিক গণহত্যার ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে। এসব কারণে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ট্যারান্টসহ শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের অনেকেই লিবারেল ধারার রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প, মারি লা-পেন, অরবানসহ বিভিন্ন ডানপন্থী পপুলিস্ট নেতাদের সমর্থন দেয়। ব্রেন্টন ট্যারান্ট তার ম্যানিফেস্টোতে সরাসরি বলেছে, ট্রাম্পের রাজনৈতিক পলিসি সমর্থন

---

[১৮৮] Generation Hate, Al Jazeera, December 2018

[১৮৯] No, Muslims had absolutely nothing to do with Notre Dame fire. Thank you. *Stepfeed*, April 4, 2019

[১৯০] Inside Bannon's Plan to Hijack Europe for the Far-Right, *The Daily Beast*, July 20, 2018

না করলেও 'শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের নতুন প্রতীক' হিসেবে সে ট্রাম্পকে সমর্থন করে।[১৯১] শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের সাথে খ্রিষ্টবাদের সম্পর্কটাও অনেকটা একই রকম। একদিকে ব্রেইভিক এবং ট্যারান্টের মতো লোকের নিজেদের ক্রুসেইডারদের সাথে তুলনা করে, নিজেদের নব্য নাইটস টেমপ্লার দাবি করে; অন্যদিকে এ দুজনসহ অনেকেই স্বীকার করে যে ব্যক্তিগতভাবে তারা খ্রিষ্টান না। খ্রিষ্টান ইউরোপ তাদের কাছে একটি রাজনৈতিক ধারণা এবং এ ধারণার আলোকে তারা পশ্চিমকে একত্রিত করতে চায়। ক্রুসেইড তাদের কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাদাদের যুদ্ধ। ধর্ম তাদের কাছে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কার্যকরী অস্ত্র, কিন্তু মূল চালিকাশক্তি না। ক্রুসেইডের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ কথা বলা যায় যে মোটা দাগে ইউরোপের অনেক রাজাদের মনোভাব একই রকম ছিল।

উগ্র ডানপন্থা, জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষের দিকে পশ্চিমের হেলে পড়ার কারণ কী? এর প্রধান কারণ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় রাজত্ব করা লিবারেলিযম বা উদারনৈতিকতাকে এখন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে পশ্চিমের সাধারণ জনগণ। ২০০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর তৈরি হয়েছে শাসক ও এলিট শ্রেণির প্রতি গভীর অনাস্থা ও অবিশ্বাস। মন্দার প্রভাবে বেড়েছে অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্ব। বিশেষ করে ওয়ার্কিং ক্লাস সাদাদের অনেকের জীবনেই মন্দা-পরবর্তী প্রেক্ষাপট এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সেই সাথে কর্পোরেশানগুলোর সস্তা শ্রমের লোভ এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় চলা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধগুলো জন্ম দিয়েছে অভিবাসীদের বিশাল স্রোত। এই বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং মুসলিম ও অভিবাসীদের উপস্থিতির জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী করছে লিবারেল ও বামপন্থীদের। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংহতি। উত্থান ঘটছে উগ্র ডানপন্থীদের।

অন্যদিকে অভিবাসন, মাল্টিকালচারালিযম, সরকারি নজরদারির কারণে ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকা ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙন, নারীবাদ, কমতে থাকা জন্মহারের মতো ইস্যুগুলো নিয়ে অনেক আগে থেকেই প্রচারণা চালিয়ে আসছে নব্য নাৎসি এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীরা। তাই ডানপন্থার এ উত্থান শক্তিশালী করছে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদকে। এখানে যে বিষয়টা বোঝা জরুরি তা হলো, এ ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে যারা চিন্তা করে তাদের সবই শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী না। এদের অনেকেই সাধারণ ডানপন্থী এবং রক্ষণশীল। দুদলের মধ্যে পার্থক্য হলো সহিংসতার

---

[১৯১] The Great Replacement, Brenton Harris Tarrant, 2019

প্রশ্নে। সাধারণ ডানপন্থী এবং রক্ষণশীলরা এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিতে চায় না। তারা এখনো মনে করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এ সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমা লিবারেল মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের সবাইকে উপস্থাপন করে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী হিসেবে। এর ফলে আসলে লাভ হয় চরমপন্থীদের। যৌক্তিক এসব ইস্যুতে আলোচনা না করে সবাইকে ঢালাওভাবে নব্য নাৎসি কিংবা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী আখ্যায়িত করা এবং আলোচনার সুযোগ না দেয়ার কারণে ডানপন্থী ও রক্ষণশীলদের অনেকেই ঝুঁকে পড়ে সশস্ত্র পন্থার দিকে। এ ছাড়া ডানপন্থী দলগুলোর প্রচারণা অনেকের জন্য কাজ করে শ্বেতসন্ত্রাসের আদর্শে দীক্ষিত হবার প্রথম ধাপ হিসেবে। যেমন : ইসলামবিদ্বেষ, অভিবাসন নীতির বিরোধিতা এবং সাদাদের ওপর চালানো কল্পিত গণহত্যার মতো ধারণাগুলো পশ্চিমের মূলধারার রাজনীতিবিদরাই এখন উৎসাহের সাথে প্রচার করছে। রবার্ট স্পেন্সার, মার্ক স্টাইন, পামেলা গেলার, অ্যান কৌল্টার, টাকার কার্লসন, বেন শাপিরোসহ পশ্চিমের মূলধারার ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ইসলামবিদ্বেষী অনেক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ব্রেইভিক এবং ট্যারান্টের ম্যানিফেস্টোতে।

এ ধরনের রেটোরিক তরুণ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তৈরি করছে গভীর হতাশা ও ক্রোধ। তাদের কাছে মনে হচ্ছে বিশ্বের নেতৃত্ব সাদাদের হাত থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মাল্টিকালচারালিযম, ফেমিনিযম এবং লিবারেলিযমের নামে আক্রমণ করা হচ্ছে তাদের সংস্কৃতির ওপর। বিশ্বজুড়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে সাদাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। এবং মুসলিমরা পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। মুসলিমরা একদিকে পশ্চিমকে সরাসরি আক্রমণ করছে অন্যদিকে অভিবাসী হয়ে এসে সাদাদের ভূখণ্ড দখল করে নিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতি এবং শ্বেতাঙ্গ পরিচয়। এ অবস্থায় কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধ গড়ে না তুললে খুব তাড়াতাড়ি সাদারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি স্লোগান হলো,

> *'আমাদের অবশ্যই আমাদের জাতির অস্তিত্ব এবং শ্বেতাঙ্গ শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে।'*[১৯২]

মুসলিমদের প্রশ্নে পশ্চিমের মূলধারার ডানপন্থী দলগুলোর বক্তব্যের সাথে ওপরের কথাগুলোর মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

---

[১৯২] "We must secure the existence of our people and a future for white children," Fourteen Words, https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words

সবকিছু মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার এক উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে পশ্চিম।

তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা চাষবাসের কৃতিত্ব এককভাবে ডানপন্থীদের না। বরং দীর্ঘদিন ধরে ডানপন্থীদের চেয়ে অনেক বেশি সফলতার সাথে একই কাজ করে আসছে লিবারেলরা। অপরাধী মুসলিম হলে ৪.৫ গুণ বেশি সময় নিয়ে প্রতিবেদন করার নিয়ম লিবারেল পশ্চিমা মিডিয়াই তৈরি করেছে।[১৯৩] হলিউডসহ পশ্চিমা মিডিয়া দশকের পর দশক ধরে ইসলামকে উপস্থাপন করে আসছে পশ্চাৎপদ, বর্বর, মধ্যযুগীয় আদর্শ হিসেবে। লিবারেল লেন্সে আরব এবং মুসলিমরা দ্বিমাত্রিক ক্যারিক্যাচার, হয় সন্ত্রাসী বা সম্ভাব্য সন্ত্রাসী অথবা লিবারেল মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরা 'আধুনিক', 'উদার মুসলিম'। লিবারেলদের কাছে, 'ভালো' প্রমাণিত হবার আগে প্রত্যেক মুসলিম 'খারাপ'। নিজেকে 'ভালো' প্রমাণ করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। আর 'ভালো' হবার উপায় হলো লিবারেল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা। লিবারেলদের কাছে 'ভালো মুসলিম' সার্টিফিকেট পেতে হলে আগে দিতে হবে লিবারেল পশ্চিম, অ্যামেরিকা এবং এনলাইটেনমেন্টের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ। সমকামিতা, ধর্মত্যাগের শাস্তি, বহুবিবাহ, জিহাদ, শরীয়াহ আইন, ইসলামে নারীর অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে 'পুরোনো' ধ্যানধারণা ছুড়ে ফেলে হতে হবে আধুনিক।

ক্রমাগত মুসলিমদের কাছে ইসলাম সংস্কারের আহ্বান এবং দাবি করার মাধ্যমে লিবারেলরা বারবার এ বার্তাই দেয় যে 'ইসলামের মধ্যে সমস্যা আছে'। ক্রাইস্টচার্চ হামলার পর ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছে, উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান থামাতে হলে মুসলিম এবং অভিবাসীদের আগে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে[১৯৪]। ২০১৬ তে লিবারেল বিল ক্লিনটন সরাসরি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেছে, 'যদি তুমি অ্যামেরিকা আর স্বাধীনতা ভালোবাসো এবং সন্ত্রাসকে ঘৃণা করো, তাহলে এখানে থেকে আমাদের জিততে এবং একসাথে ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করো।'[১৯৫] ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, অ্যামেরিকাকে ভালো না বাসলে, অ্যামেরিকাকে যুদ্ধে জিততে সাহায্য না করতে চাইলে, বিদায় হও।

---

[১৯৩] Shankar Vedantam, "When Is It 'Terrorism'? How The Media Cover Attacks By Muslim Perpetrators

[১৯৪] Assimilate, Assimilate – Tony Blair the Migrant Exterminator, TCS Network, April 24, 2019

[১৯৫] Muslim Americans React to Bill Clinton's Tuesday Night Speech, *NBC News*, July 28, 2016

লিবারেল জাতিসংঘের মাধ্যমেই প্রায় সাত দশক আগে মুসলিমদের ভূখণ্ড দখল করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ইস্রায়েল রাষ্ট্র। ডানপন্থীদের সমালোচনা করা লিবারেলরাই নীরবে সমর্থন জোগায় সারা বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালানো পশ্চিমা যুদ্ধগুলোতে। লিবারেলদের চোখের মণি বারাক ওবামার প্রশাসন যুদ্ধাবস্থায় সব পূর্ণবয়স্ক মুসলিম পুরুষকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে[১৯৬], এক বছরে মুসলিমদের ওপর ফেলেছে ২৬ হাজারের বেশি বোমা[১৯৭]। দশকের পর দশক ধরে এ লিবারেল বিশ্বব্যবস্থাই সমর্থন দিয়ে গেছে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসকদের। মিসর কিংবা আফগানিস্তানে, মুসলিমরা যখনই নিজেদের সরকার গঠনের চেষ্টা করেছে কোনো না কোনো অজুহাতে পশ্চিমা বিশ্ব হস্তক্ষেপ করেছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে।

লিবারেল পশ্চিম ইসলামের অবিচ্ছেদ্য বিধান পর্দাকে উপস্থাপন করেছে শোষণ, নির্যাতন ও নারীর যৌনায়নের প্রতীক হিসেবে। লিবারেল অ্যামেরিকান টিভির চিত্রায়নে 'স্বাধীন' মুসলিম নারীর উদাহরণ হল 'হিজাবী' লেসবিয়ান। আর নারীবাদের আলোকে ইসলামের পর্দার বিধানকে ব্যাখ্যা না করে, কেবল আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যে পর্দা করা প্রতিটি মুসলিম নারী লিবারেলিযমের চোখে 'নির্যাতিতা'। নিকাবকে বেআইনি ঘোষণা করে ইউরোপজুড়ে আইন পাশ করেছে লিবারেল সরকারগুলোই। বারবার এ আইনগুলোকে বৈধতা দিয়েছে ইউরোপীয় হিউম্যান রাইটস কোর্টের মতো আপাদমস্তক লিবারেল আদালত। বিল মাহেরের মতো লিবারেল রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রাইম টাইম টেলিভিশনে আক্ষেপ করে বলেছে, '(মুসলিমরা) অ্যামেরিকাতে মরুভূমির আবর্জনা নিয়ে আসছে'।[১৯৮] লিবারেল এবং নাস্তিকদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় স্যাম হ্যারিস খোলাখুলি বলেছে, 'আমরা 'সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি না, আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে'[১৯৯], এবং 'ইউরোপের প্রতি ইসলামের হুমকির ব্যাপারে সবচেয়ে বিচক্ষণতার সাথে কথা বলে ফ্যাসিস্টরা'[২০০]।

---

[১৯৬] Islamophobia: A Bipartisan Project, Deepa Kumar, July 2, 2012

[১৯৭] America dropped 26,171 bombs in 2016. What a bloody end to Obama's reign, *The Guardian*, January 9, 2017

[১৯৮] Bill Maher Isn't A 'Politically Incorrect' Liberal, He's Just A Bigot, *The Intercept*, Murtaza Hussain, October 8, 2014

[১৯৯] 'Mired in a religious war', Sam Harrish, December 1, 2004

[২০০] The End Of Liberalism?, Sam Harris, September 19, 2006

শ্বেতসন্ত্রাসীরা যাদের বিরোধিতা করে সেই পশ্চিমা সরকারগুলো তিন দশকে মুসলিম ভূমিগুলোতে হত্যা করেছে চল্লিশ লক্ষের বেশি মুসলিমকে[২০১], আর সরকারগুলো যাদেরকে 'বন্দুকধারী' বলে সেই সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের মারে পশ্চিমের মাটিতে, মসজিদে ঢুকে, গুলি করে। দিন শেষে ওরা সবাই এক। আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী সন্ত্রাসীরা হয়তো কয়েক শ কিংবা কয়েক হাজার মুসলিমের মৃত্যুর জন্য দায়ী, আমরা তাদের নিয়ে মাতামাতি করি। কিন্তু শান্তি, মানবতা, গণতন্ত্রের গল্প শোনানো সরকারগুলো যে আমাদের পাইকারি হারে মারে সেটা নিয়ে আমরা টুঁ শব্দ করি না। ট্যারান্টকে নিয়ে আমাদের অনেক কথা, অনেক রাগ, অনেক ক্ষোভ। নিঃসন্দেহে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপারটা হলো সেই আমরাই ইরাকে গণহত্যা চালানো টনি ব্লেয়ারের পলিসি অ্যাডভাইযার হিসেবে কাজ করা এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে নিউযিল্যান্ড সেনাবাহিনীর উপস্থিতির মেয়াদ বাড়ানো জেসিন্ডা আরডার্নের মাথার ওড়না আর প্র্যাকটিস করা বিমর্ষ চেহারা দেখে সব ভুলে মুগ্ধ হয়ে যাই।

বাংলাদেশ কিংবা যেকোনো মুসলিম দেশে সবচেয়ে তীব্র ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য দেয়া লোকগুলোর সবাই যে প্রগতিশীল, উদার, বামপন্থী কিংবা মুক্তমনা হিসেবে পরিচিত, সেটা কোনো দুর্ঘটনা না। ডানপন্থী শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের মতোই লিবারেল পশ্চিমও মনে করে তারা বাকি সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাদের অধিকার আছে মুসলিমদের তাদের ধর্মের ব্যাপারে সবক দেয়ার। লিবারেল মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদের পরোক্ষ ইসলামবিদ্বেষ কোনো দিক দিয়েই ডানপন্থীদের প্রত্যক্ষ ইসলামবিদ্বেষের চেয়ে কম ক্ষতিকর না। পার্থক্য হলো ডানপন্থীরা তাদের ইসলামবিদ্বেষের কথা খোলাখুলি স্বীকার করে, আর লিবারেলরা মিষ্টি মিষ্টি কথার আড়ালে লুকিয়ে চেষ্টা করে ইসলামকে বদলে দেয়ার। ডান ও বামের তৈরি করা ইসলামবিদ্বেষের মিশেল থেকেই বের হয়ে আসে ব্রেইভিক, বিসোনেট, ট্যারান্টরা। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের তীব্র ইসলামবিদ্বেষ এখন আর সমাজের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশের চিন্তা না; বরং এগুলো চলে এসেছে সমাজের মূলধারায়। ব্রেইভিকের ম্যানিফেস্টো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক্সিকিউটিভ অ্যানালাইসিস নামের থিংক ট্যাংকের একজন সদস্য আজ থেকে সাত বছর আগে, ২০১২ তে মন্তব্য করেছিল, ব্রেইভিকের ইসলামবিদ্বেষী ধারণাগুলো ইউরোপের অনেক দেশের সমাজের মূলধারার চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে।[২০২]

---

[২০১] Unworthy Victims: Western Wars Have Killed Four Million Muslims Since 1990, Stop The War Coalition, June 16, 2017

[২০২] Europe far right shuns Breivik's acts, flirts with ideas, *Reuters*, August 26, 2012

২০১৯ এ এসে এ ধারণাগুলো এখন আর শুধু মূলধারায় গ্রহণযোগ্য চিন্তা না; বরং পরিণত হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগুরুর চিন্তায়। যার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি পশ্চিমে উগ্র ডানপন্থীদের নির্বাচনী বিজয় থেকে।

সাদা আধিপত্যবাদের ধারণা এবং ইসলামবিদ্বেষ পশ্চিমের ঐতিহ্য, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সম্পদ। এ অতীতকে বোঝা ছাড়া পশ্চিমের বর্তমানকে বোঝা সম্ভব না। সংক্ষেপে অনস্বীকার্য এ বাস্তবতাকে তুলে ধরে এডওয়ার্ড সাইড বলেছেন,

> *'ইউরোপ কিংবা অ্যামেরিকার ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোনো সময়কাল খুঁজে পাইনি, যেখানে কামনা, বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা তৈরি কাঠামোর বাইরে গিয়ে ইসলাম নিয়ে আলোচনা কিংবা চিন্তা করা হয়েছে।'*[২০৩]

৬.

বন্দুক হাতে ট্যারান্টকে এগিয়ে আসতে দেখে আন-নূর মসজিদের একজন মুসল্লি বলেছিলেন, 'হ্যালো ব্রাদার'। পশ্চিমা মিডিয়া এবং পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা এ নিয়ে অনেক আদিখ্যেতা করেছে। অনেক আদিখ্যেতা হয়েছে হুইলচেয়ারে বসা অক্ষম স্বামীর ক্ষমার বার্তা নিয়েও। আমাদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে এটাই প্রকৃত মহানুভবতা, ইসলামের আসল শিক্ষা এবং এ ধরনের আচরণের মাধ্যমেই আমরা পশ্চিমের মন জয় করতে পারব। তারপর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি হাজার বছরের পুরোনো, গভীরে প্রোথিত ঘৃণা ও বিদ্বেষকে ভুলে গিয়ে ফিরিঙ্গিরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে নেবে অথবা ইসলাম ও মুসলিমদের মেনে নিয়ে বসবাস করবে সুখে-শান্তিতে। পশ্চিমা মিডিয়া এবং তাদের পোষা মুসলিমবিশ্বের তোতাপাখিদের সুন্দর সুন্দর এসব কথা শুনে আমরা অনেকে হয়তো এগুলো বিশ্বাসও করেছি। কিন্তু ক্ষমার নামে অক্ষমের অসহায় আত্মসমর্পণের বদলে আমাদের যেটা মনে রাখা দরকার সেটা হলো, লিনউড সেন্টারের পার্কিং লটে ট্যারান্টের গাড়ির দিকে শটগান ছুড়ে না মারলে সেই দিন হয়তো মৃতের সংখ্যাটা ৫০ এর বদলে আরও অনেক বেশি হতো। শেষ পর্যন্ত ওকে থামানো হয়েছিল প্রতিরোধের মাধ্যমে, শক্তি দিয়ে। ভালোবাসার বুলি, কিংবা মিনিট খানেকের নীরবতা দিয়ে না। রাতের বেলা যখন বাড়িতে ডাকাত পড়ে তখন মোমবাতি জ্বালিয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থেকে, ফানুস উড়িয়ে কিংবা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিজেকে বাঁচানো যায় না।

---

[২০৩] Islam through Western Eyes, Edward W. Said, 1998

যে শত্রু আপনাকে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর তাকে থামাতে হয়, থামতে বাধ্য করতে হয়, যেকোনো উপায়ে।

শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীরা আমাদের সাথে তাদের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করে সভ্যতার সংঘাত হিসেবে। ইসলামকে তারা তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করে। এ ধরনের মানুষের সংখ্যা পশ্চিমা বিশ্বে দিন দিন বাড়ছে। লিবারেল পশ্চিম যা-ই বলুক না কেন, এ স্রোতের গতি ফেরানো যাবে না। যত দিন যাবে অর্থনৈতিক সংকট এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা পশ্চিমের জনগণকে তত বেশি করে ঠেলে দেবে অভিবাসন বিরোধিতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং পপুলিযমের দিকে। যদি অভিবাসন পুরোপুরি বন্ধও করে দেয়া হয়, তাহলেও খুব বড় কোনো পরিবর্তন আসবে না, বড়জোর স্রোতের গতি ধীর হবে কিছুটা। যেমনটা ট্যারান্ট বলেছে, সাদাদের নিম্ন জন্মহার এবং অভিবাসীদের উচ্চ জন্মহারের অবধারিত ফলাফল হলো দিন দিন পশ্চিমে সাদাদের সংখ্যা কমা। এটাকে যে সন্ত্রাসের অজুহাত বানাতে চায়, অভিবাসন বন্ধ হয়ে গেলেও সে তা পারবে। অন্যদিকে, পশ্চিমারা যতদিন মুসলিমবিশ্বে তাদের আগ্রাসন এবং ইস্রায়েলের প্রতি সমর্থন বন্ধ করবে না ততদিন পশ্চিমা বিশ্বে চলবে মুসলিমদের হামলা। আর এমন প্রতিটি হামলা প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে ট্যারান্টের মতো আরও অনেককে। তাদের রাগকে কার্যকরীভাবে ধ্বংসে পরিণত করতে নানা রকমের টিউটোরিয়াল আর দিকনির্দেশনা নিয়ে প্রস্তুত থাকবে আযভ ব্যাটেলিয়ন আর নরমান স্পিয়ারদের মতো লোকেরা। চলতে থাকবে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের চক্র।

এর সাথে যুক্ত করুন অর্থনীতির বিষয়টা। পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট যখন আসবে (এবং নিশ্চিতভাবেই তা আসবে[২০৪]) তখন তা পশ্চিমা বিশ্বে রাতারাতি তৈরি করতে পারে এক বিশাল বেকার শ্রেণি–যারা মধ্যবিত্ত, শ্বেতাঙ্গ এবং ক্রুদ্ধ। লিবারেল আদর্শের ঐক্য, বহুত্ববাদ, সম্প্রীতির বড় বড় বুলিগুলো ফাঁকা পকেটে আর খালিপেটে তাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। নিজেদের চাকরিগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তারা দায়ী করবে চোখের সামনে হেঁটে বেড়ানো রংবেরঙের অভিবাসীদের, এবং তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ থাকবে 'বর্বর', 'সন্ত্রাসী', 'আগ্রাসী' মুসলিমদের ওপর। অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যালঘু এবং ভিনদেশিদের প্রতি জনবিদ্বেষ তৈরি করে তা নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রিডম্যানসহ[২০৫] বিভিন্ন অর্থনীতিবিদরা আলোচনা করেছেন।

---

[২০৪] J.P. Morgan Has a Date for the Next Financial Crisis—and It's Not Far Off, *Fortune*, September 13, 2018

[২০৫] *The Moral Consequences of Economic Growth*, Benjamin M. Friedman, 2005

এ ধরনের বিদ্বেষের ফলে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে ইতিহাসজুড়ে বারবার জন্ম নিয়েছে ব্যাপক অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস এবং যুদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি এ ধরনের প্রেক্ষাপট চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার (BLM) এবং অ্যান্টিফা (Antifa) এর মতো বামপন্থীদের কিংবা পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলোকে। এ ধরনের দলগুলোর মধ্যে এরই মধ্যে দেখা গেছে সীমিতমাত্রায় শক্তি ব্যবহারের প্রবণতা। এ ধরনের আন্দোলনগুলো হয়তো বৈশ্বিক পর্যায়ে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে, বিশেষ করে অ্যামেরিকাতে, এগুলোর অস্তিত্ব এবং কার্যক্রম প্রকট করতে পারে সামাজিক মেরুকরণ ও শ্বেতাঙ্গদের আত্মপরিচয়ের সংকটকে। এ দ্বন্দ্ব জিইয়ে থাকলে বাড়বে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের সমর্থন, প্রচার ও প্রসার।

অর্থনৈতিক সংকটের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক মেরুকরণ, সামাজিক অস্থিরতা এবং আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকে চরমপন্থার মিশেল জন্ম দিতে পারে এক নিখুঁত রুদ্র ঝড়ের। সেই ঝড় মোকাবেলা করার ক্ষমতা লিবারেলিযমের ফাঁপা আদর্শের নেই। যখন পেটে লাথি পড়বে, সবকিছু ভেঙে পড়তে শুরু করবে তখন সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির বাণী দিয়ে উন্মত্ত জনতার স্রোত থামানো যাবে না। আজকের পশ্চিম হলো গতকালের দাসপ্রথা, বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদী পাইকারি খুন আর স্প্যানিশ ইনকুইযিশানের গর্বিত উত্তরাধিকারী। মাত্র এক শ বছর আগেও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ইউজেনিকস[২০৬] এর মতো চরম অনৈতিক ও বর্ণবাদী ধারণা এই পশ্চিমের কাছে স্বীকৃত ছিল বিজ্ঞান হিসেবে। আজকে শান্তির গল্প শোনানো এই পশ্চিমারাই নিজেরা যুদ্ধ বাধিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় হত্যা করেছে প্রায় ১০ কোটি মানুষ। ক্রাইস্টচার্চের হামলার পর শান্তি আর সম্প্রীতির বুলি আওড়ানো এই পশ্চিমা দেশগুলোই গত তিরিশ বছর ধরে সারা বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত মুসলিমদের হত্যা করেছে এবং নানা অজুহাতে বৈধতা দিয়ে আসছে এই নির্বিকার গণহত্যাকে। এ পশ্চিমই বাহাত্তর বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছে ইস্রায়েল নামের ক্যান্সারকে। 'অপর'কে দানব হিসেবে উপস্থাপন, হত্যা, পাইকারি খুন, ব্যাপক মাত্রায় ধ্বংস–এগুলো এ সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমরা যতই চাই না কেন, আজ হঠাৎ করে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাবে না।

[২০৬] Eugenics - a set of beliefs and practices that aim to improve the genetic quality of a human population by excluding (through a variety of morally criticized means) certain genetic groups judged to be inferior, and promoting other genetic groups judged to be superior. Unified Medical Language System (Psychological Index Terms). Bethesda, Maryland: National Library of Medicine. 2009

ইসলামের সাথে পশ্চিমের যুদ্ধের তীব্রতা যত বাড়বে, পশ্চিমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির যত অবনতি হবে, ততই বাড়বে মুসলিমদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও সহিংসতা। এতদিন পশ্চিম হত্যা করছিল পূর্বে থাকা মুসলিমদের, এখন তারা পশ্চিমে থাকা মুসলিমদেরও হত্যা করছে এবং দিন দিন তা আরও বাড়বে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত ইতিহাস এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে। পশ্চিমকে খুশি করা আর তাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা অর্থহীন, জাতিসংঘ এবং 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের' ওপর ভরসা করা নিরেট পাগলামি। এসব বাদ দিয়ে এখন সময় এসেছে সম্পূর্ণভাবে দ্বীনে ফিরে আসার। সময় এসেছে পশ্চিমা দর্শন আর তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধকার অলিগলিতে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো না ঘুরে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষা আত্মস্থ করার। অন্যসব ঠুনকো পরিচয়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের মুসলিম পরিচয়কে আঁকড়ে ধরতে হবে। সেইভাবে ইসলামকে বুঝতে এবং পালন করতে হবে, যেভাবে বুঝেছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, কুরআনের প্রজন্ম–রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন)। সেই সাথে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে আমরা এ আগ্রাসনের প্রতিরোধ করব। সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই চোখ থেকে পশ্চিমা ঠুলি সরিয়ে আমাদের খুঁজতে হবে শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীকে। আমাদের বুঝতে হবে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে কারা আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। দিগন্তে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে আর মাটিকে গ্রাস করে নিচ্ছে শ্বেতসন্ত্রাসের ছায়া।

বিপদসংকেতগুলো উপেক্ষা আর আশাবাদী নিষ্ক্রিয়তার পরিণতি কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত খুঁজতে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। বনী ইস্রাইলের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালেই চলবে।

আসিফ আদনানের জন্ম ১৯৮৮ তে, চট্টগ্রামে। বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স করেছেন।

এর আগে সম্পাদনা করেছেন সত্যকথন (সংকলন, ২০১৭), মুক্ত বাতাসের খোঁজে (লস্ট মডেস্টি, ২০১৮), ইসলামী ব্যাংক: ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর (মূল: যাহিদ সিদ্দিকী, অনুবাদ: ইফতেখার সিফাত, ২০১৯)।

চিন্তাপরাধ তার প্রথম বই।